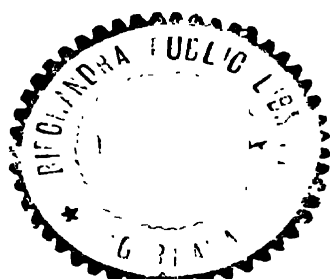
এই সব আলো প্রেম

অসিত গুপ্ত



পরিবেশক :

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ei-sāb aaló prem
a novel by asit gupta

প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ ১৩৬৬

প্রকাশক :
শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
তিন সঙ্গী প্রকাশনী
পি ৪৬, রায়পুর
কলিকাতা-৩২

প্রচ্ছদপট :
ও. সি. গাঙ্গুলী

মুদ্রক :
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ
বাসন্তী আর্ট প্রেস
৬।১ কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রক : প্রেস এণ্ড প্রিণ্টার্স
৫০, ইণ্ডিয়ান মিরার স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ব্লক : পাইওনিয়ার ষ্টিরিও টাইপ কোঃ
কলিকাতা-১৩

বন্ধনী : সিটি বুক বাইণ্ডিং
৯৭, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

পরিবেশক :
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মা

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

শ্রীচরণেষু

লেখকের প্রকাশিতব্য গ্রন্থ :

এই বিশ্বের কথাসাহিত্য (প্রবন্ধ)

ঊর্মিমালা (উপন্যাস)

॥ মধ্যাহ্ন ॥

১.

এই সব আলো প্রেম কিছুই দীর্ঘস্থায়ী নয়; তার ওপারে অনন্ত অন্ধকার। এরকম একটা কথা সবসময় মনে হয় আমার আর তাতে—আমি খুব অস্বস্তি বোধ করি।, কিছুতেই আড়ষ্টতা কাটাতে পারিনা। মনে হয় কোন একটা ষ্টেশনে আমি যেন অপেক্ষা করছি, অপেক্ষা করছি একটা গাড়ীর জন্যে। গাড়ীটা এসে পড়লেই আমার এই অভ্যস্ত অবস্থাটা হঠাৎ সরে যাবে এবং আমি আরেকটা নতুন জায়গায় পৌঁছে যাব, যেখানে,—আমি ঠিক জানিনা, আলোও থাকতে পারে আবার ঘোরতর অন্ধকারও হতে পারে।

আমার ভেতরের এই অস্বস্তিটা আজ বলে নয়, ছেলেবেলা থেকেই. আমার সংগে সংগে বড় হয়েছে। আমি ছেলেবেলায় অন্যদের মতো মাঠের আল ধরে দৌড়তাম না, গঙ্গাফড়িং-এর পায়ে সূতো বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে কষ্ট দিতামনা। আমি একা একা থাকতাম। অতসী গাছের শোভা দেখতাম, হাস্নুহানার গন্ধ নিতাম আবার কখনো একলা ফাঁকা মাঠের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকতাম। কিন্তু ছোট-বেলার কথা পরে বলছি; মাঝপথ থেকে আরম্ভ করেছি আগে সেটা সেরে নিই।

আমি গান গাই। আমাকে লোকে চেনে। দুঃখ-কষ্টের পাথুরে পথ আমি পার হয়ে এসেছি আজ। তবু আমার মনের সেই সংশয় ঘুচল না। আমি শান্তি পেলাম না। সর্বসময় একটা অবস্থান্তরের অস্বস্তিকর প্রত্যাশায় দিন কাটাতে হয় আমাকে। কখনি মনে হয় এখনকার পৃথিবীতে এই ধন, মান, জীবন, এই সব আলো প্রেম, নির্জনতা কিছুই বেশীদিন থাকে না; বুদ্‌বুদের মতো একটা ছোট্ট আলোড়ন তুলেই মিলিয়ে যায়। অন্তত আমাদের জীবনে,—যাঁ'রা

কোনদিনই হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচবার স্বস্তি পায় নি ; পারিপার্শ্বিক জড়ের সমবেত মিছিলে নীরবে যোগদান করে এসেছে শুধু। নিজের ইচ্ছে, অনিচ্ছে ব'লে যাদের আলাদা ক'রে কখনো কিছু থাকে নি। আমার মনে হয়, তা'রা জীবনের কোন পরিবর্তনে ভরসা করতে পারে না, কেননা তা'রা জানে আজকের দিনে ঘন ঘন অবস্থার পরিবর্তন হওয়াটাই জগতের স্বাভাবিক নীতি। সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম এগুলো ধাতুর মতো ; ওপরের পালিশে চকচকে হয়ে থাকে, চটা উঠে গেলেই আবার আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়ে।

এই নিয়ে আমি দু'বার দিল্লীতে এলাম। পাঁচ বছর আগে আর পরে। এই শহরটারই কত পরিবর্তন হয়েছে এর মধ্যে, আমি হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম।পাঁচ বছরে আমার জীবনেও অনেক কিছু বদলেছে।

এখন শীতকাল। এখন রাত্তিরটা কুয়াশায় ভারী, ধূসর পর্দায় ঢাকা আছে। মাঝে মাঝে রাস্তার এবং দোকানের চড়া আলোগুলোকে সকালের প্রথম রোদের মতো মনে হচ্ছিল। হঠাৎ গায়ে যেন গলে পড়ল সেই স্নিগ্ধ রোদটা।

আমি আমার দল নিয়ে এখানে শো' করতে এসেছি। পাঁচ বছর আগে প্রথম এসেছিলাম। আর, তখনই আমি মীনাক্ষির দেখা পাই। হ্যাঁ, মীনাক্ষিকে আমি ভালবাসি।

গোলমার্কেটের গোলমাল আর কনট সার্কাসের আলোর মেলা ঝিমিয়ে পড়েছিল। যেন অনেক পরিশ্রমের পর ঘাম মুছে হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছে তা'রা। শুধু পরিশ্রমের উত্তেজনাটুকু চেতনা থেকে মিলিয়ে যায় নি। স্নায়ুসকল এখনো সচকিত হয়ে আছে। অন্ধকার! রাস্তার বেশীর ভাগটাই অন্ধকার। কিন্তু এই অন্ধকারটুকু ভাল লাগার মতো। কে যেন নরম ক'রে গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে চলেছে অনবরত।

আমি যখন প্রথম এসেছিলাম, তখনও শীতকাল ছিল। কিন্তু তখন আমার তত নামডাক হয়নি, টাকা পয়সাতেও এতটা নিশ্চিন্ত আরাম পাইনি। আমি তখন পথ কেটে সবে কাঁটা সরাতে পেরেছি বলতে

পারেন। আমি এসেছিলাম আমার দল নিয়ে গান-বাজনার অনুষ্ঠান করতে। তখন আমার মধ্যে প্রত্যয় আসেনি ; নতুন বাইরে এসেছি ব'লে কেমন ভীরু-ভীরু ভাব ছিল একটা। কলকাতার বাইরে এত দূরে সেই আমার প্রথম আসা। তার আগে অলিতে-গলিতে, এখানে ওখানে গান গেয়ে সবে একটা নতুন জীবনের রোমাঞ্চ পেতে আরম্ভ করেছি। তাই, এতদূরে, একেবারে নতুন পরিবেশে এসে সেদিন আমার চেহারাটা কতখানি করুণ দেখিয়েছিল আজ ভাবতে গিয়ে লজ্জা পাই।

নতুন দিল্লীর কালীবাড়ী খুব বেশীকাল তৈরী হয়নি। সেখানেই আমার অনুষ্ঠান ছিল। শীতকালের সাদা রাত্রি। সাদা কুয়াশা। আর আকাশে অনেক তারা। তারাগুলোর দৃষ্টি ঘোলাটে। আগে আগে অনেক সময় ওপরের দিকে তাকিয়ে আকাশকে খুব নির্দয় মনে হয়েছে আমার। তার চওড়া পিঠের নীচে দাঁড়িয়ে অনেক সময় অসহায় মনে করেছি নিজেকে। কিন্তু পরে বুঝেছি কাউকে নির্দয় মনে হওয়া কিংবা কারো ব্যাপ্তিতে অসহায় বোধ করাটা সম্পূর্ণই নিজের ওপর নির্ভর করে—নিজের মানসিক অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিকতার ওপর। 'আমি সুরক্ষিত' এই ভরসাটুকু অনুভব করলেই তবে পৃথিবীর অন্য জিনিসের মধ্যে সুর খুঁজে পাওয়া যায়। আমার চারপাশের প্রতি একটা প্রীতিকর আস্থা জাগে। নইলে সব কিছুই নির্দয়, নিরালম্ব।

আমার অনুষ্ঠানের শেষে আমি মীনাক্ষিকে দেখেছিলাম। সামনেই বসেছিল সে। এত সামনে যে আমি তা'র মুগ্ধ এবং বিস্মিত চাহনীটুকু পর্যন্ত লক্ষ্য করতে পেরেছিলাম। গায়ে ঘন নীল রঙের একটা স্কার্ফ ছিল তা'র, তাতে একটা সাদা সরু লাইনিং। সেই স্কার্ফ-এর তলায় হাত দুটোকে জড়ো ক'রে বসেছিল সে। পেছনের সারিতে কতকগুলো মাথা ছাড়া আর কিছুই নজরে আসে নি আমার ; দুর্বলতায় সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল।

অনেক পরে বাইরে বেরোলাম। এক রাত্তিরের আয়োজনটি তখন ভেঙে গেছে। কিন্তু বাইরে, ফটকের কাছে তখনো কিছু কিছু লোক

জমে রয়েছে। আমার শরীর ও মনের উত্তেজনা বাইরের ঠাণ্ডায় তখন একটু একটু ক'রে থিতোতে আরম্ভ করল।

বড় একটা গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল মীনাক্ষি। আমি ওর কাছাকাছি হতেই ও একটু এগিয়ে এসে হাত তুলে আমাকে নমস্কার করল। তারপর খুব সহজভাবে বলল, 'আমার নাম মীনাক্ষি, আপনার আজকের অনুষ্ঠানে আমি একজন শ্রোতা। সেই সাহসে আপনার সংগে আলাপ করতে এসেছি। যদি ভরসা দেন তাহলে একটা অনুরোধ করি।'

'বলুন'। বললাম আমি।

'আমার সামান্য একটু পরিচয় আছে। আমার নয় আমার বাবার। যদি কাল সকালে দয়া ক'রে একবার আমাদের বাড়ীতে আসেন তাহলে আজকের অনুষ্ঠানের জন্যে কাছ থেকে আপনাকে একটু বাহবা জানাবার সুযোগ পাই আর আমার নিজেরও একটু প্রয়োজন আছে সেটা নিবেদন করতে পারি।'

মীনাক্ষি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে ওর সর্বাংগে আলো পড়ছিল না; পিছলে সরে যাচ্ছিল। টিনের পাতের ওপর জল পড়লে যেমন গড়িয়ে যায়, বসতে পায় না, ঠিক তেমনি। তবু আমি তারই মধ্যে ওর গলার আওয়াজ, চেহারা, দাঁড়াবার ভংগী দেখেই বুঝেছিলাম, ওর মধ্যে একটা ব্যক্তিত্ব আছে, আছে একটা আশ্চর্য সপ্রতিভতা। যা' মেয়েদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। আমি বললাম, 'আপনাকে ঠিক কোন কথা দিতে পারছি না। দু'দিনের জন্যে এসেছি তো! নানা ব্যস্ততায় আট্‌কা পড়তে পারি। তবে যাবার যথাসম্ভব চেষ্টা করব এটুকু বলছি।'

'ব্যস্‌ ব্যস্‌ তাহলেই হলো। তবে আসতে পারলে আমি এবং আমার বাবা আমরা দু'জনেই খুব খুশী হব। আর আমার দরকারটাও সেরে নেওয়া হবে।'

ব্যাগ খুলে একটা কার্ড বের করল মীনাক্ষি। আমার হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'আসার খুব চেষ্টা করবেন কিন্তু। কিছু মনে করবেন

না যেন বিরক্ত করলাম ব'লে। আর, মনে করলেই বা কি, বাইরে যখন এসেছেন তখন একটু-আধটু এমন উপদ্রবের কথা জেনেই এসেছেন নিশ্চয়।'

মীনাক্ষি হাসল। উত্তরে আমারও হাসা ছাড়া আর কিছু বলার ছিল না। খুব অপ্রস্তুত বোধ করছিলাম। কেননা, বাইরের লোকের সামনে বরাবরই আমি সহজ হতে পারি নি।

অথচ জানি, আজকের 'আমি'র সংগে বিশ বছর আগেকার 'আমি'র কত তফাৎ। কোনদিন কি ভাবতে পেরেছি এমন জীবন হবে আমার! এত মানুষের সংস্পর্শে আসব, নিজের নির্জনতা ছেড়ে সকলের সংগে জীবনের রথের চাকায় হাত লাগাব! কিন্তু তবু লোকের সামনে অসহজ বোধ করার দুর্বলতা আমি কাটাতে পার নি।

ছাতনা গ্রাম ছাড়া বহুদিন পর্যন্ত আমি আর কোন জায়গা জানি নি। বাবা ছাড়া আর কাউকে বন্ধু ব'লে ভাবতে পারিনি। আমাদের বাড়ী, যা' আজ আমার কাছে শুধু একটা পবিত্রস্মৃতি হয়ে আছে, সেদিন সেটাই আমার কাছে গোটা পৃথিবী হ'য়ে ছড়িয়ে ছিল। বাড়ীটা পাকা ছিল না কিন্তু দোতলা ছিল। খড় দিয়ে ছাওয়া ছিল ওপরটা। ঢুকতেই দরজার ওপরে সিঁদুরের ছাপ দেওয়া ছিল। লক্ষ্মীর কুনকে আঁকা ছিল সিঁদুর দিয়ে। আমি জানিনা, বাবা বলেছিলেন ওটা নাকি মা'-ই করেছিলেন প্রথম যখন লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা হয় বাড়ীতে। সামনেই একটু উঠোন। উঠোনটা খোলা। মাঝখানটায় তুলসীর মঞ্চ। বাঁ দিকে কুয়োতলা। কুয়োতলার ঠিক গা দিয়ে একটা পেয়ারাগাছ উঠে গেছে। আমি দেখতাম কুয়োর জলে পেয়ারা গাছের ছায়া পড়ত। বাবা কখনো আমাকে সেই পেয়ারাগাছে চড়তে দেন নি; বড় হয়েও না। তিনি ভয় পেতেন যদি গাছে চড়তে গিয়ে হঠাৎ কুয়োয় পড়ে যাই!

উঠোনের পরেই টানা দালান ছিল। বাঁ হাতি এবং ডান হাতি দু'খানা সামনা সামনি ঘরে এসেই শেষ হয়ে গেছে দালানটা। মাঝখানেও একখানা ঘর ছিল। আর সেই ঘরের পাশ দিয়ে সিঁড়ি চলে গিয়েছিল ওপরে। সিঁড়িটা ছিল ন্যাড়া, তাতে কোন রেলিং ছিল

না। বাবা রাত্তিরে কক্ষনো সেই সিঁড়ি দিয়ে আমাকে একলা যেতে দেন নি। ঘুমের ঘোরে পড়ে যাব এরকম আশংকা ছিল তাঁর। ওপরেও খান দু'য়েক ঘর ছিল। মাঝের ঘরটায় বাবা থাকতেন।

আমার বাবা বড় অদ্ভুত ধরণের মানুষ ছিলেন। ওপরে ওপরে আশ্চর্য স্নিগ্ধ স্থিরতা ছিলতাঁর। পরে বড় হয়ে বুঝেছি সেইটুকুই সব নয়, বাইরের স্থিরতার আড়ালে তিনি একটি রক্তাক্ত হৃদয়কে গোপন রেখে এসেছেন বরাবর। তার জ্বালায় অস্থির হয়েছেন। সে জ্বালা তাঁর ভেতরে ছিল। ইদানীং আমার মনে হতো তাঁর ভেতরের প্রবল সত্তাটা আত্মপ্রকাশের সফলতা না পাওয়ায় তাঁর মধ্যে একটা অসীম নির্বেদ্যতা এসেছিল। সেটা তিনি বুঝতে দিতেন না বটে কিন্তু তার নিগ্রহ অনবরতই সইতে হতো তাঁকে।

বাবার নাম ছিল মুরারী, মুরারী ঘোষ। তিনি রাসবিহারী ঘোষের জুনিঅর ছিলেন। কিন্তু তাঁর মন কোনদিন আইনের জটিল ও সংকীর্ণ পথে চলে নি। ওই জীবিকায় তিনি কোনদিন খাপ খাওয়াতে পারলেন না নিজেকে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করত, 'কি মুরারীদা আপনি কি ওকালতি ছেড়ে দিলেন?' তিনি হাসতেন। তারপর বলতেন, 'বললে বড় কথা শোনাবে ভাই কিন্তু কাদের বিচার করব বল দেখি? কোন্ মানুষের? ওরে বাবা বিচার কি সকলেই করতে পারে, না করা উচিত? বিচার করার সেই যোগ্য লোক যে আগে নিজের সম্বন্ধে সব বিচার সাংগ করেছে। আমি কি জানি নিজেকে! আমি কি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি যে, নিজের সম্বন্ধে সব বিচার আমি যোগ্যতার সংগে শেষ করেছি?' বলতেন আর হাসতেন।

তিনি মেটারলিংক পড়তেন, শোপেনহাওআর পড়তেন আর পড়তেন রবীন্দ্রনাথ। আমি যখন কলকাতায় থাকতাম তখন তিনি ছাতনা থেকে বড় বড় চিঠিতে তাঁর অনুভবের কথা প্রায়ই লিখে পাঠাতেন। একবার একটা সংস্কৃত শ্লোক লিখে পাঠিয়েছিলেন আমায় (ছোটবেলায় সেটা একবার শোনাতেও চেয়েছিলেন)। শ্লোকটা পতঞ্জলির যোগদর্শনে ছিল:

'সোপক্রমং নিরূপক্রমঞ্চ কর্ম তৎ সংযমাদ
অপরান্তজ্ঞানম অরিষ্টে ভ্যো বা।'

মা! মাকে আমি কোনদিন পেয়েছি কিনা সে ধারণাটা আমার ধোঁয়াটে হয়ে আছে। তবে বুকের ভেতরটা হাতড়ালেই একটা ছবি ফুটে ওঠে। তখন মা'কে আমার খুব করুণাময়ী ব'লে মনে হয়—এর কত-টুকু আমার কল্পনা তা'অবশ্য জানি না। তবে তাঁকে সেই রূপেই ভাবতে আমার ভাল লাগে। আমার পাঁচ বছর বয়স থেকেই তিনি আমার কাছে ছিলেন না। কিন্তু তাঁর ফাঁক আমি কোনদিনও টের পাইনি তেমন ক'রে। কারণ বাবা সে শূন্যতা কখনো বুঝতে দেন নি। প্রথম প্রথম আমার শৈশবে তিনি ধাত্রীর ভূমিকা নিয়েছেন আর তারপরে একটু বড় হতেই সখা, বন্ধুর মতো স্নেহে, উপদেশে আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন।

আমি মীনাক্ষিদের বাড়ী গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম পুরনো দিল্লী দেখতে যাব তা' আর যাওয়া হয় নি। পুরনো দিল্লীর রঙ-ওঠা জ্যালজেলে চেহারা, রাস্তাঘাটে ডাঁশ করা ময়লা আর মানুষের ঘেঁষাঘেঁষি সত্ত্বেও ওতে এমন একটা আকর্ষণ আছে যা' আমার ভাল লাগে। আমার মনে হয় ওর রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাতাসে নিশ্বাস টানলেই ইতিহাস আসবে প্রাণে, ইতিহাসের গন্ধ। যে-সব পায়ের শব্দ শত শত বছর আগে থেমে গেছে কিন্তু যার ধ্বনি আজও ওই পথের ধূলোয় ধূলোয় একটি সংক্ষিপ্ত সুরের মতো নিবিড় হয়ে রয়েছে, তা যেন আমি টের পাব। তবু সেদিন আমি গেলাম না।

আমি মীনাক্ষিদের বাড়ী গিয়েছিলাম। মীনাক্ষির বাবা করুণাকেতন চ্যাটার্জী আই. সি. এস লোক। বাঙালী পদস্থ মানুষ দিল্লীতে বেশী নেই তো, তাই তাঁর সম্মানিত চাকরীর কথা জেনে আনন্দ হয়েছিল।

নতুন দিল্লীর চক্‌চকে রাস্তায় তখনো মানুষের পা পড়েনি বেশী। রোদে ঝাঁঝ ছিল না। বৈদ্যুতিক আলোর মতো শুধু একটি কোমল

উত্তাপ ছড়িয়েই ক্ষান্ত হচ্ছিল। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি বাড়ীর সামনে। বাড়ীর চেহারাতেই বোধহয় মালিকের সব পরিচয় লেখা ছিল,—কত ওজনের মানুষ তিনি।

খবর দিতেই মীনাক্ষি ছুটে এল। দিনের আলোয় আমি তাকে ভাল ক'রে দেখতে পেলাম। কাল রাতে চেহারায় যেটুকু চেষ্টা, যেটুকু আয়োজন ছিল, আজ আর তা' নেই। সব পরিষ্কার, স্বচ্ছ। ব্যবহারেও কোন কুণ্ঠা নেই। অপ্রশস্ত পরিচয়ের জড়তাটুকুও কাটাতে পেরেছে সে।

আমি নমস্কারের ভংগীতে হাত তুলতেই উৎসাহের বশে ও আমার উদ্যত হাতটি ধ'রে বসিয়ে দিল একটা সোফায়। হাসতে হাসতে বলল, 'বসুন, বসুন, আমি তো ভাবলাম আপনি বুঝি এলেন-ই না! কেনই বা আসবেন বলুন, এরকম তো কতজন-ই অনুরোধ করে কিন্তু সব অনুরোধ কি রাখা সম্ভব হয়?'

আমি বললাম, 'অন্য কাকে করে জানিনা তবে আমি এরকম অনুরোধে বিশেষ অভ্যস্ত নই তাই খানিকটা কৌতূহলের বশেই এসে পড়লাম। আর, সব অনুরোধ রাখা সম্ভব না হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার কড়াকড়িকে একটু শিথিল করতে হয় বৈকি!'

মীনাক্ষী হাসল। 'সত্যি কাল আপনার গান শুনে অনেকদিনের একটা ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে।'

'কিরকম?' এই পরিবেশে কথা চালাতে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল তবু যান্ত্রিক উপায়ে নিজেকে নিয়োজিত রাখলাম।

'প্রথম যখন রেডিওতে গান শুনি তখনই মনে মনে আপনার গলার তারিফ করেছি। তারপর তো আপনার কত নাম-ডাক হয়েছে! রেকর্ড বেরিয়েছে। কিন্তু কাছাকাছি বসে গান শোনবার সুযোগ হয়নি। দিল্লীতে অনেক গায়কই এসে গান করে গেছেন—প্রতিবারই ভেবেছি এবার আপনি আসবেন, প্রতিবারই হতাশ হয়েছি।'

মীনাক্ষির কথা শেষ হয়ে যাবার পর সুন্দরভাবে রঙ-করা এবং সুন্দরভাবে সাজান ঘরটাতে তার অস্পষ্ট গুঞ্জন যেন প্রস্থানের পথ-না পাওয়া মানুষের মতো এদিকে ওদিকে মাথা ঠুকে মরতে লাগল।

আমি বললাম, 'গানে কি আপনার বিশেষ অনুরাগ আছে ?'

'অনুরাগ! অত ভাল ভাষায় বলা যায় কিনা জানিনা, তবে গান সম্বন্ধে খুব একটা ইচ্ছে বরাবর অনুভব করে এসেছি। দু'একবার চেষ্টাও করেছিলাম গান শেখবার কিন্তু শেষ অবধি এগোতে যে পারিনি তা'তো বুঝতেই পারছেন। এটা মানেন তো মনের মতো শিক্ষাগুরু না পেলে কোন শিক্ষাই হৃদয়ের সম্বোধন পায় না ?'

আমি মীনাক্ষির দিকে তাকালাম। ওর কথা বলার বেশ নিজস্ব একটি ধার আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'আপনি কি পড়েন ?'

বলল, 'হ্যাঁ, এবছরেই বাংলায় বি. এ. পাশ করেছি।' বলে একটু চুপ ক'রে রইল তারপর আবার মুখটা আমার দিকে তুলে বলল, 'বাংলায় বি. এ. বললাম তার কারণ ওই বাংলা জিনিসটার প্রতি আমার সত্যিকার অনুরাগ আর মমতা আছে। হয়ত বাংলাদেশ থেকে দূরে থাকি বলেই সেই মমতা আর অনুরাগটা বেড়েছে ; কিন্তু আমি তা বলি না, আমি বলি চারপাশে আজ বাংলার প্রতি অন্যায় অবহেলা দেখে দেখে সেই চারপাশের প্রতি জেগেছে একটা আক্রোশ আর ওই আক্রোশই মমতার জন্ম দিয়েছে।'

আমি বুঝতে পারছিলাম হঠাৎ এক জায়গায় আলোচনা থামাতে না পারলে এর শেষ নেই। কথা বলার আশ্চর্য একটি নেশা আছে, সেই নেশায় নেশায় অনেক দূর পর্যন্ত যাওয়া যায়। আমি তা চাইছিলাম না। আমি ঘড়ি দেখলাম, কয়েকবার অমনোযোগী হলাম তারপর জোর করেই বলে ফেললাম, 'এবার যদি অনুমতি দেন তাহলে উঠি, কালকেই চলে যাব তো তাই দরকারগুলো চটপট সেরে নিতে চাই।'

'সে কি'! খুব অবাক হলো মীনাক্ষি। 'এরই মধ্যে যাবেন কি, চা-টা তো কিছুই খাওয়াতে পারলাম না আপনাকে। তাছাড়া বাবা আপনার সংগে আলাপ করবেন ব'লে তাঁর সকালের সব কাজ থেকে ছুটি নিলেন যে! আর আপনাকে যে জন্যে বিশেষ করে আসতে বলা ; আমার সেই দরকারটাই তো বলা হলো না এখনো।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আপনার সেই ভয়ংকর দরকারটা নিয়ে কাল রাত থেকে শাসাচ্ছেন। বলুন তো ব্যাপারটা কি'?

মীনাক্ষি খানিকটা চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আমি আপনার কাছে গান শিখতে চাই।'

ঠিক এমন কথা শুনব ভাবিনি। ভেবেছিলাম বড়লোকের মেয়ে হয়ত কোন একটা শখ মেটাতে চায় আমাকে দিয়ে। হয়ত বলবে আমার একটা রেকর্ড করিয়ে দিন কিংবা রেডিওতে সুযোগ করে দিন আমায়। তাই একটু সময় নিয়ে বললাম। 'সে কী ক'রে সম্ভব বলুন? আপনি রইলেন দিল্লীতে আমি থাকি কলকাতায়। ডাকযোগে তো' আর গান শেখা যায় না'। বলে আমি হাসলাম।

'না, তা কেন! কলকাতায় আমার তো থাকবার জায়গা আছে। আমার কাকা রয়েছেন সেখানে।'

আমি চুপ ক'রে রইলাম। কি জবাব দেব একথার!

মীনাক্ষির চোখে বোধহয় উদ্‌বেগের ছায়া ফুটল আমার এই নীরবতায়। সে বলল, 'এতে তো আপত্তি থাকার কথা নয়। আপনার কাছে তো অনেকেই গান শেখেন, অনেক মেয়েই। তবে আমার বেলায় আপনার সংকোচ থাকবে কেন! তাছাড়া সময়-অসময় আপনাদের গ্রুপকে আমি টাকা দিয়েও সাহায্য করতে পারব, সেটা কত বড় একটা ভরসা বলুন!'

একথায় রাগ করা উচিত ছিল আমার, উচিত ছিল অপমানিত বোধ করা। কিন্তু মেয়েটির এই ছেলেমানুষিতে আমি হেসে ফেলেছিলাম। রাগ করতে পারিনি। বললাম, 'দেখুন অর্থ জিনিসটা সব সময়ই লোভের সন্দেহ নেই। এবং আমি যা' করি তাতে টাকাকে অবহেলা করা মানেই দলের নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু কথা তা' নয়। প্রথমত আমাকে গান শেখাবার ভার দিয়েই আপনি অবাক করেছেন। সেই বিস্ময়ের আকস্মিকতাটুকু কাটাতে পারছি না। তাছাড়া আপনার বাবা কি এতে মত দেবেন?'

আমার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনল মীনাক্ষি। তা'র শরীরটা চেআরের গায়ে অসংকোচে ছড়ান ছিল। পিঠ, কাঁধ ব্যেপে চুলগুলো ছিল উন্মুক্ত হ'য়ে। দু'টো হাতের শক্ত বাঁধন চিবুকের তলায় আনত। ওই ভংগীটা ওর খুব প্রিয়। পরে অনেকবারই দেখেছি ওই ভংগীতে। মনে হয়েছে, ওইভাবে বসতে বসতে ও একদিন ছবি হয়েযাবে, শিল্পীর আঁকা ছবি।

আমার কথা শেষ হবার সংগে সংগেই মীনাক্ষি সোজা হয়ে বসেছিল বলল, 'বাবাকে ডেকে আনব তাহলে ?'

'ডাকুন।'

মীনাক্ষি উঠে গেল। এতক্ষণে আমি ঘরখানার দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেবার অবস্থা পেলাম। যদিও মনে মনে তখন আমি অত্যন্ত অস্থির বোধ করছিলাম। গান শেখার এবং আমার দলে থাকার এই অদ্ভুত প্রস্তাবটা যদি না করত মীনাক্ষি—তাহলে আমি যেন অনেকটা সহজ বোধ করতাম। অনেক অপ্রীতিকর অবস্থাকে এড়ান যেত।

মস্ত বড় মোজেক করা ঘর। ডিমের কুসুমের মতো দেওয়ালের রঙ। সেই রঙেরই সোফা, ডিভান, জানলা ও দরজার পর্দা। মেজেতে খুব দামী একটি কার্পেট পাতা। আসবাবের বাহুল্য বিশেষ নেই। মাঝখানে একটি সেণ্টার টেবিল। টেবিলের গায়ে দাঁড় করান একটা ওআর্ডরোব। একটা বড় বইয়ের আলমারী। তার ওপর ফুলদানী আর বুদ্ধ ও রবীন্দ্রনাথের ফ্রেমে বাঁধানো পাথরের মূর্তি। ঘরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ভেতরে যাবার দরজা। দরজার ওপারে একটি লন-এর ভগ্নাংশ দৃষ্টিগোচর হয়; সবুজাভ একটি বাহুর মতো (আমি যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে)।

পর্দা সরিয়ে আবার ঘরে ঢুকল মীনাক্ষি। পেছন পেছন এলেন একটি ছোটখাট মানুষ। মাথায় চুল নেই, বিদেশী পোষাকে অঙ্গ ঢাকা। হাতে একটি পাইপ।

তিনি ঢুকতেই আমি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি হাতের পাইপ নেড়ে 'সীট ডাউন, সীট ডাউন' বলে আমাকে বসতে

বললেন। আমার বুঝতে কষ্ট হলো না যে, চাকরীর তক্‌মা তাঁর স্বভাবে শক্ত ক'রে আঁটা হয়ে গেছে, সব মানুষকে তাই একই প্রতাপে আদেশ করেন। অনুরোধেও আদেশের সুর ফোটে।

আমি বসলাম। তিনি আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন: 'আমার মেয়ের কাছ থেকে তোমার কথা শুনেছি। তোমার নামটা যেন কী (এইখানে এসে তিনি তাকালেন আমার দিকে)।

'সুশোভন, সুশোভন ঘোষ।'

'হ্যাঁ, তুমি খুব ভাল গান কর বলেছে আমার মেয়ে। বাট য়্যু লুক ভেরী ইয়ং, সো ইয়ং টু বী এ গুড সিংগার। আমি অন্যরকম ভেবেছিলাম। তা যাক্‌গে। তোমাকে কেন ডাকা হয়েছে তা' তুমি নিশ্চয় শুনেছ। আমার মেয়ে তোমার কাছে গান শিখতে চায়।' পাইপ থেকে ধোঁয়া ছেড়ে, খুব অপ্রসন্ন মুখে. ঠিক উদ্ধত ছাত্রের পড়া বলার মতো ক'রে কথাগুলো বলে গেলেন তিনি। আমি লোকটি সম্বন্ধে কৌতুকবোধ করছিলাম। তাঁর আচরণে ভদ্রতার অভাবটুকু গায়ে মাখলাম না।

মীনাক্ষির বাবা আবার বললেন, 'ও-ই আমার একমাত্র সন্তান, গান সম্বন্ধে ওর বরাবর একটা ফ্যান্সী আছে আমি লক্ষ্য করেছি। আর আমি ওর কোন ইচ্ছেতেই কখনো বাধা দিই না। সুতরাং তুমি যদি ওকে গান শেখাও তাহলে আমি খুব খুশী হব।'

আমি বললাম, 'কতকগুলো কথা ভেবে দেখা দরকার। প্রথমত এই গান শেখার জন্যে ওঁকে কলকাতায় গিয়ে থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত উনি যেভাবে মানুষ হয়েছেন, তাতে কি আমাদের এইসব পরিবেশে, এই হট্টগোলে ওঁর আসা ঠিক হবে? তাছাড়া আপনারা আমাকে চেনেন না, শোনেন না—এককথায় অমনি আমার ওপর সব ভার অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্তই বা হবেন কি ক'রে?'

আমার কথায় কে. কে. চ্যাটার্জি যেন একটু অস্বস্তিবোধ করলেন। আগেই লক্ষ্য করেছিলাম মীনাক্ষির মুখে আশাভংগের ছায়া প্রগাঢ় হয়েছে। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'দেখুন আপনি মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন।

আমি আপনার কাছে গান শিখতে চাচ্ছিলাম তার কারণ আমার হাতে এখন প্রচুর অবসর আছে আর অনেকদিনের সাধ, তাই। তবে আপনার কথা শুনে মনে হলো ব্যাপারটার কোথায় যেন আপনার আটকাচ্ছে নইলে আপনি এমন কথা মনে করছেন কেন যে, দু-এক বছর গান শিখলে কিংবা আপনার ট্রুপে জড়িয়ে পড়লে আমার বাকী জীবনটা একেবারে রসাতলে যাবে? ভীষণ রকম অনিশ্চয়তার ঝড়ে আমি খোয়া যাব?'

মীনাক্ষির আগ্রহ দেখে আমি আর আপত্তি করি নি। আপত্তি করার পথ ছিল না। এ আলোচনার নিশ্চিত পরিসমাপ্তি জেনে মীনাক্ষির বাবাও উঠে পড়লেন সোফা ছেড়ে। সেণ্টার টেবিলের ওপর যে ছাই-দানিটা ছিল তাতে পাইপটা ঠুকতে ঠুকতে বললেন, 'যাক্ আমার দায়িত্ব শেষ। এর পরের ভাবনা তোমাদের। টাকা-পয়সার যদি কোন ব্যাপার থাকে সেটা শুধু আমাকে বলো, ব্যবস্থা করে দেব।'

ঝুঁকে পড়ে ছাই ঝাড়ছিলেন তিনি, সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, 'তাছাড়া, সত্যি কথা বলতে কি, ওসব গান-টান আমি বুঝি কম। মিউজিক ইজ গ্রীক টু মী। আমি বুঝি অ্যাডমিন-ষ্ট্রেশন। বুঝি ক্যারেকটার। অ্যাণ্ড য়্যু নো, ক্যারেকটার ইজ এ ন্যাচারাল পাওআর লাইক লাইট অ্যাণ্ড হিট্ এ্যাণ্ড অল্ নেচার কোঅপরেটস উইথ ইট্। অ্যাণ্ড ট্রথ ইজ্ দি সামিট অফ অল ক্যারেকটার্স। অ্যাণ্ড মেন অফ ট্রথফুল ক্যারেকটার আর দি কনসিয়েন্স অফ অল অ্যাডমিনষ্ট্রেশন।'

হঠাৎ এতগুলো ভারী ভারী কথা বর্ষণ ক'রে গটগট ক'রে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। অবাক ব্যাপার! আমাকে একবার বললেনও না যে আমি যাচ্ছি! আমি তাঁর এই ব্যবহারে মর্মাহত হব কিনা যখন ভাবছি, তখনি মীণাক্ষি বলল, 'বাবার স্বভারই ওইরকম। উনি বরাবরই ওই ধরণের মানুষ। যা'রা ওঁকে চেনেনা তা'রা সবাই ওঁর আচরণে ভুল বোঝে ষোল আনা। কষ্ট পায়।'

বলতে বলতে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মীনাক্ষি। আঁচলটা পিঠের ওপর ভাল ক'রে টেনে দিয়ে আমার কাছাকাছি এসে থামল তারপর

সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে আপনি এবেলা এখান থেকেই খেয়ে যান।'

'না, না, তা' হয় না।' আমি বললাম। 'আমার জন্যে সবাই অপেক্ষা করবে। তাছাড়া আমার অন্যান্য কাজও রয়েছে।'

'কথা শুনুন খেয়ে যান।'

'আজ মাফ করুন।'

মীনাক্ষি আর কোন কথা বলল না। শুধু চোখের ভাষায় অনুরোধের তীব্রতাকে এমন অনতিক্রম্য করে তুলল যা' দেখে আমি আর না বলতে পারলাম না। বললাম, 'বেশ তবে তাই হোক।'

৩.

আমি চলে আসবার বেশ কিছুদিন পরে মীনাক্ষি কলকাতায় এল। কাকার বাড়ীতেই উঠল সে। খুব শ্রদ্ধার সংগে গান শিখতে আরম্ভ করল আর দলের জন্যে খুব খাটত। নিজে ঘুরে ঘুরে শো-এর টিকিট বিক্রী করত। লোককে বোঝাত অন্য অনেকরকম নাচ-গান-বাজনার গ্রুপ আছে দেশে কিন্তু আধুনিক গান, নাচ এবং ইনষ্ট্রুমেন্টের ঠিক এমন অর্কেস্ট্রা আর নেই। এমন রুচিসম্মত। এ ধরণের জিনিসকে লোকের পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিত। মোট কথা দলের জন্যে মীনাক্ষি চিন্তা দিল, সময় দিল, পরিশ্রম দিল।

আর, আমি তো জানি মীনাক্ষির ওই মনোযোগটুকু না পেলে আমরা সহজে আজকের এই অবস্থায় পৌছতে পারতাম না। ওর অনেক প্রভাব, খাটবার অযুত ক্ষমতা তাড়াতাড়ি আমাদের জন্যে সফলতা এনে দিল। আমরা দেশের অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম। নাম, পয়সা, সমাদরও পেয়েছি কিছু কিছু। পাঁচ বছর পরে আবার এলাম এই শহরটায়। প্রথম যেবার এসেছিলাম তখন মীনাক্ষি ছিল না। আজ আছে। আজ আমার কাজে ও জীবনে অনেকখানি হয়ে ছড়িয়ে আছে।

অথচ ওকে আমার জীবনে এতখানি অপরিহার্য হয়ে উঠতে দিতে আমি চাইনি। আমি সজাগ ছিলাম। আমি অসহায়ের মতো ঘটনায়

ভেসে যেতে চাইনি। কেননা ঘটনার ফলাফল বিষয়ে আমার বিশেষ কোন আস্থা ছিল না। যদিও আমি জানতাম ভালবাসায় আশ্চর্য একটি ঐশ্বরিক স্পর্শ আছে। তবু নিজেকে সেই অবস্থা থেকে বঞ্চিত রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু রাখতে পারি নি। পারি নি যে তার প্রমাণ মীনাক্ষিকে আজ আমি ভালবাসি।

ভালবাসা—আমি জানি না কথাটার কি মানে করা হয় আজকাল! কত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার চলে তার! কিন্তু এটা আমার অনেকসময় মনে হয় যে, একটি ভালবাসা দিয়ে জীবনের অনেক সংশয় ও সংকটকে দূর করা যায়। তার পবিত্র সান্নিধ্যে মানুষ অন্তত সাময়িক আরামও পেতে পারে। যেমন একটি বই সম্বন্ধে যদি বলতে না পারা যায় যে, 'কমমেরেডো দিস্ ইজ নো বুক; হু টাচেস দিস্ টাচেস এ ম্যান'—তাতে যেমন গুরুতর কর্তব্যহানি ঘটে তেমনি একটি জীবনে ভালবাসার স্পর্শ না পড়লে সেটিতে যেন জীবনের বহুতর অসম্পূর্ণতা করুণ সুরে বেজে ওঠে। এটা জীবন নয়, যে একে স্পর্শ করে সে ভালবাসাকেই স্পর্শ করে —একথা যদি বলতে পারা যেত তাহলে পৃথিবীর কত নোংরা জিনিসই হয়ত ঘটতে পেত না—মাঝে মাঝে এরকম মনে হতো আমার। পরে নিজেই নিজেকে ধমকাতাম—অবাধ কল্পনাবিলাসের প্রশ্রয় দিচ্ছি ব'লে।

ভালবাসা সম্বন্ধে ছোটবেলায় আমার একটি করুণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বহুদিন পর্যন্ত সেই ঘটনার শোচনীয় স্মৃতি আমার মন থেকে মুছে যায় নি।

আমাদের বাড়ী থেকে এক ফার্লং দূরে একটি ডোম তা'র বউ-মেয়ে নিয়ে থাকত। হাসপাতালে কাজ করতে সে। আর মড়া পোড়াবার সময়ও সে-ই এগিয়ে আসত। তার মেয়ের নাম ছিল গুলাবী। কুচকুচে কালো ছিল গুলাবী। কিন্তু তা'র শরীরে যৌবন ছিল, আর একটা ঢলঢলে শ্রী ছিল মুখে। তার বাবা হাসপাতাল কিংবা শ্মশান থেকে যখন মাঝে মাঝে রঙচঙ করা জামাকাপড় সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসত তখন সেগুলো প'রে মাথায় লাল বনফুল গুঁজে

গুলাবীকে সাপের মতো দেখতে লাগত—আমি দেখেছি। তাদের ঘরের কাছে যে শুয়োরগুলো ঘুরে বেড়াত তাদের অকারণে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত সে।

আমাদের ওখানে কয়েকঘর মাত্র মুসলমান ছিল। জুলফিকর আর তা'র বাবা তাহের ছিল খুব গরীব। তবে লোক খুব ভাল ব'লে তাহেরকে ভালবাসত সবাই। তাহের নিজে রাজমিস্ত্রীর কাজ করত। ছেলেকেও সেই পেশায় লাগিয়েছিল। কিন্তু বছরের বেশীর ভাগ সময়ই বসে থাকতে হতো তাদের। বিশেষ কোন কাজকর্ম থাকত না। একবার একটা কাজের খবর পেয়ে বাবা-ছেলে পাত্রসায়ের গেল। কিন্তু দিন কয়েক পরে বাবা ফিরল একা। সবাই জুলফিকরের কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। তাকে সাপে কামড়েছে। কোথায় ছিল গুলাবী, সে একেবারে দাপাতে দাপাতে ছুটে এল—তারপর মাটিতে পড়ে তার সে কি কান্না! কিছুতেই থামান যায় না। সবাই অবাক হয়েছিল গুলাবীর এই আচরণে; তাহেরও। পরে আস্তে আস্তে সব জানা গেল। গুলাবী আর জুলফিকর দু'জন দু'জনকে ভালবাসত। কেউ জানত না, এত নিঃশব্দে ভালবেসেছিল তা'রা।

গুলাবীকে যখন কিছুতেই থামান গেল না তখন বাবা এগিয়ে গেলেন। গোলমাল শুনে আগেই ওপর থেকে নেমে এসে তিনি বাড়ীর সামনে পায়চারী করছিলেন। প্রথমে যান নি কিন্তু যখন দেখলেন কান্নাটা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, ভীড় জমছে বেশী, তখন এগিয়ে গিয়ে তিনি কি যেন বললেন গুলাবীকে। তার একটু পরেই গুলাবী উঠল, কেমন বিহ্বল দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকাতে তাকাতে ঘরে ফিরে গেল।

এরপর বেশীদিন আমি আর গুলাবীকে দেখি নি। কিছুদিন পর থেকেই বর্ষা আরম্ভ হয়েছিল। চারা বোনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল মাঠে মাঠে। শুনেছি গুলাবী নাকি রোজ সন্ধ্যায় ঝড়-বৃষ্টি মাথায় ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ত, মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াত একা। লোকে বলত যে, ভালবাসায় ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তো, তাই ও সাপ খুঁজে

বেড়াত। সাপ খুঁজত নিজেকে দংশন করাবে ব'লে। শেষ পর্যন্ত সেই সাপের কামড়েই মারা গিয়েছিল গুলাবী।

আমি তখন ছোট, বছর বারো বয়স হবে। সেদিন আর কিছু বুঝি নি, তবে দু'টি মৃত্যুর মাঝে প্রাণের যে একটা নিভৃত যোগ আছে সেটা বুঝেছিলাম। সমস্ত ব্যাপারটির করুণ ও ভারী দিকটুকু আমার বুকে চেপে বসেছিল। আর সেই দিনই প্রথম মনে হয়েছিল, জীবনটা সরলরেখায় চলে না। তাতে অনেক ভীষণ ভীষণ বাঁক আছে এবং যা' কিছু পাওয়া যায় এজীবনে তার অনেক কিছুই ধরে রাখা যায় না শেষ পর্যন্ত—সব সময় হারাবার ভয়ে বিচলিত থাকতে হয় (অবশ্যই এত বিন্যস্তভাবে ভাবতে পারি নি সেদিন)।

মীনাক্ষির সংগে আমার সম্পর্কটাযে আর সহজ নেই, মীনাক্ষির বাবা কয়েকবার মেয়েকে কলকাতায় দেখতে এসেই সেটা টের পেয়েছিলেন। মীনাক্ষি বলেছিল, 'বাবা, যেটাকে তুমি সহজ মনে করছ না, আসলে সেটাই সবচেয়ে সহজ সম্পর্ক। এই হয় পৃথিবীতে। একজনের কাছে যেটা খুব সহজ অন্যজনের কাছে সেটাই সবচেয়ে শক্ত—তা কি তুমি জাননা?'

কে. কে. চ্যাটার্জী চুপ ক'রে গিয়েছিলেন। মীনাক্ষির সমস্ত কথাতেই তাঁর এই অসহায় অনুমোদনটুকু প্রথম দিন থেকেই আমি নজর করেছিলাম। আমার যেন একটু অস্বাভাবিক ঠেকেছিল। মনে হয়েছিল মেয়ের প্রতি কোথায় যেন তাঁর একটা অসীম দুর্বলতা রয়ে গেছে। যা তিনি ইচ্ছে করলেই অতিক্রম করতে পারেন না।

আমি এ সম্বন্ধে মীনাক্ষিকে কোনদিন কিছু জিজ্ঞাসা করি নি। মীনাক্ষিও বলেনি কিছু। একদিন, শুধু একদিন তাকে খুব অস্থির দেখেছিলাম। গুটিকয়েক কথায় সে নিজের চারপাশে ধীরে ধীরে যেন একটি অনাবৃত রহস্যকে বিস্তৃত করেছিল তবু, আমি স্পষ্ট ক'রে কিছু জানতে চাই নি।

একদিন বিকেল বেলা। বিকেলটা সেদিন একটি বিষণ্ণ বিদায়ের মতো ধীরে ধীরে সন্ধ্যার দিকে প্রস্থান করছিল (হয়ত প্রতিদিনই করে

কিন্তু আমার সেদিনই মনে হয়েছিল হঠাৎ)। ধোঁয়ার একটা পাতলা আবরণে জড়িয়ে গেছে কলকাতার পথঘাট। লোকজন যাতায়াত করছে, গাড়ী চলছে, রিক্সা ছুটছে কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল তা'রা সবাই যেন ক্লান্ত, একান্তভাবেই ক্লান্ত—বিরাট এক ঔদাসীন্যের কুয়াশাকে ভেদ ক'রে তার ভেতর দিয়ে তা'রা চলেছে।

মীনাক্ষি জানলার সামনে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল। লোক চলাচল দেখছিল রাস্তার। একটু পরে আস্তে আস্তে জানলা থেকে স'রে এসে আমার সামনে বসে সে বলল, 'জান, তোমার সংগে আমার অনেক বিষয়ে মিল আছে। তুমিও তোমার বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান, আমিও তাই। আমিও ছোটবেলায় আমার মাকে হারিয়েছি—তুমিও তাই।'

আমি বললাম, 'তুমি শুধু ওই মিলটুকুই দেখলে? আর কত যে তফাৎ তা'তোমার নজরে এল না? তোমার মতো অর্থ আভিজাত্যের উত্তাপ আমি পেয়েছি?' বলে আমি হাসলাম।

ও বলল,—'না, না ওটা কিছু নয়। আমি হয়ত পৈতৃক অধিকারে খানিকটা টাকা নিয়ে জন্মেছি। কিন্তু তুমি, তুমিও তো পৈতৃক অধিকারে একটা গোটা হৃদয় নিয়ে জন্মেছ!'

আমি বললাম, 'বরং ওটাই কিছু নয় আজকের পৃথিবীতে। হৃদয়ের কত জ্বালা দেখতে পাচ্ছ না?' ব'লে আবার হাসলাম। পরিস্থিতিকে চেষ্টা করলাম একটু লঘু করতে।

কিন্তু আমার লঘুতা মীনাক্ষির গাম্ভীর্যকে তরল করতে পারল না। সে আস্তে আস্তে আবার আসন ছেড়ে উঠে গেল। গিয়ে দাঁড়াল জানলায়। আমি চোখ দেখে বুঝতে পারছিলাম যে, ওর ভেতরে ভেতরে একটা অস্থিরতার প্রবাহ খুব ধীরে ওঠা-নামা করছে।

যেমন ক'রে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবেই আমাকে উদ্দেশ্য ক'রে সে বলল, 'আচ্ছা, মাকে মনে পড়ে তোমার, মাকে?' এত আস্তে এবং এত ঠাণ্ডা একটা গলায় কথা ক'টা বলল যে, মনে হলো মীনাক্ষি যেন অনেক দূর থেকে বলছে। ভাল চলচ্চিত্রে অশরীরীদের কথা-বলবার দৃশ্য যখন অবতারণা করা হয়, তখন যেমন শোনায় অনেকটা যেন তেমনি।

আমি বললাম, 'পড়ে, খুব আব্‌ছা ভাবে।'

মীনাক্ষি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার তা-ও পড়ে না, জান, আমার তা-ও পড়ে না।'

মীনাক্ষিকে হঠাৎ যেন কেমন অসহায় লাগল। তার গলায় কান্নার মতো ভিজে একটা কোমলতা ফুটল।

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

মীনাক্ষি আবার মুখ ফেরাল। একটি যন্ত্রণাকর জবানবন্দীর মতো সে বলতে লাগল, 'আমি বহু চেষ্টা করেছি। মনের ভেতরে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেছি যদি তাঁর কোন ছবি দেখতে পাই। যদি একবারের জন্যেও তাঁর চেহারাটা ফুটে ওঠে, একদিনের কোন একটা ঘটনাও যদি হঠাৎ ছেঁড়া পাতার মতো উড়ে এসে পড়ে আমার স্মৃতির সামনে। কিন্তু পারি নি। আমি ক্লান্ত হয়েছি, অবসন্ন হয়েছি, তবু মাকে আমি মনে করতে পারি নি। সব ঝাপসা হয়ে গেছে। শুধু পরিশ্রমটুকু আমাকে আরো ব্যথা দিয়েছে।'

হঠাৎ মীনাক্ষি থেমে গেল। আশ্চর্যভাবে গুটিয়ে নিল নিজেকে। ভাবনায় নিথর হলো। তারপর খুব সহজ গলায় এবং স্বাভাবিক হাসিতে আবার বলল, 'ওই এক জায়গায় তোমার সংগে এবং পৃথিবীর অনেকের সংগেই আমার গরমিল রয়ে গেছে তো!'

আমি মীনাক্ষিকে কিছুতেই যেন ধরতে পারছিলাম না। এই সন্ধ্যায়, মুহূর্তে ও যেন নিগূঢ় এক প্রহেলিকা হয়ে উঠেছে। আমি অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তার মানে?'

মীনাক্ষি আমার বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মানে? মানে একটা আছে বৈকি! কিন্তু কি হবে সেকথা শুনে, থাক্‌গে।'

মীনাক্ষি চুপ ক'রে গেছে। হেসে অন্য প্রসংগে চলে গেছে। আমিও আর কিছু বলি নি। অযথা কৌতূহল দেখাই নি। বুঝেছিলাম এ নিয়ে বেশী জিজ্ঞাসাবাদ করলে তা'র বেদনাই শুধু বাড়ানো হবে।

পাঁচ বছর পরে আবার দিল্লীতে এলাম। এলাম দ্বিতীয়বার অনুষ্ঠান

করতে। সময়ের হিসেবে পাঁচটা বছর হয়ত তেমন কিছু দীর্ঘ নয় কিন্তু এই ক' বছর আমাকে অনেক ব্যস্ত জীবন যাপন করতে হয়েছে আর সবচেয়ে বড় কথা মীনাক্ষি এই ক' বছরে আমার কাজের ও জীবনের মাঝে এমন শক্তিতে দাঁড়িয়েছে যা'তে আমি আমার চারপাশের সব কিছুতে একটা মানে খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু মনের অস্বস্তিকে আমি কখনোই কাটাতে পারলাম না।

বহুদূর এসে পড়েছিলাম। অনেকটা পথ ফিরে যেতে হবে। যেতে হবে সেই জনপথ হোটেলে। আমি আর হাঁটতে পারছিলাম না। খুব পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছিল নিজেকে। একটা টাঙা ডাকলাম।

মীনাক্ষির বাবা একবার বিয়ের কথা তুলেছিলেন। বলেছিলেন 'মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারটা সব বাপের কাছেই এক সমস্যা, জান তো?' মীনাক্ষি বলেছিল, 'হ্যাঁ। ঠিক সময়ে তোমার সে চিন্তা দূর করে দেওয়া হবে।' তারপর আমাকে বলেছিল কলকাতায় ফিরে, 'এবার একটু এদিকটা ভাল ক'রে ভাবো। বাবা যে খুব তাড়া দিচ্ছেন।' আমি বললাম, 'বুঝেছি। কিন্তু একটা সমস্যাকে তাড়াতাড়ি দূর করতে গিয়ে আচমকা কত সমস্যাই যে এসে পড়তে পারে তার খেয়াল রাখ? তার চেয়ে নিজেদের আরেকটু গোছগাছ হোক্, জীবন সম্বন্ধে এবং ভালবাসা সম্বন্ধে আরেকটু নিরাপত্তা আসুক—তারপর।'

'মানে? কি বলতে চাইছ তুমি?' মীনাক্ষি অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করেছিল।

আমি হেসে বলেছিলাম, 'দেখ, তোমরা; মেয়েরা যতই ভালবাসার কথা, নিজেদের জীবিকার কথা, কিংবা প্রগতির কথা বলনা কেন, আসলে তোমাদের চাহিদাগুলো আজও পুরনো রীতিকেই আশ্রয় ক'রে আছে। মনে মনে তোমরা এখনো পুরুষদের কাছে চাও নিশ্চিন্ত ভরসা —সে ভরসাটা টাকা, পয়সা প্রতিষ্ঠায় হলেই খুশী হও বোধ হয়। তোমাদের মানসাংক আজও মেয়েদের মৌলিক এবং সাধারণ ইচ্ছে অনিচ্ছের বাঁধা হিসেবকে ত্যাগ করতে পারে নি। তোমরা মুখে হয়ত বলো, তোমরা অনেক এগিয়েছ কিন্তু জীর্ণ বিশ্বাসগুলো সম্বন্ধে কি-

ভাবে তোমাদের ভেতরে কাজ করে তা' তো' আমি দেখেছি —এ আর কি! তাই চূড়ান্ত রজ্জুটি পরবার আগে সেসবগুলো একটু বেঁধেছেঁদে ঠিকঠাক করে নিতে চাইছিলাম যাতে কোনদিন কোন ফাঁকে তা'রা আমাদের কাবু করতে না-পারে।'

'ওই ভাবে কি তুমি সব বাঁধতে পার! কাবু হবার কিংবা কাবু করবার রাস্তা কি একটা থাকে জীবনে! আসলে তুমি যত নিশ্চিন্ত হয়ে বাঁধবে, তত অনায়াসে খুলতে থাকবে সব। আর, সেসব খোলার মজা কি জান, কিছুতেই আ-র বাঁধা পড়তে চায় না। বাজাতে বাজাতে তোমার স্বরোদের তার ছিঁড়ে গেলে তাকে ঠিক ক'রে আবার বাজানো চলে কিন্তু মনের তার ব্যথায় বাজতে বাজতে ছিঁড়ে গেলে তাকে ঠিক ক'রে পুরনো সুরে বাঁধা যায় না। তাই অত তলিয়ে না-ভেবে সামনে যা দেখা যায়, যা পাওয়া যায় তাতেই মন শক্ত ক'রে তোমার বিশ্বাস স্থাপন কর।'

'আমার সামনে তো এখন তুমি আছ; তোমাকেই দেখছি।'

'তাহলে আমাতেই বিশ্বাস রাখ।'

হাসল মীনাক্ষি। আমিও হাসলাম।

৪.

শব্দের একটা মিছিল তুলে ছুটছিল টাঙাটা।

নির্জন এবং নিঃশব্দ রাতের রাস্তায় ওইভাবে যেতে যেতে আমার মনে হলো আমি যেন কোন এক আশ্চর্য রাজ্যে প্রবেশ করতে চলেছি। যেখানে শব্দ নেই, স্পর্শ নেই কিন্তু বিস্ময় ছড়িয়ে আছে, শান্তি আছে পাহারায়।

কানের পাশ দিয়ে হু-হু ক'রে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল। সামনে নিরবয়ব, অন্তহীন অন্ধকার। কিন্তু রেশমের মত নরম। আমার চোখে মুখে, শরীরে সেই অন্ধকার ক্রমাগতই যেন হাত বুলিয়ে চলল। আমি মুগ্ধের মতো বসে রইলাম।

॥ পূর্বাহ্ন ॥

১.

আমার একটা ভাই হয়ে মরে গিয়েছিল। আমার তখন বছর পাঁচেক বয়স হবে বোধ হয়। বেশী কিছু মনে পড়ে না, শুধু মনে আছে বাড়ীতে সেদিন আশপাশ থেকে অনেক লোক এসেছিল। সবাই কথা বলছে খুব নিচু স্বরে, পা টিপে টিপে চলাফেরা করছে আর সবার চোখের চাহনি খুব বিচলিত। আমার দিকে কেউ নজর দিচ্ছিল না। আমি একা একা বাড়ীময় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছিলাম সকলের কিন্তু ওপরে বাবার ঘরটার কাছে যেতে পারছিলাম না। সেখানেই মা আছে।

কিন্তু মা'র তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে আমার আর কোন কথাই মনে নেই। কারণ মা-কে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। গয়লা বৌ আমাকে ওপরে যেতে দেয় নি। আমি বুঝতে পারছিলাম কোথায় কী যেন একটা হয়ে যাচ্ছে অথচ আমাকে কিছুই জানান হচ্ছে না। বাবাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি নি, তিনি যেন আমাকে দেখেও দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর, আর চোখটা লাল-লাল। বাবা কি তবে কাঁদছিল? ভেবেছি আমি।

কিছুক্ষণ পরে পাশের পাঠক-কাকাদের বাড়ী থেকে আমায় নিয়ে যেতে লোক এল। আমি গেলাম না। বোধহয় কান্নাকাটি করেছিলাম। গয়লা বৌ আমাকে কত বোঝাল। তা'র বাড়ীতেই নিয়ে যেতে চাইল। তবু আমি গেলাম না। কিন্তু একটু পরে রথতলার তিনুর ঠাক্‌মা এসে আমাকে জোর ক'রে নিয়ে গেলেন। আমি যেতে চাইছিলাম না, হাত-পা ছুঁড়ে প্রতিবাদ করছিলাম। কিন্তু পাঠক-কাকা আর তিনুর ঠাক্‌মা মিলে আমাকে জোর ক'রেই নিয়ে গেলেন। যাবার সময় হঠাৎ পেছন ফিরে দেখি বাবা ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার সংগে চোখাচুখি হতেই তিনি চট্ ক'রে সরে গেলেন।

ছোটবেলার কতক কতক জিনিস মনে এমন বসে যায় যা' বয়স হলেও কিছুতেই মুছে যায় না। মা'র চেহারাটা আমার কাছে আজ আবছা হ'য়ে গেছে কিন্তু মা আমাকে ঘুম পাড়াবার সময় যে-গানটা গাইতেন তার অস্পষ্ট সুরটা যেন আজও আমার কানে ভাসে। তাছাড়া মাকে ঘিরে সেদিনকার সেই রহস্য, সকলের উদ্‌বেগ আর আমার একাকীত্ব—আমি যেন চোখ বুজলে আজও দেখতে পাই। খণ্ড খণ্ড ভাবে হঠাৎ মনের আয়নায় ছায়া ফেলে। তাছাড়া অনেক কথা পরে বাবার কাছেও শুনেছিলাম।

তিনুদের বাড়ী আমি তিন দিন ছিলাম। সেখানেই খাওয়া-দাওয়া করেছি। তিনুর জামা-কাপড় পরেছি। বাড়ী যাবার জন্যে কান্নাকাটি করেছিলাম কিন্তু আমাকে যেতে দেওয়া হয়নি। নানা কথায় ভুলিয়ে রাখা হয়েছিল। ভুলিয়ে রাখা কথাগুলো কি ছিল আজ আর তা মনে করতে পারি না। কিন্তু এটা ঠিক পরের দিকে আমি শান্ত হ'য়ে গিয়েছিলাম। আর কান্নাকাটি করি নি। আমার ক্ষোভ, দুঃখ এবং ভাবনাটুকু আস্তে আস্তে মরে আসছিল।

পরের দিন বাবা আমাকে দেখতে এলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ কাছাকাছি থাকতে পারলেন না। কেবলি তাঁর চোখ দু'টো লাল হয়ে উঠছিল। আমি জানতে চেয়েছিলাম, কবে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হবে আমাকে! মা, মা-কে আমি কেন দেখতে পাচ্ছি না? বাবা ভাল ক'রে জবাব দিতে পারেন নি, তাড়াতাড়ি উঠে চলে গিয়েছিলেন।

তিনু আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিল এবং আমি তা'র সংগে খেলতাম না। আমি কারুর সংগেই খেলতাম না। পরেও না। একা একা থাকতাম। আমি অতসী গাছ আর হাস্নুহানার সংগে থাকতাম। বাড়ীর পেছনে শাক-সবজীর যে বাগান করেছিলেন বাবা আমি তারইমাঝখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। ইলেকট্রিকের তার আর থামের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম, হঠাৎ দূরে কখনো ট্রেনের আওয়াজ শুনলে বুকটা আমার কেমন খালি-খালি লাগত। তাহের মিস্ত্রী বিকেলে ঘরে ফেরবার সময় হঠাৎ দেখা হ'লে বলতঃ 'কি গো বাবু, একা একা শুধুই ঘুর্যে বুলছ

কেনে ?' আমি জবাব দিতাম না। বড় বড় চোখ ক'রে তাকিয়ে থাকতাম। ও চলে যেত, সূর্য যেদিকে অস্ত যায় সেদিক পানেই চলে যেত। তারপর আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসত। পাখীদের ডাকাডাকি আর থামতে চাইত না যেন। বাবা তখন চোখের চশমাটা খুলে ওপরের বারান্দা থেকেই ডাকতেন, 'খোকা, ঘরে এস।' আমি অমনি মুহূর্তে আমার সব ভাবনাকে ঘরের দিকে ফেরাতাম। তারপর পেট্রোম্যাক্স জ্বলত। আমি পড়তে বসতাম।

পরের দিন কুয়োতলায় চান করতে গিয়ে তিনু আমাকে বলল, ''জানিস একটা খবর ?'

আমার মন ভাল ছিল না। তিনুর কোন আশ্চর্যকর খবরেও আমার আগ্রহ ছিল না। তাই কোন জবাব না দিয়ে আমি চুপ ক'রেই রইলাম।

তিনু বলল, 'তোর মা মারা গেছে, জানিস ?'

আমি কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়েছিলাম তা'র দিকে তারপর শুধু বললাম 'যাঃ !'

'হ্যাঁ, রে সত্যি। ঠাক্‌মা তো' বলছিল মা-কে। তাছাড়া আমি তো নিজে কাল দেখলাম, বাবা গামছা কাঁধে নিয়ে শ্মশানে গেল।'

আমার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করছিল। কিন্তু আমি একটুও কাঁদলাম না। চেঁচামেচি করলাম না। কেবল গুম হয়ে রইলাম সারাদিন। বিকেলবেলা তিনু আমাকে খেলতে ডাকল। আমি গেলাম না। তিনুদের বাড়ীর পাশে আতা গাছটার তলায় বসে রইলাম একা। সামনে একটা বড় কালো পাথর ছিল। ত্রিভুজের মতো আকার তা'র। পাথরটার গায়ে বিকেলের রোদ এসে পড়েছিল। অনেকক্ষণ পরে পাথরের গা থেকে আস্তে আস্তে সেই রোদটা সরে গেল। ছায়া ফেলল প্রকাণ্ড।

তবু আমি বসে রইলাম। তারপর চারদিকের ফাঁকা জায়গাটা ঘিরে যখন কালো-পশম অন্ধকার ঘন হয়ে এল, তখন তিনুর ঠাক্‌মা আমাকে ডাকতে এলেন।

'ও-মা তুই এখানে চুপ্‌টি ক'রে একলা বসে আছিস—এদিকে আমি যে তোকে খুঁজে খুঁজে সারা চ' বাড়ী চ'।'

বাড়ী! বাড়ী কথাটায় আমি আগ্রহে ও উৎসাহে তিন্নুর ঠাক্‌মার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম কিন্তু তখুনি আমার ভুল বুঝতে পারলাম যেন। বাড়ী মানে তিন্নুদের বাড়ী।

আমি কোন প্রতিবাদ করলাম না। চুপ ক'রে উঠে গেলাম। খাওয়া-দাওয়া করলাম। দেখলাম, সকলে আমাকে নিয়ে খুব ব্যস্ত হলো। আমার সংগে নানা কথা ব'লে আমার গাঢ় মৌনতাকে ভেঙ্গে একটু অন্যমনস্ক অবস্থা তৈরি করতে চাইল। কিন্তু পারল না। আমার এখন মনে হয় তা' পারা যায় না। মানুষের এমনি কতকগুলো ভুল ধারণা থাকে।

দু'টো চৌকি জোড়া একটা ঢালা বিছানার মাঝখানে শুয়ে পড়লাম আমি। একবারও দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। সারা রাত্তির অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে জেগে রইলাম। সবাই ঘুমোচ্ছে। তাদের নিঃশ্বাস পড়ছে, নাক ডাকছে। সমস্ত ঘরটাকে কবরখানা বলে মনে হচ্ছিল আমার। মনে হচ্ছিল আমি একাই শুধু জীবিত। আর ওরা, যাঁ'রা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে তা'রা মৃত। কোনদিন আর জেগে উঠবে না বলেই তা'রা ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার ভয় ভয় করতে লাগল। তবু আমি প্রাণপণে তাকিয়ে রইলাম অন্ধকারের দিকে।

সকালবেলা বাবা এলেন। গায়ে হাত বুলিয়ে কাছে টেনে নিলেন। তারপর একসময় খুব মিষ্টি ক'রে বললেন, 'চল্‌ বাড়ী যাই।' আমার অভিমানটা আবার নতুন ক'রে বেঁচে উঠল। আমি তাঁর কাছ থেকে একটু সরে যেতে চাইলাম। কিন্তু তিনি আমার ডান হাতের আঙুল দু'টো ধ'রে আবার বললেন, 'চল্‌।'

আমি বাবাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করি নি। তিন্নু যে ভয়ংকর খবরটা আমাকে শুনিয়েছে তার কথা বলে শুধোই নি কিছু। পথে যেতে যেতে বাবা বারবার আমার মুখের দিকে তাকিয়েছেন। কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারেন নি। কেবল একটু একটু অপ্রতিভ হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন।

বাড়ীর যত কাছে আসছিলাম তত বুকটা আমার ভুরু-ভুরু করছিল। এইরকম আরেকবার হয়েছিল। বাবার অসুখের খবর পেয়ে কলকাতা থেকে বাড়ী আসছিলাম আমি। কিন্তু তখন বড় হয়েছি, অনুভূতিটা আরো তীক্ষ্ণ হয়েছে, তাই উদ্‌বেগ, আশংকা এগুলোর শক্তি আমি স্পষ্ট ক'রে টের পেয়েছিলাম ; অনেক বেশী ক'রে।

ফাঁকা, ফাঁকা, আশ্চর্যরকম ফাঁকা বাড়ীটা ! পরশুদিনের আগে মাকে আমি যে ঘরে শু'তে দেখে এসেছিলাম আজ সে ঘরটা হাট ক'রে খোলা। হা-হা করছে বিছানাবিহীন খাট। উন্মুক্ত দরজা-জানলা দিয়ে অস্বাভাবিক-রকম আলোয় ঘরটা যেন নতুন ক'রে স্নান করছে।

আমি খাটের বাজু ধ'রে দাঁড়ালাম। পিছু পিছু বাবা এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি চোখ ফিরিয়ে তিনুর কাছে শোনা নির্মম সত্যটার স্পষ্ট সমর্থন খুঁজলাম বাবার কাছে। বাবা কোন কথা না ব'লে টুপ্ ক'রে আমাকে বুকে তুলে নিলেন। আমি বাবার পিঠে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম।

আমাকে বাবা আর কখনো বুক থেকে নামান নি। মারা যাবার আগে পর্যন্ত আগলে রেখেছেন। বড় হয়ে আমি যখন তাঁর কাছছাড়া হয়েছি তখনো তাঁর বুকের ভেতরেই থেকেছি। আমার একটু কিছু হলেই তিনি টের পেতেন। একটু মনোকষ্ট, একটু শারীরিক দুর্বলতা হলেই তিনি ছাতনা থেকে ছুটে ছুটে চলে আসতেন। হঠাৎ বাবাকে দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম, রীতিমত উদ্‌বিগ্ন। কিন্তু তিনি অল্প অল্প হেসে অপরাধীর মতো বলতেন, 'জানিস খোকা, কেমন যেন মনে হলো তোর শরীরটা খারাপ হয়েছে। তাই আর ওখানে তিষ্ঠোতে পারলাম না। চলে এলাম একবার দেখতে।'

আমার যখন সাত-আট বছর বয়স তখনো পর্যন্ত বাবা কোনরকমে ওকালতিতে টিঁকে ছিলেন। তারপর আর পারেন নি। আমি বুঝতে পারতাম বাবার মনে অদ্ভুত একটা ঔদাসীন্য তাঁকে যেন ক্রমশ বা'র থেকে ভেতর পানে টানছে। সাংসারিক কাজের ধারাবাহিকতায় তিনি আর স্বস্তি পাচ্ছেন না। আইনের বইয়ের পাশে পাশে গীতা, উপনিষদ,

কাব্য, সাহিত্য, দর্শনের বই এসে জুটেছিল। তিনি আস্তে আস্তে তাতেই তন্ময় হয়ে যেতে লাগলেন।

একদিন রাত্তিরে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়বার পরও যখন আমার ঘুম এল না তখন আমি গুটিগুটি উঠে বাবার পড়বার ঘরে এলাম। তখন শীতকাল। বাবার একটা চকোলেট-রঙের বালাপোষ ছিল। তিনি সেটা গায়ে দিয়ে চেআরে বসে কি পড়ছিলেন। টেবিলের ওপর পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। মুখের ভাপ দেওয়ার মতো একটা নিরবচ্ছিন্ন, একটানা শব্দ হচ্ছে তার। বাকী ঘরটা থমথমে।

বাবা গুনগুন ক'রে পড়ছিলেন: 'সোপক্রমং নিরূপক্রমঞ্চ কর্ম তৎ সংযমাদ অপরান্ত জ্ঞানম্ অরিষ্টে ভ্যো বা।'

আমি নিঃশব্দে তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, 'বুঝলি খোকা, আমরা তো মৃত্যুশীল মানুষ। আয়ুই হচ্ছে আমাদের ফল। কিন্তু তার পরের কথা জানতে গেলে, মৃত্যুর ওপরে উঠতে গেলে সংযম চাই—সংযমই জীবন, সংযমই কর্ম। এইরকম কর্ম হচ্ছে দু'রকম। সোপক্রম ও নিরূপক্রম। একটা তাড়াতাড়িতে হয়, আরেকটা হয় দেরাতে। অরিষ্টের দ্বারাও সেই জ্ঞানলাভ হতে পারে। অরিষ্ট কি জানিস?'

এত কথা বোঝবার বুদ্ধি ও বয়স তখন আমার হয়নি। আমি অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি নিজের ভুল বুঝে লজ্জা পেলেন। আমার অবস্থা দেখে বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা আরেকটু বড় হও তখন সব বুঝতে পারবে। এখন চল্ শু'তে যাই।'

দারিদ্র্য কি জিনিস আমি কৈশোরের অনেকদিন পর্যন্ত জানতাম না। আস্তে আস্তে টের পেতে লাগলাম। যদিও বাবা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন তার আঁচ আমি তেমন ক'রে বুঝি নি। কিন্তু বাবার অবস্থা বুঝতে পারছিলাম। বাবা যে বেঁচে থাকবার আয়োজন করতে করতে শুকিয়ে উঠছেন ক্রমশ, তা দেখে আমারও অস্বস্তির সীমা পরিসীমা ছিল না।

বলতে গেলে মা'র মৃত্যুর পর থেকেই ওকালতি করা ছেড়ে

দিয়েছিলেন বাবা। রাসবিহারী ঘোষের জুনিঅর হবার মোহ তাঁর আর ছিল না। ছাতনা থেকে চার মাইল দূরে একটা ইস্কুল ছিল। হপ্তায় তিন দিন ক'রে তিনি সেখানে পড়াতে যেতেন। কিন্তু একটি পয়সাও নিতেন না। আমিও সেই ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম।

বাবাকে তখন বহু সময় বিচলিত দেখতাম আমি। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে আসতেন না। নীচের ঘরে পায়চারী করতেন। সবসময় কি যেন ভাবছেন,—আচম্‌কা ডাকলে এমন চম্‌কে উঠতেন যে দেখে ভয় হতো। মাঝে মাঝে অবনী জ্যাঠাকে তাঁর কাছে আসতে দেখতাম। অবনী জ্যাঠা বাবার এক জ্ঞাতি ভাই। গ্রামের পয়সাওয়ালা লোক ব'লে খ্যাতি ছিল তাঁর। এই সময় হঠাৎ একবার বাবা কলকাতা থেকেও ঘুরে এলেন।

আরেকটা ঝোঁক চেপেছিল এই সময়। প্রায়ই রাত্তিরে তিনি বাড়ী থাকছিলেন না। আমি ঘুমিয়ে পড়লে চুপি চুপি বেরিয়ে যেতেন। বসে থাকতেন শ্মশানে গিয়ে। সারারাত সেখানে কাটিয়ে ভোরের আলো ফোটবার আগেই বাড়ী ফিরতেন। তারপর স্নান ক'রে আহ্নিকে বসতেন। আমি এসবের বিন্দু-বিসর্গও জানতাম না। একদিন সকালে হঠাৎ নিচে নেমে এসে পাঠক-কাকার গলা পেলাম। তিনি বাবাকে বলছেন, 'না, মুরারীদা এ ভাল কথা নয়। এক-আধদিন যাও সে আলাদা। কিন্তু প্রায়ই শ্মশানে গিয়ে রাত কাটানো এ-বড় ভয়ংকর ব্যাপার। কি বিপদ-আপদ ঘটবে তার কি কোন ঠিক আছে? বৌদি নেই বলেই তো' তুমি নিজের জীবনটাকে যেভাবে খুশী বিলিয়ে দিতে পার না! খোকা, খোকা রয়েছে না? তা'র কথাটাও তো' ভাবতে হবে?'

একটু পরেই বাবার গম্ভীর গলাটা শুনতে পেলাম। মনে হ'লো তিনি যেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'হ্যাঁ, পাঠক। ওর জন্যেই যত ভাবনা। আমি ছাড়া ওর তো' কেউ নেই। নইলে কবে বেরিয়ে পড়তাম সংসারের মায়া ছেড়ে। এত দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্য আর সহ্য করা যাচ্ছে না।'

বাবা কখনো কারো কাছে নিজের অবস্থার কথা করুণভাবে বলতেন না। সেটা তাঁর স্বভাব-বহির্ভূত। শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি সেই স্বভাবকে পালন করেছিলেন। হঠাৎ তাঁর মুখে এধরণের কথা শুনে আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, অনেক কারণে বাবা আজ সুখী নেই আর বাবা যখন সুখী নেই তখন আমারও সুখী থাকার কথা নয়।

মনে আছে সেদিন ইস্কুলে গিয়ে কিছুই ভাল লাগে নি আমার। মাষ্টারমশাইরা পড়াচ্ছেন, ক্লাসময় সবসময় মৌমাছির মতো একটা গুঞ্জন উঠছে, বাইরে চিল ডাকছে 'চী-ঈ-ঈ-লো', একটা ছেলে গরুর লেজ মুলে দিচ্ছে, আর একটা নিস্তব্ধ দুপুর রোদে পুড়ছে—এসব কিছুই মনে আমার দাগ কাটছিল না। চোখে পড়ছিল বটে কিন্তু মনে বসছিল না। কে যেন সংগে সংগে মুছে নিচ্ছিল, শ্লেটের লেখাকে ন্যাতা দিয়ে মুছে নেবার মতো ক'রে।

ওকালতিতে বাবার খুব যে কিছু আয় হতো তা নয় কিন্তু মা মারা যাবার সময় থেকে বাইরের পয়সা ঘরে আসা একেবারেই বন্ধ হয়েছিল। অথচ খরচের অন্ত ছিল না। মা'র কাজেও প্রচুর খরচ করেছিলেন বাবা। গ্রামে তাঁর একটা সম্মান আছে, তাই গ্রামসুদ্ধ লোককে বলতে হয়েছিল। কলকাতা থেকেও কাউকে কাউকে বলেছিলেন।

ওই বাড়ীটুকু আর কিছু জায়গা-জমি ছাড়া সম্পত্তি বলতে আমাদের আর কিছু ছিল না। বাবার যিনি বাবা ছিলেন, অর্থাৎ আমার ঠাকুর্দা তিনি আরো খেয়ালী ছিলেন এবং আরও পণ্ডিত। অংকে এবং সংস্কৃতে অত গভীর পাণ্ডিত্য খুব বেশী দেখা যেত না বলে শুনেছি। কিন্তু তিনিও সংসারের ধারাবাহিকতায় আনন্দ পেতেন না,সব সময়েই নিজের জগতে থাকতেন। তাই টাকা-পয়সা, জায়গা-জমি, সংসার—এসব কিছুই তিনি খুব গুছিয়ে রেখে যেতে পারেন নি, বরঞ্চ কিছু ধার-কর্জও ক'রে গিয়েছেন। এবং বাবাকে দিয়েছিলেন তাঁর আত্মিক উত্তরাধিকার। খুদ-কুঁড়ো আমাদের যেটুকু হয়েছিল তা' হয়ত বাবাও

করতে পারতেন না যদি তার পেছনে মা'র উদ্যম না থাকত। মা খুব সঞ্চয়ী ছিলেন বলে আমি শুনেছি।

ওকালতি ছেড়ে দেবার পর এবং সংসারের আয় বন্ধ হ'য়ে যাবার পর বাবা যে তলায় তলায় নিজেকে কিভাবে নিঃশেষ ক'রে আনছিলেন তা' বুঝি নি ; হয়ত বোঝবার বয়সও ছিল না তখন। কিন্তু একদিন টের পেলাম।

অবনী জ্যাঠার পয়সা ছিল কিন্তু মনটি তাঁর ভাল ছিল না। তিনি সুযোগ বুঝে অনেক মানুষের সর্বনাশ করেছেন, এরকম কথা প্রায়ই লোকে বলে যেত বাবার কাছে। কিন্তু বাবার তিনি সম্পর্কে ভাই। আর বাবাকে তিনি খাতিরও করতেন যথেষ্ট। তিনি যে বাবার সংগে কোন দিন খারাপ ব্যবহার করবেন তা' কল্পনাও করতে পারা যায় নি। বাবা কিছু টাকা নিয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকে। কথা ছিল তিনি সুদ সমেত টাকাটা সময়মত ফেরৎ দেবেন। অবনী জ্যাঠা তখন হাঁ-হাঁ ক'রে উঠেছিলেন—'সে কি কথা, সে কি কথা! সুদের প্রশ্ন আসছে কি ক'রে ? তোমার কাছ থেকে সুদ নেব, আরে ছি-ছি-ছি। আমার যে মহাপাপ হবে।' সেই লোক বছর না ঘুরতেই হঠাৎ জমি-বিক্রীর কবালা করিয়ে নিয়ে এলেন। আমাদের জায়গা-জমিটুকু লিখে দিতে হবে তাঁর নামে।

আমার মনে আছে বাবা সেদিন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে অবনী জ্যাঠার সংগে তর্ক করেছিলেন্। বাবাকে অত রাগতে আমি কোন দিন দেখি নি। থরথর ক'রে তাঁর সব শরীর কাঁপছিল। গলার স্বরটা গম্‌গম্‌ করছিল সারা ঘরে। আমি তাঁর গলা পেয়ে ওপর থেকে নেমে এসেছিলাম। শুনলাম বাবা বলছেন, 'অবনীদা তাহলে কি আমায় এই ধরে নিতে হবে যে, সুবিধে বুঝে তুমি আমার জায়গা-জমিগুলো গ্রাস করলে ?'

'আহা-হা! তুমি বুঝতে পারছ না মুরারী। তোমার জিনিস তোমারই থাকছে গো এখন শুধু একটা ট্রান্সফার ডীড্ করিয়ে রাখছি মাত্র। তার জন্যে এত চিন্তিত হচ্ছ কেন তুমি ?' বাবা বললেন, 'তুমি বোধহয় ভুলে গেছ অবনীদা, আমি আইন পড়েছিলাম। তাই, তুমি কি

বলতে চাইছ তা' বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হচ্ছে না। এইসব নোংরা ঘাঁটিতে হয় বলেই আমি আইনের জগত ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু তোমার সংগে তো' আমার এসব কথা ছিল না। আজ যদি আমি তোমার টাকার কথা অস্বীকার করি? কী করতে পার তুমি?'

চোখ-মুখ কুঁচকে এক রকমের ধূর্ত হাসি হাসলেন অবনী জ্যাঠা। বললেন, 'তা তুমি পার না মুরারী, আমি জানি তা' তুমি পার না। মাথার ওপরে ভগবান নেই?'

'থাক্ থাক্ ভগবানের কথা তোমার মুখে শুনতে চাই না।' চেআর ছেড়ে উঠে পড়লেন বাবা। ঘরময় অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগলেন। তারপর বললেন 'যাক্, তোমার সংগে কথা বলার আর আমার প্রবৃত্তি নেই। তুমি নিয়ে যাও, মা-মরা ছেলের ওইটুকু বিষয় নিয়ে তুমি খুশী হও। তবে সম্পর্কে ভাই হয়ে তুমি যে এমন ক'রে ছুরি চালাবে তা' ভাবি নি। জানলে অন্য কোন সুদখোর মহাজনের কাছ থেকেও টাকা নেওয়া ভাল মনে করতাম, তবু তোমার কাছে নয়।'

'মুরারী তুমি আমার অবস্থাটা একটুও বিবেচনা করছ না। কাল যদি তোমার ভাল-মন্দ কিছু একটা ঘটে তাহলে আমার টাকাটার যাতে হিল্লে হয় শুধু তারই সামান্য ব্যবস্থা করে রাখছি বৈ তো' নয়। জমি তো' তোমার ছেলেরই থাকছে গো। সুশোভন কি আমার পর!'

'ব্যস্ ব্যস্ যথেষ্ট হয়েছে অবনীদা। তুমি এখন যাও, তুমি এখন যাও অবনীদা। আমি তোমার ডকুমেণ্ট পরে সই ক'রে পাঠিয়ে দেব। বেশীক্ষণ তোমার নিঃশ্বাস এবাড়ীতে পড়লে আমার ছেলের অমঙ্গল হবে।'

তীব্র ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিলেন বাবা। তারপর কোঁচাটা ঝেড়ে বিদ্যাসাগরী চটিতে লম্বা ও ভারী শব্দ তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

সেদিন আমি অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে জেগে ছিলাম। বাবা যখন শুতে এলেন আমার পাশে তখন আমি আস্তে আস্তে ডাকলাম, 'বাবা!'

'কি বাবা, তুই এখনো ঘুমোস নি?'

আমি অন্ধকারে হাত চালিয়ে চালিয়ে তাঁর গালটা খুঁজলাম। তারপর গালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, 'তুমি কিছু ভেবনা বাবা, আমি আরেকটু বড় হয়েই টাকাপয়সা রোজগার করব আর তখন অবনী জ্যাঠার কাছ থেকে আমাদের জিনিস সব নিয়ে আসব।'

বাবা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন, তারপর বললেন, 'আচ্ছা বাবা, তুমি এখন ঘুমোও।'

এসব অনেক কথাই আমার মনে ছিল না। হয়ত থাকবার কথাও নয়। পরে হাসতে হাসতে বাবা সব গল্প করেছেন। আমি যখনই কলকাতা থেকে ছাতনা গেছি—রাত্তিরে খেতে বসে এবং খাওয়ার পরে অনেক রাত পর্যন্ত কতরকম কথা হতো আমাদের। বেশীর ভাগ সময়ই বাবা বলতেন আর আমি শুনতাম। বাবার কথা যেন আর থামতেই চাইত না আমাকে পেলে। শেষ পর্যন্ত আমিই জোর ক'রে তাঁকে তুলে দিতাম। বিছানায় শুইয়ে মশারী ফেলে দিয়ে, গায়ে একটা ঢাকা দিতাম। কপালে একটু হাত বুলিয়ে হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেট কেড়ে নিয়ে বলতাম, 'তুমি এত সিগারেট খাও কেন বাবা, একটু কমাও তো!' হা-হা ক'রে বাবা হেসে উঠতেন, বলতেন, 'তোরও শাসন আর সহ্য করতে পারি নে খোকা। কিছুই তো' করি না। একটু সিগারেট খাব, তাও খেতে দিবি না তুই, ধম্‌কাবি?'

আমার যখন তেরো বছর বয়স তখনই আমি কলকাতায় চলে আসি। বাবার এক সহৃদয় বন্ধু ছিলেন কলকাতায়—নাম রামতনু চক্রবর্তী। মা'র কাজের সময় তাঁকে প্রথম দেখি। তিনি ছাতনায় এসেছিলেন। আমার মনে হয়েছে তিনি যেন বাবার মতোই উদার চরিত্রের মানুষ। মানুষটি যেমন স্নেহ-বৎসল, তেমনি নির্লোভ আর সদানন্দ। আমি যতদিন তাঁদের আশ্রয়ে ছিলাম, একদিনের জন্যেও বুঝতে পারি নি পরের বাড়ীতে আছি। তিনি কোনদিনও বুঝতে দেন নি।

বাবাই বোধহয় চিঠি লেখালেখি ক'রে সব ঠিকঠাক ক'রে ছিলেন। তিনি হয়ত বুঝতে পারছিলেন বাড়ীতে থাকলে আমার পড়াশোনা

ঠিকমতো হবে না আর এবার ধীরে ধীরে আমাকে জীবনে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া দরকার। তাই কলকাতায় যেতে হবে। কলকাতায় আর তো' কোন নির্ভরযোগ্য ঠিকানা নেই তাঁর। নিজে খরচ ক'রে, আলাদা বাসা রেখে যে আমায় পড়াবেন তেমন সংগতিও ছিল না তখন। সুতরাং সবদিক থেকে রামতনু চক্রবর্তীই ভরসা। তাছাড়া তাঁদের বাড়ীর পরিবেশটিও ছিল ভাল। আর রামতনু সানন্দে রাজীও হয়েছিলেন।

তাই বাবা একদিন আমায় ডেকে বললেন, 'কিরে কলকাতায় যাবি?' আমি তো' আনন্দে, উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলাম, 'খুব ভাল হয় তা হলে।'

'কিন্তু ধর্ আমি যদি না যাই। তোর কাছে না থাকি?' অমনি আমার সব আনন্দ-উত্তেজনা যেন দপ্ ক'রে নিভে গিয়েছিল। আমি যেতে চাই নি। বাবা নেই, অথচ আমি কলকাতায় একলা আছি এমন ভয়ংকর সম্ভাবনাকে আমি আমলই দিতে চাইছিলাম না। কিন্তু বাবা আমার কাছে এসে চুলে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে অনেক বোঝালেন, বললেন, 'কলকাতায় গেলে কি সুন্দর পড়াশোনা হবে, দেখিস্। ওখানে তোমার এক জ্যাঠামশাই আছেন। তিনি তোমাকে কত ভালবাসবেন। তাঁর বাড়ীতেই তুমি থাকবে।'

বাবার কথার আর প্রতিবাদ করতে পারি নি। কিন্তু মনটা আমার খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। দু'দিন বাবার কাছ থেকে অভিমানে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালাম। ইস্কুলে যাই, মাঠের আল ধ'রে বেড়াই, অতসী আর হাস্নুহানা গাছের পাশে যাই—কিন্তু কিছুই যেন আর স্পর্শ করে না। মনের অদ্ভুত একটা অবস্থা হয়েছিল তখন। সব সময়েই মনে হচ্ছিল যেন চারপাশের এত আয়োজনে হঠাৎ আমার কোন অধিকার থাকছে না। খুবই সাময়িক এদের সংগে আমার সম্পর্ক। অথচ নতুন যেটা আসছে তার পরিপূর্ণ চেহারাটাও আমি দেখতে পাচ্ছি না। ফলে মনের কোন একটা অবস্থাতেই আমি নিবিষ্ট হতে পারছিলাম না অস্বস্তি এবং অস্থিরতা ছোট্ট এক ব্যথার মতো আমার বুকের ভেতর সব সময় তীক্ষ্ণ হ'য়ে থাকছিল।

গ্রীষ্মের এক রাত্তিরে বাবার সংগে ট্রেনে চাপলাম আমি। সেই আমার প্রথম ট্রেনে চড়া। শুধু ট্রেনে চড়া নয়, আমার চারপাশের পরিচিত পৃথিবীকে ত্যাগ ক'রে সেই প্রথম একটা নতুন বিস্ময়ের দিকে ধাবিত হওয়া। সেদিন ট্রেনে চড়বার আগে মনে যে উদ্‌বেগ আর উত্তেজনা অনুভব করেছিলাম, বুকের মাঝে যে ভয় আর বিস্ময় থম্‌কে ছিল ; অনেকদিন পর্যন্ত সরে নি—আমার মনে হয় সেই অনুভূতিটুকু আজও আমার জীবনে বারংবার হানা দিয়ে যায়। আমার দৈনন্দিন জীবনের বহুতর ব্যবস্থার মধ্যে আমি যেন আজও সেই অনিশ্চিত বিস্ময় ও সংশয়ের কঠিন উপস্থিতিকে চেষ্টা ক'রেও এড়াতে পারি না। মনে হয়, তারা কোথাও না কোথাও নিজেদের আড়াল ক'রে রেখেছে অত্যন্ত কৌশলে, মানুষের নিশ্চিন্ততার অসতর্কে তারা হঠাৎ এসে পড়বে মানুষকে একটা ভয়ংকর অভিজ্ঞতায় উদ্রিক্ত করতে। হয়ত এধরণের অনুভূতি আমার একার নয় ; অনেকের। হয়ত যে-যুগে আমরা বাস করছি তাতে 'স্বস্তি' এবং 'শান্তি' কথা দু'টো ঘন ঘনই ব্যবহার করা চলে কিন্তু যত ব্যবহার হয় ততই যেন তার কাছ থেকে দূরে সরে আসি আমরা, কিছুতেই আর নিবিড় ক'রে পাওয়া হয় না। কিন্তু যেকথা বলছিলাম।

ইঞ্জিনের ধস্‌-ধস্‌ শব্দ, কুলিদের ব্যস্ততা, ষ্টেশনের মিট্‌মিটে আলো আর টং টং ঘণ্টা আমার মনে সেদিন এক বিস্মিত সুরের সৃষ্টি করেছিল। যেন পৃথিবীর বিরাট সংগীতশালায় অদৃশ্য কোন শিল্পীর উদ্যোগে ছোট বড় এইসব বিচিত্র সুরের উদ্ভব হয়ে চলেছে, যার মিলিত রেশটি একটি কোমল আত্মনিবেদনের মতো গিয়ে মিলছে অসীমে। এমন ক'রে আমি কোনদিন দেখি নি, ভাবি নি। এতদিন ছাতনা গ্রামের সরু সরু আল, নদীর ধারের বিস্তীর্ণ বালির রেখা, পাহাড়ে পাথরের আশপাশে কেয়ার জঙ্গল আর বড় বড় ইঁটের পাঁজায় আমার তেরো বছরের ছোট্ট জীবনের সব বিস্ময় লুকনো ছিল।

বাবা আমাকে নিয়ে প্রথমে এসে উঠেছিলেন চুঁচুড়ায়, আমার এক পিসীর বাড়ী। সেখানে দিনকয়েক ছিলাম আমি। এই পিসীমাকে

আমি এর আগে কখনো দেখি নি। মা'র কাজের সময়ও তিনি যেতে পারেন নি। এসে দেখলাম তাঁদের সংসারের কি হতচ্ছাড়া অবস্থা! দিন চলে না বললেই হয়। যে ক'দিন ছিলাম সেখানে তার মধ্যে পিশেমশাইকে বড় জোর দু'বার দেখেছিলাম হয়ত। তিনি কবিরাজ। ছোট্ট একটি আয়ুর্বেদীয় ডাক্তারখানা আছে তাঁর। বেশীরভাগ সময়ই তিনি সেখানে পড়ে থাকেন। পড়ে থাকেন অন্য কোন আকর্ষণে নয়। মৃত সঞ্জীবনী সুরা তৈরী করতে করতে তার অমোঘ প্রভাবের কাছে হার মেনেছেন তিনি। প্রায় সব সময় তার সেবা না করলে চলে না। সংসার তাঁর কাছে এক বিরাট কোলাহলমুখর রণক্ষেত্র ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তিনি তাকে সযত্নে পরিহার ক'রে চলেন এবং গভীর অনুকম্পার সংগে তার সবটুকু দায়িত্ব তিনি পিসীমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে উদাস থাকতে ভোলেন না। চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়ে। সব ক'টিই আশ্চর্যরকমের অমানুষ এবং অশিক্ষিত। ছোট ছেলে-মেয়ে দু'টোর শরীরে এক টুক্‌রো ক'রে কাপড় জোটে কি জোটে না এই অবস্থা। চোখ-মুখে কি দারুণ লোভ আর লালসা। অনেকটা ভিখিরীর মতো প্রবৃত্তি। এসব আমি কোনদিন দেখি নি, দেখে দেখে মনটা আমার কিরকম কুঁকড়ে এসেছিল।

বাবাকে পেয়ে পিসীমা যেন আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। তাঁর রোগা, কালো এবং নিষ্পেষিত শরীরটা হঠাৎ বহুকালের অভ্যস্ত জড়তার বাধা ঠেলে চঞ্চল হয়ে উঠল যেন। চোখের কোণে হয়ত কোন প্রত্যাশা চক্‌চক্ ক'রেও উঠেছিল—সেদিন স্পষ্ট বুঝি নি কিন্তু আজ সন্দেহ হয়। সন্দেহ হয় তিনিও হয়ত দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য ক'রে ক'রে তাঁর প্রবৃত্তিকে দীন ক'রে ফেলেছিলেন—কথাবার্তা, আচার, আচরণে তিনি তা' লুকোতে পারেন নি। আমার খুব বিশ্রী লেগেছিল, এটুকু মনে আছে। আর, মনে আছে বাবা যে ক'দিন ছিলেন সে ক'দিন সংসারের সব খরচ তিনিই চালিয়েছিলেন। পিসীমা তাতে এতটুকুও সংকোচ দেখান নি। আমরা যেদিন চলে আসব পিসীমা সেদিন কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু আশ্চর্য, সে-কান্নায় এ ক'দিনের পিসিমাকে

যেন চেনা যাচ্ছিল না। তাতে এতটুকু কৃত্রিমতা ছিল না, দীনতা ছিলনা। সহজ, স্বাভাবিক কান্না। কতদিন দেখা হয় নি এবং আবার কতকাল দেখা হবে না ভাই-বোনে—এই উদ্‌বেগের কান্না। সেই প্রথম আমি যেন পিসীমার সংগে আমার আত্মীয়তাকে স্বীকার করতে পারলাম।

আমরা রাত্তিরে নৌকো চ'ড়ে এলাম কলকাতায়। বাবা ইচ্ছে ক'রেই নৌকোয় এসেছিলেন; আমার ভাল লাগবে ব'লে।

ছইয়ের বাইরে নৌকোর পাটাতনে চুপ ক'রে শুয়ে ছিলাম আমি। আকাশ জুড়ে তারাদের মেলা। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। শান্ত জলের বুকে দাঁড়ের শব্দ যেন কোন সাবধানী পথিকের ভীরু পায়ের আওয়াজ ব'লে মনে হচ্ছে।

আকাশের দিকে চোখ মেলে শুয়েছিলাম আমি। আকাশটা এখন শান্ত এবং নীরব। আকাশটা যেন মা'র দৃষ্টির মতো স্নেহময়। আমি চোখ দিয়ে সেই অনন্ত স্নেহকে ছুঁতে চাইছিলাম। বহুক্ষণ ধ'রে একইভাবে শু'য়ে থাকতে থাকতে আমার মনে অনেকরকম ভাবনা এল আর গেল কিন্তু সব ভাবনাই যেন বিষণ্ণ এবং শক্তিহীন। তারা কোন জ্বালার সৃষ্টি করতে পারল না বরং স্বপ্নের মতো একটা স্নিগ্ধ প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলল।

আমার মনে হচ্ছিল এই নিস্তব্ধ রাত্তিরটার মধ্যে, এই ফুরফুরে বাতাস, আর শান্ত জলের মধ্যে, ওই তারাভরা নীল আকাশের মধ্যে কোথায় যেন একটা গান লুকিয়ে রয়েছে। যেগান কখনো থামে না, অনন্তকাল ধ'রে, জন্ম-জন্মান্তরের বাধা টুটে যে-গান প্রবাহিত হয়ে চলে। যে-গানের সুর ছেলেবেলায় মা'র কাছে শোনা সেই গানের সংগে যেন আশ্চর্যভাবে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। তবে সেই গানের, সেই সুরের উৎস কোথায়? এই আকাশে, বাতাসে, না মানুষের প্রাণে? তবে কি আমার মা-ই আজ সেই গান হয়ে সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছেন? কোথায় আমার মা? আকাশে ওই লক্ষ লক্ষ তারার একটি হ'য়ে জ্বলছেন কি? আমি মা'র কাছে যাব একদিন। ওই অশেষ গানের অনির্বচনীয় সুরটি সন্ধান ক'রে ফিরব।

পাটাতনে শু'য়ে শু'য়ে হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠলাম আমি। এরকম অনুভূতি আগে কোনদিন হয় নি। আমার মনে হলো, প্রচণ্ড একটা ঝড় যেন আমার বুকের ভেতর মাতাল হয়ে ভীষণ দাপাদাপি করছে। পুরনো সব কিছু ভেঙে, গুঁড়িয়ে তছনছ ক'রে দিচ্ছে। আর কানের কাছে কোথা থেকে যেন গান বাজছে—নানা সুরে, নানা স্বরে। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হ'য়ে। গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর তানে। গান, গান, চারিদিকে শুধু গান!

আমি ছট্‌ফট্ ক'রে উঠে পড়লাম পাটাতন ছেড়ে। তারপর দ্রুত ছইয়ের ভেতরে ঢুকে বাবাকে ডেকে তুললাম, 'বাবা আমি গান শিখব, আমি গান শিখব বাবা।'

আমি উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছিলাম। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম আমার কপালে ঘাম জমেছে। অস্থিরতায় চোখের পাতা পড়ছে ঘন ঘন কিন্তু বাবা যখন আমার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে কি যেন বুঝতে পেরে বললেন, 'নিশ্চয়ই শিখবে বাবা, তোমার ইচ্ছে হলেই শিখবে।' তখন আমি ভীষণ লজ্জা পেয়েছিলাম। বুঝতে পারলাম কি পাগলামীটাই না আমি করেছি! কিন্তু তখন কি আমি জানতাম এক রাত্তিরের সেই পাগলামীটাই জীবনে একদিন মস্ত বড় সত্যি হয়ে উঠবে!

২.

রামতনু চক্রবর্তীর বাড়ী ছিল বাগবাজারে, পশুপতি বোস লেনে। প্রকাণ্ড বাড়ীর ভেতরে ভেতরে জীর্ণতা সবে বাসা বাঁধতে আরম্ভ করেছে। রং চটে গেছে, দেওয়ালের গায়ে অল্প অল্প ফাটল, জায়গায় জায়গায় চুণ বালি, পলেস্তারা খসে পড়েছে। বোঝাই যায় অনেকদিন সংস্কার করা হয়নি। সামনে প্রকাণ্ড ফটক। ফটকের রং কবে ঘুচে গিয়ে আসল, লৌহময় চেহারাটা বেরিয়ে পড়েছে। তার চারধারে ঘাসের ছোট ছোট দ্বীপ মাথা তুলেছে বাসিন্দাদের অবহেলায় এবং অমনোযোগে। ফটক পার হয়েই যে ফোয়ারাটা, সেটাও যত্নের অভাবে হতশ্রী হয়েছে।

সুন্দর দেহভংগীর পরীর হাত থেকে আজ আর জল পড়ে না, কবে যেন থেমে গেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, বাড়ীর মানুষগুলোর মনে রিক্ততার ছাপ পড়ে নি এতটুকু। রামতনুর ধনী নামটি আজ লোকের কাছে যাই-যাই ক'রেও টিঁকে রয়েছে। ও-অঞ্চলের লোক তাঁকে মানে, শ্রদ্ধা করে তার কারণ তাঁর স্বভাবগুণ। পৈতৃক ব্যবসা আগের মতো আর জোরকদমে চলে না। কিন্তু রামতনু যে পুরনো ব্যবসা অথবা পুরনো ব্যবস্থা ছেড়ে জীবনধারণের নতুন রীতিকে বেছে নেবেন, তাও পারেন না, কোথায় যেন বাধ-বাধ ঠেকে। তবু মোটামুটি সচ্ছল অবস্থা তাঁর। স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়ে আর জনকয়েক আশ্রিত আত্মীয় নিয়ে তিনি মোটামুটি সুখেই দিনযাপন করেন। অবশ্য সুখের সংজ্ঞা তাঁর কাছে অন্য। 'বলং বলং অর্থবলং' সুখের এ-চেহারায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর কাছে সুখের চরম হচ্ছে মনের প্রশান্তি, অন্তরের স্থৈর্য। শুনেছিলাম স্কুল-কলেজের লেখাপড়া তিনি বেশীদূর করতে পারেন নি কিন্তু তাঁর চিন্তায়, কথাবলায় একটি সুসংস্কৃত মনের অভাব কোনদিন দেখা যায় নি। অন্তত আমি তো' কখনো লক্ষ্য করবার সুযোগ পেলাম না।

রামতনুর বাবা বেশীদিন বাঁচেন নি ব'লে, তাঁকে খুব অল্প বয়স থেকেই পৈতৃক ব্যবসায় লেগে পড়তে হয়েছিল। তাই, স্কুল-কলেজের লেখাপড়ায় বেশীদূর এগনো তাঁর সম্ভব হয়নি। চাকা-ভাঙা গাড়ীর মতো মাঝপথেই তাকে ফেলে আসতে হয়েছিল। কিন্তু পড়াশুনায় তাঁর ছিল সত্যিকার অনুরাগ। তাই প্রথম সময় আর সুযোগ পেতেই তিনি মহাভারত, উপনিষদ্, গীতা, চণ্ডী—এগুলো ভাল ক'রে পড়ে ফেলেছিলেন। তারপর ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত সবরকম পড়াশুনাতেই নিজের মনকে রেখেছিলেন ছড়িয়ে। বয়স বাড়ার সংগে সংগে মনটা আস্তে আস্তে অন্যদিকে চলে যাচ্ছিল। নানা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংগে নিজেকে তিনি জড়িয়ে ফেলেছিলেন। কোন ভাল জায়গায় নাম-সংকীর্তন কিংবা হরিসভা হ'লে চুপ ক'রে গিয়ে বসে থাকতেন সেখানে। নিজে বাংলাতে ঠাকুর-দেবতার নামে অনেকরকম স্তব-স্তোত্র লিখতে পারতেন। পোশাক-আশাকে তাঁর

এতটুকু আড়ম্বর ছিল না। বড় ক'রে তিলক কাটতেন। রোজ রাত থাকতেই উঠে পড়তেন বিছানা ছেড়ে। কি শীত, কি গ্রীষ্ম নিয়ম ক'রে গঙ্গায় গিয়ে স্নান ক'রে আসতেন। একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করতেন।

রামতনুর স্ত্রী মোটা-সোটা গোলগাল চেহারার বেঁটে মানুষ। এক গা গয়না, মুখে সব সময় একটা মিষ্টি হাসি যেন লেগে আছে। গায়ের রংটি তাঁর ময়লা হলেও মুখে বেশ একটা শান্ত শ্রী আছে। স্বামীর মতো তাঁরও ঠাকুর-দেবতায় অচলা ভক্তি। কিন্তু 'পোড়া সংসারের জ্বালায়' তিনি যে কিছু করতে পারেন না,—এটাই একমাত্র অভিযোগ।

দু'টি ছেলের মধ্যে একটি আমারই সমবয়সী। আমি যখন প্রথম গেলাম ওঁদের বাড়ীতে বড়টি তখন কলেজে পড়ে। মেয়ে সরস্বতী সবার ছোট। বয়স বছর আষ্টেক।

আমি প্রথম যখন গিয়ে পৌঁছলাম বাবার সংগে রামতনু আমাকে এমনভাবে অভ্যর্থনা করলেন যেন আমার সংগে তাঁর কতকালের চেনা, কত নিবিড় আত্মীয়তা আমাদের।

বাবা আমাকে রেখে ফিরে গেলেন। যাবার দিন কত ক'রে ভাবলাম স্থির থাকব, কোন রকম দুর্বলতা দেখাব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর কিছুতেই ঠিক থাকতে পারলাম না। অতবড় ছেলে তবু সে কি কান্না! এই প্রথম বাবাকে ছেড়ে থাকছি—মনে হলো পৃথিবীটা যেন অন্ধকার হ'য়ে গেল হঠাৎ। বাবা অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে, শীগ্গিরই আবার আসবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে রেখে গেলেন আমাকে।

এসব কথা আজ ভাবলে লজ্জা পাই। আবার মনে হয়, তবু যেন শৈশব এবং কৈশোরটুকুই ভাল। তখন আবেগ বলুন, প্রক্ষোভ বলুন, প্রবৃত্তি বলুন সবই খাঁটি থাকে—হাসি পেলে হাসতেই হয়, কান্না পেলে তাকে রোধ করার প্রয়োজন্ হয় না কোন ছুতোয়। জীবনের অনেক অভিব্যক্তিকেই বাইরের প্রয়োজনে ছেঁটে-কেটে ফেলে তাকে নানা পোশাকে চক্চকে ক'রে সাজাতে হয়না।

ইস্কুলে ভর্তি হলাম। আমি আর গৌর (রামতনুবাবুর ছোট ছেলে)

আমরা দু'জনে একসংগে ইস্কুলে যেতাম। একসংগেই ঘুরে বেড়াতাম। আস্তে আস্তে নতুন পরিবেশের সংকোচটা যেন অনেক কেটে এল। জ্যাঠামশাই নিজে আমার তত্ত্বাবধান করতেন, খেয়াল রাখতেন। কখনো এতটুকু অসুবিধে বোধ করতে দিতেন না।

বাবা প্রথম প্রথম প্রায় রোজই লম্বা লম্বা চিঠি লিখতেন। যাতে আমার উৎসাহটি ঠিকমতো বজায় থাকে। আমি যেন মুষড়ে না পড়ি। ছাতনার খুঁটিনাটি কত খবর লেখা থাকত সেসব চিঠিতে। পেঁপে গাছগুলো বড় বড় হয়েছে, নতুন যে কপির ক্ষেত করা হয়েছিল বাড়ীর পেছন দিকটায় তাতে আজকাল কপি হচ্ছে। গয়লা বৌ ভীষণ বুড়ী হয়ে গেছে। তার ছেলে মেথ্‌রীটা এত পাজী যে, মা-কে বুড়ো বয়সে ফেলে রেখে বম্বে গিয়ে এক জাহাজে চাকরী নিয়েছে। এমনি সব কত খবর।

কিন্তু গানের ইচ্ছাটা গেলনা আমার মন থেকে। সুবিধে মতো প্রায়ই হানা দিয়ে যেতে লাগল। অথচ তাকে পুরোপুরি প্রশ্রয় দেবার সাহসও নেই, সংগতিও নেই। লুকিয়ে চুরিয়ে গুনগুন ক'রে গান গাইতাম একটু আধটু। কোথাও ভাল গান শুনলেই থমকে দাঁড়াতাম। কাছে-পিঠে গানের আসর হবে খবর পেলে চুপিচুপি চলে যেতাম। কেউ জানত না। যদিও গৌরের কাছে শেষ অবধি আমার অনেক রহস্যই ফাঁক হয়ে যেত।

পশুপতি বোস লেনে আমি যেখানে থাকতাম তার কয়েকটা বাড়ী পরেই একটা বাড়ীতে এক ভদ্রলোক রোজ গান গাইতেন। আমি ওই পথ দিয়ে যাওয়া-আসার সময় অনেকবারই তাঁর গলার আওয়াজ পেয়ে দাঁড়িয়েছি। মোটামুটি মিষ্টি গলা ছিল ভদ্রলোকের। আমার অনেক সময় ইচ্ছে হতো ভদ্রলোকের সংগে গিয়ে আলাপ করি, তাঁকে বলি, 'দেখুন আমার গান শেখবার ভারী ইচ্ছে, আপনি আমার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন?'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলোয় নি। জানি না তো তিনি কিরকম মেজাজের মানুষ! যদি তিরস্কার ক'রে তাড়িয়ে দেন! যদি জ্যাঠাবাবুদের সম্মানে লাগে! তাঁদের বাড়ীতে আমি আশ্রিত। আমার এমন কোন

কাজ করা উচিত নয় যাতে তাঁদের এতটুকু অসম্মান হয়। এক সময় মনে হতো জ্যাঠামশাইকেই বলে ফেলি যে, আমার গান শেখবার ইচ্ছে হচ্ছে। হয়ত তিনি 'না' বলতে পারতেন না, যাহয় একটা ব্যবস্থা করেই দিতেন। কিন্তু সেখানেও বাবার মান-মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত ছিল। তিনি আমাকে বরাবর এই শিক্ষা দিয়ে এসেছেন যে, 'কোন লোকের আন্তরিকতাকে অসম্মান করবে না, কিন্তু সেই আন্তরিকতার ওপর চাপ দিয়ে দিয়ে কখনো তাকে অনুগ্রহ কিংবা কৃপা ক'রে তুলো না। কা'রো শুধুমাত্র অনুগ্রহভাজন হওয়া কিংবা কৃপাপ্রার্থী হওয়া মানেই নিজের আত্মার অবমাননা করা।'

একবার ভাবলাম বাবাকেই বলি। বাবা তো বলেছিলেন যদি, আমি গান শিখতে চাই তাহলে সেরকম ব্যবস্থা হবে। ভাবলাম একটা চিঠি লিখি, লিখি যে, তুমি তো বলেছিলে আমার গান শেখার ব্যবস্থা করবে, তার কি হলো ? কিন্তু বহু ভেবে নিরস্ত হলাম শেষ পর্যন্ত। এখন তাঁকে একথা লেখা মানেই অযথা বিব্রত করা। তাঁর এমন অবস্থা আর নেই যাতে ইচ্ছে করলেই তিনি দু'টো বাজে পয়সা খরচ করতে পারেন। অথচ আমিও এই দুরন্ত বাসনাটিকে যেন কিছুতে এড়াতে পারছিনা। একটা কড়া নেশার মতো থেকে থেকেই আমার সব চিন্তাকে ওলট-পালট ক'রে দিয়ে ওই একটিমাত্র প্রমত্ততার সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, যদি এমন হয়, আমি যদি অনেকদূরে চলে যাই, কোন অজানা জায়গায়, যেখানে কেউ আমাকে চেনে না, আর আমি কাউকে চিনিনা আর সেখানে যদি তেমন কোন লোকের সন্ধান পাই ;তেমন মনোমত তাহলে তার পায়ের তলায় বসে শুধু গান শিখি, শুধু সুর আমাকে প্রতিনিয়ত ঘিরে থাকে।

এসব ভাবতে ভাবতে কিরকম তন্ময় হয়ে যেতাম যেন। মনে হতো সত্যিই আমি যেন চলে গেছি তেমন কোন দূর, অপরিচিত জায়গায়, তেমন এক লোকের পায়ের কাছে ব'সে গান শিখছি। এইসব কল্পনার সংগে সংগে ভবিষ্যতের ছবিগুলোও যেন চলচ্চিত্রের মতো ফুটে উঠত মনের পর্দায়। ছবিগুলো মূক নয়, কথা আছে তাতে। দেখে আমি

বারংবার উত্তেজিত ও রোমাঞ্চিত হতাম। কিন্তু আজ বুঝি কম বয়সের অলস কল্পনায় সাময়িক মাদকতা ছাড়া আর কিছু নেই আর তা ক্ষতি-কারক অত্যন্ত। আমার তাতে বেশ ক্ষতি হতো। আমি পড়তে পারতাম না। বই খুলে বসে আছি অথচ পড়ায় মন নেই। কতরকমের কল্পনা আস্তে আস্তে আমার মনে ফেনিয়ে উঠত। কত লোকের আনাগোনা ঘটতো, কত ঘটনার। আমি নিজেকে আল্‌গা ক'রে দিতাম সেই সব কল্পনায়। তার টানে ভেসে যেতে বেশ লাগত। সামনে পরীক্ষা। পড়াশুনা তৈরী হয়নি। তবু নিজেকে সামলাতে পারতামনা। ওই এক নেশায় নেশায় সময় কেটে যেত। তাই লেখাপড়ায় কোনদিনই তেমন সুবিধে করতে পারলাম না আমি।

পশুপতি বোস লেনে যে-ভদ্রলোক সকাল-সন্ধ্যা গানের রেওয়াজ করতেন তাঁর নাম ছিল নিখিলেশ চক্রবর্তী। খুব সাদাসিধে ভদ্রলোক। জি. পি. ও-তে চাকরী করতেন। গান শেখাটা তাঁর দারুণ নেশা ছিল। বাইরের ঘরে বসে হারমোনিয়ম বাজিয়ে কতরকমের গান গাইতেন তিনি—কোনদিন রবীন্দ্র-সংগীত, কোনদিন আধুনিক, কোনদিন বা আবার গীত-ভজন।

একদিন আমি এক কাণ্ড ক'রে বসলাম। সন্ধ্যাবেলা আমরা বেড়িয়ে ফিরছিলাম—আমি আর গৌর। দেখি ভদ্রলোক রোজকার মতো গান গাইছেন। আমি গৌরকে বললাম, 'দেখবি একটা মজা করব?'

গৌর বলল, 'কী?'

'ওই ভদ্রলোকের মতো ক'রে গাইব চেঁচিয়ে?'

'যাঃ! তুই কি গান গাইতে পারিস নাকি?'

আমার মাথায় যেন ভূত চেপে গেল। ভদ্রলোকের নকল ক'রে ক'রে কয়েকটা লাইন গেয়ে ফেললাম আমি, বেশ জোরে জোরে। গৌর ভয় পেয়ে আমার হাত ধরে টানে, 'বলে, চলে আয়, শেষকালে ভদ্রলোক চটে যাবেন।'

নিখিলেশ হয়ত ভেবেছিলেন, এ নির্ঘাৎ পাড়ার কোন দুষ্টু ছেলের কাজ। তিনি প্রথমটা একটু অস্বস্তিবোধ ক'রে গান

থামিয়ে ছিলেন, কিন্তু শেষ অবধি নির্বিবাদে তাঁর সাধনা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

এইরকম একদিন নয়, আরো কয়েকদিন করেছিলাম। গৌর বলেছিল, 'বাঃ-রে, তোর তো ভারি সুন্দর গানের গলা। তুই গান শিখিস না কেন?'

আমি কোন উত্তর দিলাম না। মুখের কাছে একটা জবাব এসে গিয়েছিল, তবুও চুপ ক'রে রইলাম।

গৌর একটু ভেবে বলল, 'এক কাজ কর! সরস্বতীর গানের মাষ্টারমশাইয়ের কাছে গান শেখ্ তুই।'

আমি এ-কথারও কোন জবাব দিলাম না।

একদিন ভদ্রলোক গান থামিয়ে বাইরে এলেন। আমি তো' ভয়ে সারা। গৌরেরও মুখ চুণ হয়ে গেছে। নিখিলেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কে রোজ আমার গান নকল করে? কে?'

আমি শেষ পর্যন্ত সাহস ক'রে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'আমি। আমি করি।'

আমার আপাদমস্তক ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে নিখিলেশবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন অমন কর, কেন?'

'আমার গান গাইবার ভারী শখ কিন্তু শেখার সুযোগ পাচ্ছি না।'

'তোমার তো' এখন লেখাপড়া করবার বয়স, তুমি গান শিখতে চাইছ কি বলে?'

'দেখুন, সেকথা যদি বলেন তাহলে তো আপনার এখন সংসারধর্ম করবার বয়স। আপনি এখন গান নিয়ে মাতেন কেন?'

নিখিলেশ চক্রবর্তী ভুরু কুঁচকে আরেকবার ভাল ক'রে দেখে নিলেন আমাকে। তারপর কি যেন একটু চিন্তা ক'রে বললেন, 'হুঁ। তা' আমার কাছে গান শিখবে তুমি?'

আমি স্পষ্ট গলায় বললাম, 'না, এক একজনকে দেখেই মনে হয় এঁর কাছে কিছু শেখা যায়। কিন্তু আপনাকে দেখে তেমন ইচ্ছে করে না। আপনি সেরকম কোন লোকের কাছে নিয়ে যেতে পারেন?'

নিখিলেশ চক্রবর্তী খানিকক্ষণ থ' হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'বেশ, পরশু সন্ধ্যায় এস নিয়ে যাব তোমায় এক জায়গায়।'

আমার সাহস দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বাড়ী আসতে আসতে গৌর বলল, 'কি কাণ্ড তুই করলি বল্ দেখি? বাবা যদি জানতে পারেন তাহলে রাগ করবেন।'

আমি বললাম, 'তুই এখন কাউকে কিছু বলিস না। দেখাই যাক না কি হয় শেষ পর্যন্ত।'

আমি গিয়েছিলাম নিখিলেশবাবুর সংগে। বেলুড়ের কাছে থাকেন ভদ্রলোক। দেখে তাঁকে ভালই লেগেছিল। সমস্ত চেহারায়, আচরণে কেমন একটা অগোছাল ভাব আছে, একটা অতৃপ্তির অস্থিরতা। কিন্তু কথাবার্তা এমন মার্জিত, এমন মনোরম যে প্রথম পরিচয়েই স্বস্তিবোধ না করে পারা যায় না।

কিন্তু তিনি আমাকে নিরাশ করলেন। নিখিলেশবাবুর কাছে সব শুনে বললেন, 'তুমি তো এখন ছেলেমানুষ, আরেকটু বড় হও, তখন এস।'

ফিরে এলাম খুব ক্ষুব্ধ হয়ে। মনে মনে যে আশা জমতে আরম্ভ করেছিল তা' যেন প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে গিয়ে অসংখ্য বাষ্প হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চেতনার কোণায় কোণায়। শরীর ও মনের কোষে কোষে ব্যথা আর বিষণ্ণতা জমে উঠল। দিনকয়েক খুব চুপচাপ নিরুদ্যম রইলাম। তারপর সময়ের সান্ত্বনায় আস্তে আস্তে সেই ভাবটা থিতিয়ে এল।

কয়েকবছর পরে আবার গিয়েছিলাম। তাঁরই কাছে। গিয়ে বললাম, 'আমি এসেছি। এখন কি আমার সময় হয়েছে?'

ভদ্রলোকের নাম ছিল মণিশংকর গোস্বামী। নবদ্বীপের প্রাচীন এক গোঁসাই বাড়ীর ছেলে তিনি। তাঁর ঊর্ধ্বতন পুরুষরা ভক্তিকে জীবনের সংগে পৃথক করতে পারেন নি। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, সংসারের বেনো জলে জীবনের নৌকা ফেঁসে যায়ই একদিন। সেই ফেঁসে যাওয়া, ভেসে যাওয়া নৌকাটাকে পার করতে গেলে ভক্তিই একমাত্র সহায়।

দেব-দ্বিজে ভক্তি। বাড়ীতে তাঁদের রাধা-শ্যামের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। পূজো হতো, রাস হতো। রোজ সকাল-সন্ধ্যা খোল-করতালে মুখর থাকত বাড়ী, পাড়া। ছোট ছেলে-মেয়ে, বউ-ঝি থেকে বাড়ীর প্রবীণরা সবাই নিয়ম ক'রে জীবনের সেই বহুবিধ ত্রাণমার্গের আয়োজনে ব্যাপৃত থাকত। কিন্তু দেবতারা অত সহজে প্রসন্ন হন্ না। মানুষের ভক্তিতে বিশ্বাস তাঁদের কম। তাঁরা কালের হাত-ধরা। তাই গোস্বামী বংশের সব আয়োজন ব্যর্থ ক'রে বাড়ীর মানুষগুলো এক এক ক'রে সবাই প্রায় চট্‌পট্ সরে পড়লেন পৃথিবী ছেড়ে। বংশে বাতি দিতে রইলেন ওই এক মণিশংকর। তিনি তাঁর ওপরওয়ালাদের বিশ্বাসের পদ্ধতিকে সমর্থন করতেন না। তাই নবদ্বীপের বাস উঠিয়ে তিনি কলকাতায় এসে আস্তানা গাড়লেন। রাধা-শ্যামের পূজো বন্ধ হলো। খোল করতালের শব্দ থেমে গেল। কিন্তু বেলুড়ে মণিশংকরের বাড়ীতে হারমোনিয়ম আর তানপুরার শব্দ উঠল। নতুন শব্দ। আরেক নতুন আয়োজন।

গায়ক হিসাবে মণিশংকর আগেকার দিনে নাম পেয়েছিলেন, পেয়েছিলেন শ্রদ্ধা। কিন্তু তথাকথিত জনপ্রিয়তা তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। তবে সংগীতশিক্ষক হিসেবে তিনি অনেকের মনে ভরসা জোগাতে পেরেছিলেন।

আমি আবার গেলাম তাঁর কাছে। তিনি তাঁর তামাটে নিস্পৃহ মুখ আমার দিকে মেলে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর কটা চোখের ওপর লোমশ ভুরু জোড়াকে হঠাৎ কুঁচকে ধরলেন।

আমি বললাম, 'আমি এসেছি। এখন কি আমার সময় হয়েছে?'

তিনি বললেন, 'আচ্ছা কাল এস।'

এই 'কাল এস' ক'রে দিনকয়েক ঘোরালেন তিনি। যত ঘোরাতে লাগলেন তত বিরক্ত হচ্ছিলুম আমি। ধৈর্যকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা শক্ত হচ্ছিল। একবার মনে হলো, আর আসবনা। কাজ নেই এমন লোকের কাছে গান শিখে।

একদিন মরিয়া হ'য়ে গেলাম। সেদিন মনে মনে ঠিকই ক'রে

নিয়েছিলাম যে, আজও যদি তিনি বলেন, 'কাল এস' তাহলে ওঁকে যা-তা বলে আসব নির্ঘাৎ। আর কখনো ও-মুখো হব না।
তখন সন্ধ্যা হয়েছে। সেদিন আবার বৃষ্টি পড়ছিল গুঁড়ি গুঁড়ি। পথে লোকজন কম। আকাশে মেঘ জমেছিল ব'লে অন্ধকারটা একটু বেশী।

আমি ভিজতে ভিজতে গিয়ে বেলুড়ে নামলাম। পায়ে চটি ছিল। পা'জামাটা তাই উঁচু করে তুলে খুব সাবধানে জলকাদা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে মণিশংকর গোস্বামীর বাড়ীর দিকে এগোলাম। কিন্তু সেদিন কপালে কত রকমের দুর্গতি ছিল তা' আমি জানতাম না। বাড়ীর হাত দশেক দূরে একটা লম্বা কাঁচা নর্দমা ছিল। কি দুর্গন্ধ নর্দমাটার! এত লোকের বাস সত্ত্বেও নর্দমাটা যেন সকলের দাবীকে অগ্রাহ্য করেই উদ্ধত রয়েছে।

আমি দুর্গন্ধ এড়াবার জন্যে যেই পকেট থেকে রুমাল বার করে নাকে দিয়েছি, অমনি সেই অসতর্ক মুহূর্তে একটা গাড়ী আমার পাশ দিয়ে হুস্ করে ছুটে চলে গিয়ে হাত থেকে খসে পড়া পা'জামার নিম্নাংশটা কাদায় কাদা ক'রে দিয়ে গেল। আমি বোকার মতো খানিক তাকিয়ে তারপর রুমাল দিয়ে কাদা তোলবার চেষ্টা করতে করতে এগোতে থাকলাম।

কিন্তু আরেকটি দুর্ঘটনা ছিল। মণিশংকরের বাড়ীর একেবারে সামনেটায় ছোট্ট একটু ফাঁকা জমি-মতো পড়ে ছিল। একটুও ঘাস নেই। ছাল-চামড়া উঠে গিয়ে মাটির আসল শরীরটুকু জেগেছিল একটা তীক্ষ্ণ বাস্তবের মতো।

আমার সেখানে পা পিছ্‌লে গেল। বাঁ হাত দিয়ে সম্পূর্ণ পতনটিকে সামলালাম বটে কিন্তু তবু হাতময় কাদা আর জামাকাপড়ে তার কলংককে বাঁচাতে পারলাম না।

বাড়ীর দরজা বন্ধ ছিল। অন্যদিন খোলা থাকে। বাইরে থেকেই বাড়ীর ভেতরটা পর্যন্ত দেখা যায়। আজ বন্ধ। জানালা দিয়ে ঘরের আলো এসে পড়েছে বাইরে।

আমি ভাবছিলাম দরজায় ধাক্কা দেব, না ফিরে যাব! আমার জামা-কাপড়ের যা অবস্থা তাতে কারো বাড়ীতে যাওয়া যায় না। তবু শেষ

পর্যন্ত যাওয়াই সাব্যস্ত করলাম। টোকা দিলাম দরজায়। দরজাটা খুলে গেল। একটি বউ দরজাটা খুলে মাথার কাপড়টা অল্প টেনে দিয়ে সরে দাঁড়াল একপাশে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'উনি আছেন? মণিশংকরবাবু—?' বউটি এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। একটু বিচলিত হলো। হয়ত এক পা পিছিয়ে ভেতর পানে যেতে গিয়েও গেল না। মৃদু অথচ পরিষ্কার গলায় বলল, 'আছেন, যান্।'

আমি বউটিকে পাশ কাটিয়ে অন্দরমহলে গেলাম। বাইরের ঘর পেরিয়েই ডান দিকে একফালি বারান্দা। তার কোলেই একটি মাঝারি ঘর। আলো জ্বলছে। দরজায় ঝুলছে নেটের পর্দা। বাইরে দু'জোড়া জুতো।

বউটি আমার পিছু পিছু আসছিল। বলল, 'এই ঘর, ভেতরে চলে যান্।'

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকালাম। বারান্দায় আলো ছিল না। ঘরের ছিট্‌কে-পড়া উদ্‌বৃত্ত আলোটুকুতে বাইরের অন্ধকার হয়ত একটু তরল হয়েছিল কিন্তু সেই তরলতার সংগে সংগে হাজির হয়েছিল খানিকটা কৌতূহলের রুপোলী ছায়া।

বউটির মুখে সেই ছায়া পড়েছে। তাকিয়ে তাকিয়ে আমার হঠাৎ মনে হলো মুখের কোথায় যেন একটা অদম্য আকর্ষণী শক্তি রয়েছে। দৃষ্টি যাকে সহজে অতিক্রম করতে পারে না। দেখলাম, ওর চোখ জোড়া কি আশ্চর্যরকমের করুণ। এত করুণ যেন ওর চোখের চাহনি সে কারুণ্যের ভারকে আর বহন করতে পারছে না। পাতার বুকে শিশির-বিন্দু যেমন ক'রে ঝ'রে পড়ে তেমনি ক'রেই ওর করুণ দৃষ্টি যেন মাটির 'পরে করুণায় ঝরে পড়তে উন্মুখ। অপেক্ষা একখণ্ড হাওয়ার, একটু আন্দোলনের।

বুঝলাম, ওই চোখ দু'টিই ওর মুখের আবহাওয়াকে কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ করেছে, একটা আর্দ্রতা এনেছে। আর তাই সে মুখের আওতা থেকে চট্ ক'রে নজরকে সরিয়ে আনা যায় না। চেষ্টা করেও

নয়। প্রবল আকর্ষণের শক্তিতে স্থির হয়ে যায়। নইলে ছোট্ট ঢলঢলে, প্রায়-বৈশিষ্ট্যবিহীন মুখখানি অবগুণ্ঠনের আড়ালেই হারিয়ে যাবার কথা।

আমি পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই একটা তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ এসে ঢুকল আমার নাকে। গন্ধটা আমার খুব অপরিচিত ছিল না। ছাতনায় অবনী জ্যাঠার নিঃশ্বাসে এরকম গন্ধ আমি পেয়েছিলাম কয়েকবার।

মণিশংকর দু'টি লোকের সংগে বসে মদ খাচ্ছিলেন। তার মধ্যে একজন একটা সিগারেটের কৌটো থেকে কালো ডেলা ডেলা কি সব বস্তু মদের গেলাসের মধ্যে ফেলছিল। সেদিন বুঝিনি সেটা কি জিনিস! পরে জেনেছিলাম, ওটা বহুদিনের জমানো, হাত দিয়ে ঠেসে ঠেসে শক্ত ক'রে রাখা সিগারেটের ছাই। মদের সংগে মিশিয়ে খেলে নাকি নেশাটা জমে ভাল।

আমি ঘরে ঢুকতেই মণিশংকর গোস্বামী জড়িতকণ্ঠে বললেন, 'এইযে এস, বাবা, এস!'

উৎসাহ অনেকটাই চলে গিয়েছিল, তবু একটু দাঁড়িয়ে থেকে মেঝেয় পাতা সতরঞ্চির এক কোণে বসে পড়লাম। মনটা ভারী অপ্রসন্ন হয়ে রইল।

বেশ কয়েক মিনিট মাথা নিচু ক'রে নিজের কাজে ব্যস্ত রইলেন তাঁরা। কোন সাড়াশব্দ নেই। আমি মশার কামড় খাই আর চুপ ক'রে বসে থাকি। ভীষণ বিরক্ত লাগছিল। হঠাৎ মণিশংকর মাথা তুলে, লালচক্ষু আমার মুখের ওপর সপ্রেমে স্থাপন ক'রে বললেন, 'গাও, একখানা গান গাও তো' বাবা, কেমন গলা তোমার দেখি। যা পার তাই গাও।'

আমার ইচ্ছে করছিল না। ভাবছিলাম এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। এই পরিবেশ যেন আমার অসহ্য ঠেকছিল। তাছাড়া ভাল গানটান আমার তেমন আয়ত্বে নেই। কি গাইব!

আমি বললাম, 'দেখুন শোনাবার মতো গান তো' বিশেষ জানিনা।

তবে আপনি যদি আমাকে পরীক্ষা করতে চান্ তাহলে যাহোক্-তাহোক্ ক'রে একটা কিছু গাইতে পারি।'

'বেশ তাই গাও। যাহোক্-তাহোক্ করেই গাও একটা। আমরা যাহোক্-তাহোক্ করেই শুনি, তারপর তুমি যাহোক্-তাহোক্ ক'রে নিজের বাড়ী চলে যাও, আর তারপর আবার আমরা যাহোক্-তাহোক্ করেই একটু জলকেলি করি—হাঃ হাঃ হাঃ!' উৎকট হাসিতে ফেটে পড়লেন মণিশংকর আর তাঁর দুই ইয়ার। ঘৃণায় গা রী-রী ক'রে উঠল আমার। একি অসভ্যতা! একি হীন আচরণ! মানুষ নিজেকে এমন পশুও ক'রে ফেলে?

একবার ভাবলাম এক্ষুনি উঠে চলে যাই। কাজ নেই নোংরা লোকের সংস্পর্শে থেকে। গান শেখা তো দূরস্থান! যে লোক নিজের জীবনকে অশোভন অসংযমে এমন অসম্মানিত ক'রে তুলেছে তার কাছে কোন কিছু গ্রহণ করা কি সম্ভব? তাকেই বা আমি শ্রদ্ধা দেব কেমন করে! আর যে শিক্ষায় শ্রদ্ধাই রইল না, সে শিক্ষায়, সে জ্ঞানে তো পূর্ণতা আসে না, পরিতৃপ্তি আসে না। 'শ্রদ্ধয়া লভতে জ্ঞানম' বাবা বলেছিলেন একবার।

পরে অনেক পরে আমি বুঝেছিলাম এই-ই পৃথিবীর নিয়ম। বাইরে যাদের খ্যাতি আছে, পরিচয় আছে, বইয়ের পাতায় যারা নমস্য, ঘটা ক'রে ঘরের দেওয়ালে যাদের ছবি টাঙিয়ে রাখা হয়, মালা দেওয়া হয়, সভা ডাকা হয় যাদের নামে—হয়তো তাদের অনেকেরই কর্মমগ্ন, খ্যাতিময় জীবনের আড়ালে এমন সব সাধারণ দুর্বলতার কদর্য উদাহরণ থাকে যা জানলে, ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। সেইসব সাধারণ, ঠিকে দুর্বলতাগুলো নিয়েই তারা সাধারণোত্তর মানুষ।

বেশ কয়েক বছর বাদে এই প্রসংগ নিয়ে একদিন গৌরের সংগে কথা হয়েছিল। গৌরই আমায় বলল, তুমি আজও প্রাচীন ধারণায় কষ্ট পাচ্ছ! তোমার বুক-সেলফ-এর ওই গাদা গাদা বইয়ের ভাঁজে কত অন্ধকার জমে আছে তুমি তার খোঁজ রাখ? ধর্মজ্ঞানে পড় যাঁদের বই, অন্তরের নিভৃততম কক্ষে বাতি জ্বালবার চেষ্টায় যাঁরা তোমার কাণ্ডারী

হন্ – তাঁদের অনেকেরই ব্যক্তিগত জীবন কত অন্ধকার তুমি তা' জান ? কত পতন, পদস্খলন, কত পৈশুন্য, পশ্বাচার তাঁদের চরিত্রের কোষে কোষে একদা প্রচণ্ড হট্টগোল তুলে আজ স্তিমিত হয়ে গেছে রাখ তার খবর ? তুমি বলছ শৃঙ্খলার কথা। শৃঙ্খলা কিসে আছে, কিসে থাকে ? আমার জীবনে আছে ? আজকের গোটা বাংলাদেশটার জীবনে আছে ? সম্ভব নয়, সম্ভব নয়। খবরের কাগজ পড় না ? দেখনি, অ্যাসেম্বলীতে কত সহজে হাতাহাতি হয়, জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি হয়, মূর্খ ক্ষমতালোভীরা সব ভুলে কতখানি স্বার্থান্ধ হতে পারে ? দেখনি পরীক্ষার হল-এ ছাত্রদের কি উচ্ছৃঙ্খল অধোগামিতা ? পাড়ায় পাড়ায়, রকে রকে ভদ্রলোকের ছেলেদের নানাবিধ কর্মতৎপরতা ? কেউ মেয়েদের মুখে অ্যাসিড বাল্‌ব ছুঁড়ে মারছে, কেউ রাত্তিরবেলা পথচারীর পয়সা-বোতাম ছিনিয়ে নিচ্ছে, আবার কেউ বা প্রতিদিন বোতলের পর বোতল বাংলা মদ খেয়ে মুখখিস্তি ক'রে রাস্তা-ঘাটে চূড়ান্ত অসভ্যতা করছে। আর, এদেরই আবার প্রশ্রয় দেন আমাদের কর্তাব্যক্তিরা, পুষে রাখেন নির্বাচন-সাগর পার হবেন বলে। শৃঙ্খলাটা আসবে কোথা দিয়ে বল ?

আমি বললাম, 'তবু মানুষের জীবনে চরিত্র না থাকলে, শৃঙ্খলা না থাকলে সংকট উপস্থিত হয় একদিন।'

গৌর হাসল, বলল, 'তুমি বলছ ঔচিত্যের কথা। হলে ভাল হয়। কিন্তু 'ভাল' বা 'মন্দ' কথা দুটো স্থিতিস্থাপক। যুগে যুগে মানুষে মানুষে তার প্রকৃতি ভেদ হয়, প্রকার ভেদ হয়। আমরা আমাদের সুবিধেমত তার ব্যাখ্যা করি। তাই মানুষের পতনে, পদস্খলনে, অশোভন আচরণে দুঃখ পাওয়ার জীর্ণ অভ্যাস ত্যাগ কর। তাতে নিজেই কষ্ট পাবে, পৃথিবীর কিছুই যাবে আসবে না। তবে হ্যাঁ শৃঙ্খলা মেনে চলা উচিত, নীতি চরিত্র এগুলো যথাসম্ভব বজায় রাখা উচিত—তাতে জীবনটা মোটামুটি এক সরল রেখায় চলতে পারে, বেহিসেবী খরচের শূন্যগর্ভ পাত্র, একদিন ঠকঠকিয়ে তোমাকেই ভয় দেখায় না—এই আর কি !'

মণিশংকর গোস্বামীর ওই আচরণ দেখে ভেবেছিলাম, গান গাইব

না। উঠে চলে যাব। কিন্তু খানিকটা চক্ষুলজ্জায়, খানিকট। আশা এবং অস্বস্তির মিলিত অনুভূতিতে গাইতে বসলাম। যা দুটো-একটা জানা ছিল তার থেকেই। ছাতনায় থাকতে প্রায় কোন গানই পুরো জানতাম না, তাও রবীন্দ্রসংগীত আর মৃণালকান্তি ঘোষ কিংবা অন্য কারুর পুরনো ধরণের কিছু গান। কলকাতায় এসে কয়েকটা ছবির গান শিখেছিলাম; রেকর্ডে রেডিওতে শুনে। সরস্বতী খুব উৎসাহের সংগে আমাকে আধুনিক গান শোনাতে চাইত কিন্তু আমার সেসব মোটেই ভাল লাগত না। যেমন কথার ছিরি, তেমনি সুরের ছিরি। শুনলে হাড়পিত্তি জ্বলে যায়!

গান শুনছিলেন, শুনতে শুনতে হঠাৎ উঠে পড়লেন মণিশংকর। উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর উপগ্রহ দু'টিও পিছু পিছু টল্‌তে টল্‌তে চলে গেল।

আমি মাঝপথে গান থামিয়ে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলাম তাঁদের প্রস্থানোদ্যত মূর্তিগুলির দিকে। বুঝতে পারছিলাম না, ওঁদের এই হঠাৎ রণে ভংগ দেওয়ার কারণটা কি! একবার ভাবলাম হয়ত পেচ্ছাব করতে গেছেন, তারপর মনে হলো মাতাল হলেও সদলবলে পেচ্ছাবে যাওয়ার কথাটা ভাবা খুবই বাড়াবাড়ি হবে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চুপচাপ বসে রইলাম দরজার দিকে চেয়ে। কয়েকটা ভীষণ অস্বস্তিকর মুহূর্ত্ত কাটল। কিন্তু মণিশংকর আর ফিরে এলেন না। লজ্জায়, অপমানে, দুঃখে আমার তখন কান্না পাচ্ছিল। এ কোন্ নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, অভদ্র লোকের শরণাপন্ন হয়েছি আমি? মুখের একটা কথা পর্যন্ত বলে গেলেন না?

সেদিন আমি মনে মনে ভগবানকে ডেকেছিলাম। বলেছিলাম, যদি তুমি থাক তাহলে আমার এই কষ্ট, এই অপমানের যোগ্য প্রত্যুত্তর তুমি দিতে দিও।

পরে বুঝেছিলাম লোকটার এইসব আচরণে রাগ করবার কোন অর্থ হয় না। ওঁর স্বভাবটাই এই।

নিজেই একদিন ডেকে আমায় বলেছিলেন। আমি তখন

পুরোদমে ওঁর কাছে গান শিখি। আমাকে হঠাৎ আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, আমার আচরণে কি তোমার ভক্তি আসছে না? ভক্তি কোর না, ভক্তি কোর না। আমার জ্ঞানের বিচার কর। রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন না, জ্ঞান-বিচার হচ্ছে পুরুষমানুষ—বারবাড়ী পর্যন্ত যায়। আর, ভক্তি মেয়ে মানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারে। তা' আমাদের যখন ওই পুরুষমানুষ হ'লেই প্রয়োজন মেটে, তখন কাজ কি অন্দরে গিয়ে মেয়েমানুষ খোঁজার? আধ বোতল মদ খেয়েই তুমি যখন মাতাল হয়ে পড়ছ তখন শুঁড়ির দোকানের সব মদের খবরে তোমার দরকার কী? তোমার কথা গান শেখা নিয়ে, সেটাতে আমি কিরকম দড় তা' জানলেই তোমার কাজ চলে যাবে। শুধু সেটুকুতে বিশ্বাস থাকলেই হলো! কি বল!

একথার উত্তরে আমি হয়ত অনেক কিছুই বলতে পারতাম। কিন্তু বলিনি। চুপ ক'রে সরে এসেছিলাম। কেননা তাঁকে কিছু বলা বৃথা। তাঁর চরিত্রটি তখন আমার খুব ভাল করেই চেনা হ'য়ে গেছে।

মণিশংকর যখন ফিরে এলেন না আর আমি যখন উঠব-উঠব ভাবছি তখন ঘরের পর্দাটা অল্প অল্প দুলে উঠল। ঝনাৎ ক'রে একগোছা চাবির শব্দ শোনা গেল দরজার ঠিক ওপাশটায়।

ঘরে ঢুকল সেই বউটি। মুখ থেকে ঘোমটা সরে গেছে। ফর্সা, সরু গলার কাছটায় একগাছা পাতলা সোণার হার চিকচিক্ করছে।

ঘরের আলোতে এই তাকে প্রথম পরিষ্কার দেখতে পেলাম। মুখটা ঈষৎ পাণ্ডুর। মুখের রেখায়, বাঁকে এমন একটি অসহায় কোমলতা আছে যা তা'র বয়সকে ধরতে দেয় না। আর সেই কারণেই তা'কে সুশ্রী মনে হয়। নাকের ডগাটা লাল আর একটু বেশী ফোলা ফোলা, তাও সমান্তরাল রেখায় আসেনি—একটু বেশী বাঁদিক চেপে নেমেছে। কমলালেবুর কোয়ার মতো ছোট্ট ছোট্ট পাতলা দু'টি ঠোঁট। চিবুকটা তীক্ষ্ণ হতে গিয়েও যেন বিষম এক দুর্ঘটনায় ছিটকে সরে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য ওর চোখ দু'টি,—কি করুণ এবং কোমল সে-চোখের দৃষ্টি। যেন শান্ত দু'টি বাতি।

আমাকে কি যেন বলতে গিয়ে বউটির ঠোট দু'টি কেঁপে উঠল। সেই শান্ত চোখের বাতি দু'টি একবার আমার মুখে আলো ফেলে আস্তে আস্তে মাটিতে গিয়ে নামল। তারপর কাঁপা-কাঁপা, থামা-থামা স্বর উঠল তা'র গলা থেকে, 'উনি তো' আর আসবেন না। আপনি কেন মিছিমিছি অপেক্ষা করবেন বরং বাড়ী চলে যান্।'

আমি নিজে সেদিন শৃঙ্খলা রাখতে পারি নি। মাথায় দপ্ ক'রে যেন আগুন জ্বলে উঠেছিল, জ্বালা ক'রে উঠেছিল গলার কাছটা। আমি জানতাম আমি যা' করছি তা' অত্যন্ত অর্থহীন, অসংলগ্ন। আমার ক্ষুব্ধ, মনের খানিকটা জ্বালা মিটছে তাতে, আর কিছু নয়।

আমি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললাম, 'বাঃ বেশ মানুষ-ঠকানো ফাঁদ করেছেন তো আপনারা স্বামী-স্ত্রী মিলে! ভদ্রতার লেশ মাত্র নেই! এমনি বুঝি উনি প্রায়ই ক'রে থাকেন আর আপনি তারপরে এসে মিন্‌মিনে গলায়, ন্যাকা-ন্যাকা কথা ব'লে লোক ভুলোন?'

আরো কি কি বলেছিলাম আজ আর মনে নেই। তবে ভেতরে ভেতরে কে যেন সেদিন কথাগুলো ঠেলে গলাধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দিয়েছিল। আমি নিজেই জানতাম না আমার মধ্যে এত ক্রোধ আছে আর সেই ক্রোধ প্রয়োজন হ'লে মূর্তিমান শয়তানের মতো আমার জিবে ভর করতে পারে, আমার হিতাহিত-জ্ঞানের উপলব্ধিকে এমন অন্ধ ক'রে দেয়!

আমার এই অভাবিত ক্রুর আচরণে বউটি প্রথমে থতমত খেয়ে গেল। হয়ত এতটা নির্মমতা সে আমার কাছে আশা করে নি। তা'র ত্রস্ত, হতাশ চোখ দু'টি মেলে তাকাল আমার দিকে। তাতে বেদনার ছায়া প্রগাঢ় হয়েছে।

আমার সব কথা বলা শেষ হ'য়ে গেলে একটিও জবাব না-দিয়ে সে শুধু অত্যন্ত মৃদু গলায় বলল, 'আর বেশী রাত করলে আপনি কিন্তু ফেরার গাড়ী পাবেন না।'

আমি রাস্তায় পা দিলাম। তখন যেন সংবিৎ এল। কমলো জ্বালাটা। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথার ভেতর থেকে কি যেন এক

গুরুভার ধীরে ধীরে নেমে গেল। তখন বুঝলাম, কাজটা অন্যায় হয়েছে, খুবই অন্যায় হয়েছে। এমন রূঢ় ভাষায় বলা উচিত হয়নি মহিলাকে। শৃঙ্খলারক্ষা করা আমার উচিত ছিল। জানিনা কি ভাবল বউটি!

তাছাড়া ওরই বা দোষ কি? হয়ত এই ওর নিয়তি। মণিশংকরকে বিয়ে ক'রে ও নিজেই হয়ত এই অভিশাপ কুড়িয়েছে। মণিশংকরের স্খলিত, ব্যাভিচারিত জীবনে ওকে হয়ত বারংবার ব্যবহারই করা হচ্ছে স্ত্রী নামক একটি সামাজিক যন্ত্রের সুযোগ ও সুবিধায়। হয়ত ক্ষোভ ও যন্ত্রণা একটি দুরারোগ্য ব্যাধির মতো ওর বুকের গোপনে অনবরতই রক্তপাত ঘটাচ্ছে, অথচ আমি তা' জানি না। হয়ত ওই করুণ চোখের আড়ালে সেই বেদনার ইতিহাসই ঘন হ'য়ে আছে!

ভিজে এবং নিস্তব্ধ রাতে হাঁটতে হাঁটতে, ব্যাসষ্ট্যাণ্ডের দিকে যেতে যেতে আমি যখন গভীর আগ্রহে আকাশের দিকে তাকালাম, তখন একটা ছোট মেঘের শরীরে হঠাৎ প্রবেশ করল চাঁদটা আর তখনই কোথা থেকে যেন পেটানো ঘণ্টা বাজল একটার পর একটা এবং সেই শব্দ মিলোতে না মিলোতেই আমার মনে হলো রাত বাড়ছে আর তখুনি, প্রায় হঠাৎ বউটির জন্যে গভীর মমতাবোধ করলাম আমি। অযাচিত একটা ব্যথা বুকের কাছটায় হাওয়ার মতো দুলে উঠল।

পরের দিন আমি বাড়ী থেকে বেরোইনি। কিসের যেন ছুটি ছিল। স্কুল, কলেজ, অফিস সব বন্ধ। দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর ওপরের ঘরে বসে গ্রামোফোন শুনছিলাম। ঘরে ছিল গৌর আর সরস্বতী। হঠাৎ শুনলাম, বাইরে থেকে আমার নাম ধ'রে কে যেন ডাকল! আমি বারান্দায় এসে দেখলাম নিখিলেশবাবু আর মণিশংকর বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আমি ছুটে নেমে এলাম নিচে। কিন্তু মণিশংকরের সংগে একটাও কথা বললাম না। তাঁকে যেন চিনিই না এমন ভাব করলাম। ওঁকে দেখেই আমার গত রাত্তিরের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। আর সংগে সংগে বিরক্তিতে ভরে উঠেছিল মনটা।

মণিশংকর চুপ ক'রে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন তারপর একটু একটু হেসে বললেন, কি খুব রাগ করেছ বুঝি? আমার ওপর কি রাগ করতে আছে ভাই! আমার জন্যে তোমার তো করুণা হওয়া উচিত। রোগগ্রস্ত লোকের ওপর কেউ কি রাগ করে? আমি হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলাম। ভাবলাম, কি আশ্চর্য, এই লোকটাই কাল রাতে অমন জঘন্য আচরণ করেছিল? আজ যে-মুখে তাঁর নির্লিপ্ত, প্রশান্ত হাসি ছড়িয়ে রয়েছে, কাল রাতে সেই মুখেই একটা উৎকট হাসি বিষাক্ত বাষ্পের মতো ফেটে পড়েছিল? আজ দিনের আলোয়, অত্যন্ত নিকট থেকে যাঁকে প্রায় দেবতার প্রতিনিধি ব'লে মনে হচ্ছে, কাল রাতে চড়া বৈদ্যুতিক আলোয় সেই ঘরটার (কাল তাকে ঘর মনে হয়নি নরকের নিকৃষ্টতম প্রকোষ্ঠ মনে হয়েছিল) পরিবেশে তাঁকেই শয়তানের দোসর ভাবতে কোন অসুবিধে হয় নি?

নিজেকে প্রস্তুত করতে আমার খানিকটা সময় লাগল। আমি মণিশংকরকে আস্তে আস্তে যেন অনুধাবন করতে পারছিলাম। তাঁর চরিত্রটা ক্রমশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠছিল আমার কাছে।

'কি আমার বাড়ীতে যাবে না ভাই?' মণিশংকর এগিয়ে এসে আমার কাধে তাঁর একটা হাত সমর্পণ করলেন। 'দেখ, আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে নিজেই ছুটে এসেছি। এরপরও যদি না-যাও তাহলে বুঝব তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর।'

হঠাৎ আমি যেন কেমন অভিভূত হ'য়ে গেলাম। আমার মন বলল, যাব, যাব, নিশ্চয় যাব। এঁর কাছেই গান শিখতে হবে আমায়। ইনিই আমার উপযুক্ত লোক। বাইরে থেকেই এঁকে প্রত্যাখ্যান ক'রে দিলে চলবে না। বারবাড়ীর বাধা পার হ'য়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে হবে। তবেই এঁর সম্পূর্ণ সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

'যাব, যাব নিশ্চয়ই যাব। কবে থেকে যাব বলুন?' আমি সাগ্রহে বললাম।

'যবে থেকে তোমার ইচ্ছে। আমার যতটুকু ক্ষমতা আছে সব দিয়ে তোমায় শেখাব—কেমন?'

আমার কি হলো, ভাবাবেগে এত অস্থির হয়ে গেলাম যে, হঠাৎ তাঁর পায়ের ধূলোই নিয়ে ফেললাম টুপ্‌ করে। সেদিন বুঝিনি তাঁর সম্বন্ধে এই ভাবপ্রবণতাকে আমি রক্ষা করতে পারব না।

মণিশংকর ফিরে গেলেন। কিন্তু বাড়ীময় রটে গেল এখবর, আমার গান শেখার বৃত্তান্ত। একা সরস্বতীই দশটা হ'য়ে সকলকে ডেকে ডেকে বলল। 'জান তোমরা, আমাদের শোভনদা খুব বড় গায়ক হতে চলেছেন? খুব বড় একজন মিউজিক টীচার-এর কাছে গান শিখতে যাচ্ছেন?'

সরস্বতীর বড়দা শুনে বলল, 'সে কি সরস্বতী, তুমি এরকম উল্টো-পাল্টা কথা বলছ কেন? এই বললে তোমার শোভনদা বড় গায়ক হতে চলেছেন আর এই বলছ গান শিখতে যাচ্ছেন? শেখা আর হওয়ার মধ্যে কি কোনই তফাৎ নেই?'

সরস্বতী বলল, 'আহা ওই হলো আর কি! ভাল লোকের কাছে গান শিখলে তবেই তো' পরে বড় গায়ক হওয়া যায়—নইলে কি আমার মতো পাঁচুবাবুর কাছে শিখলে হয়!'

এই পাঁচুবাবুকে সরস্বতীর বরাবই পছন্দ হয় নি। রোগা, লম্বা মাঝবয়সী ভদ্রলোক মালকোঁচা মেরে কাপড় পরে পাঞ্জাবীর ওপর সিল্কের চাদর জড়িয়ে একটা বাইসাইকেলে চেপে গান শেখাতে আসতেন হপ্তায় তিন দিন। এসেই 'কিড়িং' ক'রে দু'বার সাইকেলের ঘণ্টা বাজাতেন। তারপর একপ্রকার অমসৃণ অথচ ভারী গলায় ডাকতেন, 'সরস্বতী'। সরস্বতী এসে তাঁকে নিয়ে যেত বৈঠকখানার গায়েই লাগানো ছোট্ট ঘরটিতে। মাদুর পাতা থাকত। বসেই ঘণ্টাখানেক ধ'রে গানের শিক্ষা চলত। কিন্তু সরস্বতীর পছন্দ হতো না সেই শিক্ষাপ্রণালী। তাই সুযোগ পেলেই সে পাঁচুবাবুর কথা তুলত। গৌরও এই নিয়ে প্রায়ই ক্ষ্যাপাত তাকে 'এই যে পাঁচুবাবু, কেমন আছ!' ভীষণ রেগে যেত সরস্বতী।

সরস্বতীর চেহারাটা ছিল ভারী মিষ্টি! বড় বড় কালো চোখ সব সময় যেন অবাক হবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। খুব কোঁকড়া কোঁকড়া

চুল ছিল মাথায়। কথা বলার সময় যখন ঘাড় নাড়ত তখন সেই চুল-গুলো বৃষ্টির মতো ছড়িয়ে পড়ত ওর মুখে, কপালে।

আমার প্রতি ওর মনোযোগের অন্ত ছিল না। আমার প্রয়োজনে লাগতে পারার জন্যে নিজেকে সব সময় প্রস্তুত ক'রে রাখত। বেশী কথা বলত না। অনেক কথার উত্তরে একটা জবাব দিত। কিন্তু আমাকে বুঝত খুব। আমার দুঃখ-কষ্ট বুঝত। উৎসাহ দিত সান্ত্বনা দিত।

একটা কথা আমি কোনদিন ভুলব না। মণিশংকরের কাছে গান শিখছি অথচ আমার হার্মোনিয়ম নেই। সরস্বতীরটা সব সময় ব্যবহার করতে ইচ্ছে করত না। অনেকভাবে পয়সা জমাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু দশ-পনের টাকার বেশী কিছুতেই আর হয় না। বাবা একবার এসেছিলেন কিন্তু সাহসই হলো না তাঁকে বলতে। বললে শুধু উৎপীড়নই করা হতো।

কী ক'রে যেন সরস্বতী বুঝল। একদিন নিজের কয়েকটা জামা-কাপড় সাবান দিয়ে কেচে ছাতে মেলতে গেছি হঠাৎ সরস্বতী এসে হাজির। কতকগুলো টাকা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'আমার জমানো টাকা, তোমার কাজে লাগুক। যদি এতে না হয়, বলো, মা'র কাছ থেকে চেয়ে দেব।'

পশুপতি বোস লেনের বাড়ীর নিত্য জীবন-প্রবাহে বেশ মিশে গিয়েছিলাম আমি। কোনদিন অনাত্মীয়ের সংকোচ অনুভব করি নি। ওঁরাও আমাকে এমন আপন ক'রে নিয়েছিলেন যে, পরের বাড়ী থাকার অসুবিধে ভোগ করতে হয়নি। বিশেষ ক'রে সরস্বতী। প্রথম দিন থেকে আমার প্রতি তা'র এত ভরসা, এত পক্ষপাতিত্ব যে, জ্যেঠিমা প্রায় বলতেন, 'শোভন আর জন্মে ওর কেউ ছিল।'

যত বয়স বাড়ছিল বাবা যেন কিরকম হ'য়ে যাচ্ছিলেন। সংসারের সংগে এবং পৃথিবীর নানা কোলাহলময় কর্মকাণ্ডের সংগে তাঁর সম্পর্কটা আস্তে আস্তে ক্ষীণ হ'য়ে আসছিল। শুধু নিজের চারপাশে একটা অখণ্ড স্তব্ধতাকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তারই কেন্দ্রে উপবেশন

ক'রে তিনি যেন ঘন ঘনই সম্মোহিত হয়ে পড়ছিলেন ইদানীং। চুল রেখেছিলেন, দাড়ি রেখেছিলেন। কম কথা বলতেন। চোখ দু'টো সব সময় কিসের এক অন্বেষণে চঞ্চল হয়ে থাকত। কি যেন খুঁজছেন। হাসিটাসিগুলো সেইরকমই ছিল, সেই রকম অবাধ প্রাণখোলা। আমাকে কাছে পেলে অবশ্য আগেকার মতোই অসংকোচ ব্যবহার করতেন কিন্তু তবু কোথায় একটা গাম্ভীর্যের সূক্ষ্ম আবরণ পড়ছিল তাঁর স্বভাবে। সহজে কেউ বুঝতে পারত না। কিন্তু আমি সব টের পেতাম।

আরো কয়েকবছর পরে তাঁকে আর চেনবার উপায় রইল না। প্রচুর স্বাস্থ্য ছিল সেসব কোথায় মিলিয়ে গেল। ক্ষীণ দেহ, শুধু দৃষ্টিতে এক আশ্চর্য দীপ্তি। আমার মনে হতো তিনি যেন বাইরের বহু অপ্রয়োজনকে বিসর্জন দিয়ে ভেতরে ভেতরে এক মূল্যবান প্রয়োজনকে অর্জন করার সাধনা করে চলেছেন নীরবে। আর সেই নিঃসঙ্গ অথচ পরিশ্রমী পথ-চলার ক্ষয়টুকু তাঁর শরীরকে আশ্রয় করলেও মনে মনে তিনি এক জ্যোতির্ময় বিশ্বাসের তৃপ্তিকে আয়ত্ত করতে পারছেন।

আমি একদিন বলেছিলাম, 'কী হয়েছে তোমার আমাকে খুলে বলবে ? তোমার শরীর যে একেবারে ভেঙে পড়েছে!'

হাঃ-হাঃ ক'রে হেসে উঠেছিলেন বাবা। বললেন, 'বুঝেছিস্ খোকা মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। শরীর রেখে লাভ কী যদি সাধনাতেই না সিদ্ধি পেলাম?'

—'কিন্তু তোমার সাধনাটা কি, তিলে তিলে শুকোনো?' বাবা আবার হেসে বলেছিলেন, 'বুঝবি, বুঝবি—যদি বোঝার মন থাকে তাহলে একদিন বুঝবি সাধনায় সফল না হওয়ার জ্বালাটা কোথায়!'

এর কিছুদিন পরেই ছাতনা থেকে একদিন একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম এল। আমি তখন অফিস যাব ব'লে ভাত খেতে বসেছি।

মাঝে কিছুদিন চাকরী করতে ঢুকেছিলাম ; খুব অল্প সময়ের জন্যে। কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত দিনক'টি আমার জীবনে এক তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে

গিয়েছিল। এমনিতে চাকরী আমি করতাম না হয়ত, কিন্তু জ্যাঠামশাই অনেক বলে-কয়ে ব্যবস্থাটা করেছিলেন বলে তাঁকে অমান্য করতে পারি নি শেষ পর্যন্ত। তাছাড়া, বাবার কথা ভেবেছিলাম আর নিজের কর্মহীন পরাশ্রিত অবস্থাটাও খুব সম্মানজনক ঠেকছিল না। যদিও ওঁরা নিজে কখনো কিছু বলেন নি। শুধু জ্যাঠামশাই আমার মঙ্গলের জন্যেই চাকরীটার যোগাড় করেছিলেন। তাঁর নিজের ছেলে গৌর সম্বন্ধে বিশেষ কোন আশা-ভরসা করতেন না তিনি। সে তখন প্রবল উৎসাহে রাজনীতি করে। চাকরীর দিকে তাকাবার তার সময় কোথায়!

আমি ক্লাসে টপ্ টপ্ ক'রে উঠতাম বটে কিন্তু পরীক্ষার ফল কোনদিনই ভাল হতো না। কেন, তা' আগেই বলেছি। আমি সবে বি. এ. পাশ ক'রে বসেছিলাম। তখন কাজের মধ্যে শুধু গান শেখা আর এধার ওধার গান গাইবার সুযোগ খুঁজে বেড়ানো। দু'একটা ছেলে-পড়াবার চেষ্টাও করেছি।

এই সময় জ্যাঠামশাই চাকরীর খোঁজটাও নিয়ে এলেন। বহু তদ্‌বির-তদারক, বহু কলা-কৌশল ক'রে শেষ পর্যন্ত চাকরীতে গিয়ে তো' জুটলাম আমি। সব মিলিয়ে একশ' সাতচল্লিশ টাকা মাইনে। কিন্তু অফিসটার নাম আমি করব না, কেননা, আজও আছে সেই অফিস। শুধু এটুকু বলব চাকরীটা ছিল সরকারী।

সবশুদ্ধ মাস পাঁচেক চাকরী করেছিলাম। তারপর আমাকে বাধ্য করা হলো চাকরী ছাড়তে। কারণ তখন আমার নামে অভিযোগ এসেছে, তছরূপের অভিযোগ। আর তারপর সে কি অপমানজনক পরিস্থিতি! আমাকে সাসপেণ্ড করা হলো। এনকোয়ারি বসল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে কর্তাব্যক্তিটির যথেচ্ছ জেরার জবাব দিতে হলো। তিনি সিগারেট ফুঁকলেন, পান চিবোলেন, অন্যকাজে ব্যস্ত হলেন আমি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর একটি ক'রে প্রশ্ন করেন, আবার পরের দিন আসতে বলেন। এমনি অসহ অবস্থায় একমাস কাটিয়ে তবে রেহাই পেলাম। চাকরীটা গেল। আমাকে ফাঁসাবার জন্যে কর্তা-

ব্যক্তিটির উত্তমের অন্ত ছিল না। কেননা তাতে তাঁর নিজের লাভ ছিল। এরকম একটা 'কেস্' ওপরে দেখাতে পারলে তাঁর উন্নতি অবধারিত, তিনিও তর্ তর্ করে ওপর দিকে উঠতেন।

আমি যে-ডিপার্টমেণ্টে চাকরী করতাম সেখানে ক্যাশ সার্টিফিকেট, নগদ টাকা ইত্যাদির ব্যাপার ছিল। আমি যখন ঢুকলাম তখন কিছুই জানিনা—জীবনে প্রথম চাকরী করতে এসেছি। প্রথম স্কুলে যাবার মতো ভয় আর অস্বস্তি সব সময় বুকের মধ্যে চেপে বসে থাকে। কয়েকদিন পর সেটা আস্তে আস্তে কাটাতে পারলাম বটে, কিন্তু কাজ-কর্মের কিসে কী হয় কিছুই বুঝি না। সব সময় অন্যলোকের ভরসায় আত্মসমর্পণ ক'রে বসে থাকতে হয়।

আমি যখন প্রথম ঢুকলাম তখন থেকেই দু'জন ভদ্রলোক আমার প্রতি খুব যত্ন নিয়েছিলেন। তাঁদের নামও আমি করব না। তাঁরা ডিপার্টমেণ্টের পুরনো লোক। আজও বেঁচে আছেন, চাকরী করছেন। আমাকে কাজকর্ম তাঁরাই সব বুঝিয়ে দিতেন, বলে দিতেন কোথায় সই সাবুদ করতে হবে। আমি নির্বিবাদে তাঁদের অনুসরণ করতাম। নতুন জায়গায় তাঁরা আমাকে প্রায় সব সময় সঙ্গ দিতেন, গল্পগুজব করতেন (যদিও কাজের সময় গল্পগুজব করায় আমার আপত্তি ছিল)। টিফিনের সময় একজন নিজের অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো থেকে লুচি আর তরকারী বার ক'রে বলতেন, 'কি শোভন ভাই একটু সেবা করবে নাকি?'

আমি বিনীত হয়ে বলতাম, 'না-না কি আশ্চর্য, আপনি খান।' আরেকজন দিতেন পান। আমি খেতাম না। এঁকে আমার বিশেষ পছন্দ হতো না। এঁর বয়স বেশী ছিল না। তরুণ বললেও অন্যায় হয় না। কিন্তু ইনি অসম্ভব মুখ খারাপ করতেন। আমার মোটে ভাল লাগত না। পানের ডিবে বাড়িয়ে বলতেন, 'খাও, খাও, মেয়েমানুষ কি জিনিস তাতো' এই বয়স পর্যন্ত বুঝলে না, মেয়েমানুষের হাতের তৈরী পানই খাও।' একটু থেমে আবার বলতেন, তবে পানের সে স্বাদ আর নেইরে ভাই। আগে আগে কি মিঠেই লাগত! এখন মাগীটার কিছু নেই, কিছু রাখি নি। ছেলে বিইয়ে বিইয়ে আর সংসারের ভূতের

খাটুনি খাটতে খাটতে হাতের, শরীরের, মনের সব মিষ্টত্বই গেছে।'

আমি বলতাম, 'নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে আপনি এরকম করে হাটে-বাটে বলেন, আপনার লজ্জা হয় না?'

তিনি হো-হো ক'রে হাসতেন তারপর বলতেন, 'এখন রক্ত গরম তো' সংসার এবং স্ত্রী'র জোয়াল কাঁধে চাপে নি কিনা, তাই অমন মুক্তকচ্ছ হওয়া তোমাদেরই সাজে।'

আমি বললাম, 'এর মধ্যে মুক্তকচ্ছ হওয়ার কি আছে? আমি বলছি সভ্যতা, শালীনতা এবং তাঁর সম্মানের কথা।'

'ছিল, ছিল, এখন সব আল্‌গা হয়ে গেছে। সব ঢিলে ঢালা। অসুখবিসুখের সময় দেখ নি, কোন হুঁশ থাকে না, কাপড়-চোপড়ের ঠিক থাকে না। আল্‌গা হয়ে খসে খসে যায়—ঠিক তেমনি।'

আমি বললাম, 'তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে আপনার অসুখ হয়েছে!'

'হয়েছেই তো।' তিনি হঠাৎ কেমন যেন হ'য়ে গেলেন। চোখ দুটো দপ্ ক'রে জ্বলে উঠল। গলাটায় আর একটুও তরলতা রইল না।

'অসুখ কি আমার একার হয়েছে, সারা দেশটার হয়নি? শিক্ষা, সভ্যতা, ভদ্রতা, শালীনতা এসব ওপর থেকে নিচে ক'টা লোকের মধ্যে তুমি দেখতে পাও হে আজকাল? বাঙালীর চরিত্র আজ আল্‌গা হয়ে যায় নি? ঢলে পড়ে নি তার স্বভাবে?'

আমি চুপ ক'রে গেলাম। একথার কী জবাব দেব!

সেই দু'জন লোকই আমাকে শেষ পর্যন্ত ফাঁসালেন। আমি যে তাঁদের বলির পশু তা' তাঁদের খাতির-যত্ন দেখে বুঝতে পারি নি। তাঁরা টাকা পয়সা, হিসাবের গোলমাল করেছিলেন। আমাকে একটি নির্বোধ অনুসারী পেয়ে 'এখানে সই কর, ওখানে সই কর' বলে যা ইচ্ছে তাই করিয়ে নিতেন। আমিও সরল' বিশ্বাসে তাঁদের হুকুম তামিল করতাম। মাসকয়েক পরে তার মোক্ষম ফল পেলাম। ওপর থেকে

তলব এল। কি ব্যাপার! টাকা পয়সার গোলমাল আর তার জন্যে আমাকে দায়ী করা হয়েছে।

আমি যখন সব শুনে আবার আমার জায়গায় এসে বসলাম তখন আমার মাথা ঘুরছে ভীষণ। কখনো এমন পরিস্থিতিতে পড়ি নি, ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

বেয়ারাকে বললাম এক গ্লাস জল দিতে! খেলাম। কোনদিকে তাকাতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল গোটা অফিসসুদ্ধ লোক আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। কিন্তু না। সবাই যে যা'র কাজে অথবা গল্পে ব্যস্ত। এর মাঝে কতবড় যে একটা ঘটনা ঘটে গেছে তা' কেউ জানে না। পরে সবাই জানবে।

আমি আমার বাঁ দিকে সেই ভদ্রলোক দু'টির দিকে তাকালাম। শুধু তাঁরাই চেয়ে ছিলেন আমার দিকে। আমি তাঁদের দিকে একবার তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারলাম না। তাকাতে তাকাতে কখন দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল আমার চোখ থেকে, খেয়াল নেই। হঠাৎ সেই ভদ্রলোক চাপাগলায় বলে উঠলেন—যিনি আমাকে পান দিতেন আর আমি যাঁকে পছন্দ করতাম না, 'না, না এ অসম্ভব।' একটা নিরীহ লোকের এ দুর্ভোগ চোখে দেখা যায় না' ব'লে তিনি তেড়ে-ফুঁড়ে চেআর ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ভাবখানা যেন তিনি অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে চান তৎক্ষণাৎ। কিন্তু আরেকজন সংগে সংগে তাঁর হাত ধ'রে টেনে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'কি পাগলামীটা হচ্ছে শুনি? এর ফল কি জান?'

তাঁর কথার গূঢ় অর্থ বুঝে সেই পান-বাবু আবার মিইয়ে গেলেন। অন্যায়ের প্রতিবিধান করার সৎসাহস এযাত্রায় তাঁর আর দেখান হলো না। তিনি আমার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাইতে থাকলেন শুধু।

বেশ কয়েকমাস পরে তিনি পশুপতি বোস লেনের ঠিকানায় আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। বিবেকের দংশনে। কিন্তু তার বহু আগেই যা হবার হ'য়ে গেছে। চাকরী আমায় পরিত্যাগ করেছে। তিনি বলেছিলেন, এই চিঠি দেখিয়ে আমি যেন কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যায়বিচার তলব করি।

আমি কিছুই করি নি। তখন আমার জীবনে আরেক দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমি পান-বাবুকে লিখেছিলাম, 'আপনার শুভ বুদ্ধির জন্যে ধন্যবাদ।'

জ্যাঠামশাই সব জেনে ব্যাপারটাকে অত সহজে ছেড়ে দিতে চান নি। তাঁর প্রভাব, প্রতিপত্তি আরোপ ক'রে এর একটা সম্মানজনক সমাধান চেয়েছিলেন আমি বারণ করেছিলাম। বলেছিলাম, 'কি লাভ মিথ্যে কাদা ঘাঁটাঘাঁটি করে, ও-অফিসে আমি যখন আর চাকরী করবই না।' তাছাড়া বাবা এ ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানতেন না। তাঁর শরীর ও মনের যা অবস্থা তাতে এসব খবর কানে গেলে তিনি ভীষণ বিচলিত হতেন। কিন্তু বাবার শরীর যে কত খারাপ হয়েছিল, তা' বুঝতে পারি নি। বুঝলাম যেদিন ছাতনা থেকে আর্জেন্ট টেলিগ্রামটা এল। অফিসে তখন আমার গোলমাল চলছে। তবু অফিসে যাচ্ছিলাম। যেতে হতো নইলে আরো বিপদের সম্ভাবনা ছিল। অফিসে যাবার আগে সেদিন খেতে বসেছিলাম। রান্নাঘরটা ছিল বার বাড়ীতে। রান্নাঘরের লাগোয়া এক প্রশস্ত আঙ্গিনা। সেইখানেই সকলে বসে একসংগে খেতাম আমরা। জ্যেঠিমা অন্নপূর্ণা পিঁড়ি পেতে বসে খাওয়ার তদারক করেন,—ঠাকুর এসে পরিবেশন করে যায়।

আমি তখন সবে ভাতে ডাল মেখেছি। জ্যাঠামশাই খড়মের খট্‌খট্‌ শব্দ করতে করতে আঙ্গিনায় উঠে এলেন। মুখটা তাঁর অস্বাভাবিক গম্ভীর, চিন্তাগ্রস্ত। আমার দিকে ভাল করে চাইতে পারলেন না, স্ত্রীকে বললেন, 'শোভনকে তো আজকেই একবার ছাতনায় যেতে হচ্ছে—অবশ্য আমিও ওর সংগে যাব।' আমি খাওয়া ফেলে জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে তাকালাম। তিনি ফতুয়ার পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাম বার ক'রে বললেন, 'এইমাত্র এল এটা, মুরারী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে সেখানে। অবিলম্বে আমাদের যাওয়া দরকার।'

জ্যাঠামশাই সংগে একজন ডাক্তার নিয়েছিলেন। সেইরাত্রেই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম। ট্রেনে যেতে যেতে আমি ভাবছিলাম জ্যাঠামশাইয়ের কথা। ভাবছিলাম, মানুষ মানুষের জন্যে এতও করে? আত্মীয় হওয়াটাই তো সব নয় পৃথিবীতে। কি আত্মীয়তা আছে

জ্যাঠামশাইয়ের সংগে ? তবু তিনি যেমন ক'রে ভাবেন আমাদের জন্যে আর কে ভাবে ? ক'টা রক্তের সম্পর্কের লোক আমাদের জন্যে এগিয়ে আসে ? বিপদে সাহায্য করে ?

আসল কথা মনের বন্ধন। বাবার সংগে জ্যাঠামশাইয়ের বন্ধনটাও মনের, হৃদয়ের। সব অসমতা সত্বেও কোথায় গিয়ে সেটা অবিচ্ছেদ্যভাবে এক হয়ে গিয়েছিল। সেখানেই তাঁরা একজন আরেকজনের পরম আত্মীয়।

আমরা যখন ছাতনায় গিয়ে পৌঁছলাম তখন রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। একটা অস্পষ্ট আলোর রেখ ফুটে উঠেছে আকাশের গায়ে।

সারা রাত্তির জাগার পর ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল আমার মুখে-চোখে। অদ্ভুত একটা অনুভূতির তরঙ্গ যেন শরীরের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ল। বাড়ীর যত কাছে আসতে লাগলাম আমি, একটা অজানা আশংকা তত যেন তার বুকের ভেতরটায় ছুটোছুটি করতে লাগল। আশংকার চেতনাটা খুবই অস্পষ্ট, খুবই ধোঁয়া-ধোঁয়া তবু তার ভারটা কম নয়—সরাতে গেলে সরে না, একজায়গায় আঁট হয়ে বসে থাকে।

বাড়ীতে ঢুকেই আমার কি রকম পা পিছলে গেল। বাড়ীটা পাকা নয়। একটু জল পড়লেই মাটিতে ভীষণ পিছল হয়। আমার মনে আছে, একবার বর্ষাকালে কি ভীষণ আছাড় খেয়েছিলাম আমি—পায়ের ব্যথায় তিনদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারি নি।

বাবার ঘরটা দোতলায়। আমি নীচে থেকে দেখলাম ঘরে তখনও লণ্ঠন জ্বলছে। কেউ কোথাও নেই। সমস্ত বাড়ীটা নিঝুম হয়ে রয়েছে।

ওপরে উঠে দেখলাম ঘরের দরজার একটা পাল্লা ভেজান। তার পাশে চুপ্ করে বসে রয়েছে গয়লা বৌ। আর, একপাশে একটা চেয়ারে মাথায় হাত গুঁজে বোধহয় তিনুর বাবা। পাঠক-কাকাকে দেখতে পেলাম না। আমাকে দেখে গয়লা বৌ হাউ-মাউ করে উঠেছিল কিন্তু আঙ্গুলের ইসারায় তাকে আমি থামিয়ে দিলাম।

বাবা তখন ঘুমোচ্ছিলেন। দেহটা প্রায় বিছানার সংগে মিশে গেছে। হাত দুটো বুকের ওপর জড়ো করা। নির্লিপ্ত মুখে অসুস্থতার গ্লানি কেমন যেন বিষণ্ণ ক'রে তুলেছে তাঁকে।

তিনুর বাবা বাইরে এসে ফিসফিস ক'রে বললেন, 'এখন একটু ভাল, সারাদিন খুব টালমাটাল গেছে। এই মাঝ রাত্তির থেকে ঘুমোচ্ছেন।'

ডাক্তারের সংগে পরামর্শ ক'রে বাবাকে কলকাতায় নিয়ে এলেন জ্যাঠামশাই। চিকিৎসার সুবিধা হবে বলে। তাতে হয়ত এযাত্রা তিনি টিঁকে যেতে পারেন।

কিন্তু তা' হলো না। কলকাতায় নিয়ে আসার পর মাত্র সাতদিন তিনি ভাল ছিলেন। ডাক্তাররা তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু প্রদীপ নেববার আগে শেষবারের মতো অমিত তেজে জ্বলে ওঠার মতো বাবাও যেন জীবনের সম্ভাবনায় শেষ জ্বলে উঠেছিলেন।

তারপরেই একেবারে দপ্ ক'রে নিবে গেলেন।

প্রথমের কয়েকটা দিন দেখে আমার বেশ আশা হয়েছিল। ভোর হতেই বিছানা ছেড়ে উঠে বসছিলেন, জোরে জোরে সূর্য বন্দনা করছিলেন —'ওং জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ম্ মহাদ্যুতিম, ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্ন প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।' আমাকে দেখে অল্প অল্প হেসে বলছিলেন, 'তোর জন্যে কিছুই রেখে যেতে পারলাম না রে, এটা আমার বড় দুঃখ।'

সেদিন সকালবেলাটা বেশ ছিলেন। আমাকে বললেন, 'ধরে একটু বাইরে নিয়ে চল্‌তো আমায়। বাইরের আলো দেখি। মনে হচ্ছে কতযুগ যেন একটা অন্ধকার গুহায় পড়ে রয়েছি।'

তবু আমি সেদিন বাড়ী থেকে বেরোলাম না। বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কিরে অফিস যাবিনা?'

আমি চুপ ক'রে রইলাম। অফিসে যে কি দুর্ভোগ চলেছে তা' তাঁকে বললাম না। বললাম না, আমার চাকরী থাকবে না। 'আজ তো আমি ভাল আছি, কেন মিছিমিছি কামাই করবি? যা, যা অফিস যা।'

আমি ওঁর কাছ থেকে সরে গেলাম কিন্তু বাড়ীর বাইরে গেলাম না।

দুপুরের পর থেকে হঠাৎ শরীরের অবনতি ঘটল। 'বুকে কিরকম করছে, বুকে কিরকম করছে' করতে করতে বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরল সেই সন্ধ্যার পর। তখন চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। লোক চিন্‌তে পারছেন না। শুধু ব্যাকুলভাবে একমুখ থেকে আর একমুখে মসৃণ ভাবে সরে যাচ্ছে তাঁর দৃষ্টি। তারপর ক্রমশঃ সেই দৃষ্টি ম্লান এবং নিস্তেজ হ'য়ে আসতে লাগল। বেলুন যেমন আস্তে ক'রে চুপ্‌সে আসে, তাঁর চাহনীও তেমনি একটু একটু ক'রে সঙ্কুচিত হতে থাকল। আমি তাঁর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়লাম। তাঁর বুকের ওঠা-নামাটা বাড়ছিল। শেষের দিকে হঠাৎ তিনি ছটফটিয়ে উঠলেন যেন, একটা নতুন ক্ষমতায় অস্থির হয়ে উঠলেন। তারপর গভীর যন্ত্রণায় ও উত্তেজনায় তিনি চীৎকার করলেন: 'চারদিকে এত অন্ধকার কেন, এত ধোঁয়া কিসের? সব খুলে দাও, জানলা-দরজা সব খুলে দাও। খোকা, খোকা সে এসেছে। 'নো, নো, নো, লাইফ! হোয়াই শুড এ ডগ, এ হর্স, এ র‍্যাট হ্যাভ লাইফ অ্যাণ্ড দাউ নো ব্রেথ অ্যাট অল? দাউ উইল্‌ট কাম নো মোর। নেভার, নেভার, নেভার, নেভার, নেভার।'

সবাই এক এক ক'রে বাবার খাটের পাশে এসে দাঁড়াল। আমার জীবনে এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! মৃত্যুকে এত কাছ থেকে আমি কোনদিন দেখিনি। আমার মনে হলো, ঘরটা যেন হঠাৎ এক প্রার্থনা-গৃহে পরিণত হয়েছে। আমি শুনেছিলাম, কিন্তু এই প্রথম আমি তার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে উপলব্ধি করলাম যে, মৃত্যুর চেয়ে মহান্ এবং পবিত্র জিনিস পৃথিবীতে আর কিছু নেই। জ্যাঠামশাই যে চরণামৃত এনে দিয়েছিলেন আমি তা' বাবার মুখে একটু একটু ক'রে ঢেলে দিচ্ছিলাম। জ্যাঠামশাই বাবার কানের কাছে আন্তরিক কণ্ঠে 'হরের্নামৈব, হরের্নামৈব, হরের্নামৈব কেবলম্' ব'লে শেষের কথা ক'টি পৌঁছে দিচ্ছিলেন। সরস্বতী কাঁদছে, জ্যেঠিমা খাটের বাজুর ওপর হাত রেখে চোখে কাপড় চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, পায়ের কাছে গৌর, আর দরজার সামনেটায় বিষণ্ণ মুখে বড়দা দাঁড়িয়ে আছে আকাশের দিকে চেয়ে। আমি কাঁদিনি। আমার চোখে জল আসছিল না। আমার মনে

হচ্ছিল, আমি যেন একটি মহান্ ঘটনার দর্শক। যেন এই পৃথিবীর মানুষ আমি নই। কোন অন্যায়, কোন কলঙ্ক আমাকে স্পর্শ করে নি। স্ফটিকের মতো শুভ্র আমার শরীর। আমার মন যেন একটি নিস্তরঙ্গ সরোবর। আমার দৃষ্টি যেন আকাশের মতো উদার। আমার কণ্ঠস্বর যেন মন্দিরের ঘণ্টার মতো পবিত্র। আমি যেন দেবতার অংশ। এ ঘরের প্রত্যেকটি প্রাণীই যেন দেবতার নিকটবর্তী হয়েছে। এই মুহূর্তে কেউ তা'রা আর মানুষ নেই। মানুষের হিংসা, দ্বেষ, ছলনা, কপটতা নেই। এখন তাদের প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি খাঁটি। এখন তাদের প্রত্যেকটি ভঙ্গী সৎ। প্রত্যেকটি অভিব্যক্তি। এখন তাদের নীরব অশ্রুপাত একটি মৃত্যুকে উপযুক্ত গাম্ভীর্য দিচ্ছে, গৌরবান্বিত করছে। আমি একটি জীবনকে মৃত্যুর মহত্বে উত্তীর্ণ হতে দেখলাম।

৩.

বাবা চলে গেলেন। আমার জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হ'য়ে গেল। আমি কাঁদি নি। আমি অভিভূত হয়েছিলাম। আমার দুঃখটা শিলীভূত হ'য়ে আমার বুকের মাঝে চেপে বসে ছিল, দ্রবীভূত ক্রন্দন হয়নি। তবু জ্যাঠামশাই সান্তনার ভঙ্গীতে আমার মাথায় হাত রেখেছিলেন। জ্যেঠিমা অন্নপূর্ণা চোখের জল মুছে—আমার কানের কাছে—ফিসফিস ক'রে বলেছিলেন 'ভয় কি বাবা, আমরা তো রইলাম।'

—হুঁ,।' তাঁরা ছিলেন। একান্ত আপনজনের মতোই তাঁরা আমার পাশে ছিলেন। কিন্তু তবু আমি এই বিশাল পৃথিবীতে একা হ'য়ে গেলাম। জীবন আমার কখনো সরল রেখায় চলেনি। মা'কে আমি জীবনের কোন্ প্রভাতে হারিয়েছিলাম। দারিদ্র্যের কঠিন উত্তাপে মানুষ হয়েছি। সেই উত্তাপ আমার গায়ে হয়ত সোজাসুজি লাগেনি অনেক সময়, কিন্তু তার আঁচ অনুভব করেছি অনুক্ষণ। বাবাকে সেই আগুনে জ্বলতে দেখেছি আর তাতেই আমার পক্ষে স্বস্তিতে দিনযাপন করা হয়নি। মর্মপীড়া আমাকে প্রতিনিয়ত বেত্রাহত করেছে।

এই বোধটুকু অনেকের হয়। অনেকের হয় না। আমার হতো। আমার চারপাশের অব্যবস্থা আমাকে স্পর্শ করত।

তাছাড়া বাবার নিজের জীবন স্বাভাবিক ছিলনা। তিনি নিজেকে নিজের মধ্যেই গুটিয়ে নিয়েছিলেন। বাইরের দিকে খেয়াল তাঁর কম ছিল। আমি পরের বাড়ীতে ছিলাম। খুব কষ্ট ক'রেই ছিলাম। ইচ্ছে এবং প্রয়োজনকে কখনো প্রশ্রয় দিইনি। শুধু গান শেখাটুকু ছাড়া। তাও মণিশঙ্কর আমার কাছ থেকে পয়সা নিতেন না। কি কষ্ট ক'রে পড়েছি। একটাও বই থাকেনি। গৌরের কাছ থেকে, অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে এনে পড়তাম। কলেজের মাইনে কোনবার বাবা পাঠাতে পারতেন, কোনবার পারতেন না। পরীক্ষার ফী জ্যাঠামশাই দিতেন। আর শেষ পর্য্যন্ত অবস্থার তারতম্য ঘটাতে গিয়ে চাকরী নিয়ে কি ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। কি লজ্জা, কি অপমান, কি উদ্‌বেগ! আরো কত ছোট ছোট দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা পেয়েছি—(হয়তো অনেকেই পায় কিন্তু আমার মতো হয়তো এমন ক'রে কেউ উপলব্ধি করেনা) জীবনের পথে যেগুলো ছোট ছোট পাথরের মতো অজস্রভাবে ছড়িয়ে থাকে। তবু সবই আমি গ্রহণ করতে পারছিলাম। কাতর হ'য়ে হাল ছেড়ে বসে পড়ি নি। কারণ, সব কিছু ছাড়িয়েও আমার একটা ভরসার আশ্রয় ছিল, একটা নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। সব কিছুর আড়ালে একটু স্নেহের নরম হাতের স্পর্শ আছে, তা' যেন জানতাম।

বাবা মারা যাওয়াতে সেই ভরসাটুকু আমার ঘুচে গেল: সেই আশ্বস্ত অবলম্বন আর রইল না। এখন আমার শরীর খারাপ হ'লে ছাতনা থেকে আর কেউ ছুটে ছুটে আসবে না। এখন উপদেশ দিয়ে, সাহস দিয়ে, অনুভব দিয়ে বড় বড় ক'রে কেউ আর চিঠি লিখবে না। আর আমি, আমিই বা কাকে স্নেহের শাসন করব এখন। আসলে আমি আমার এক বিশ্বস্ত এবং শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে চিরতরে হারালাম।

আমার এই নাতিদীর্ঘ জীবনে যাদের শুধু প্রবেশ এবং প্রস্থান করার

ক্ষুদ্র ভূমিকা ছিল না, যারা আরো গভীরভাবে ছাপ রেখে গিয়েছিল তাদের মধ্যে ললিতা-বউকে আমার খুব বেশী ক'রে মনে পড়ে। আমি জানি বাবা, ললিতা-বউ, মীনাক্ষি এরা আমার জীবনে এক একটি সঞ্চয়, এক একটি অভিজ্ঞতা।

ললিতা-বউ মণিশংকরের স্ত্রী। সেই প্রথমদিন রাত্তিরে আমি যাঁকে রাগের মাথায় অনেক কড়া কথা শুনিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি কিছু মনে করেন নি। মনে যে করেন নি সেটা বুঝেছিলাম মণিশংকরের কাছে কয়েকদিন গান শিখতে যাবার পর।

আমাকে তিনি চা দিতে এসেছিলেন। চায়ের কাপটা মাটিতে নামিয়ে রেখেই চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন। মাথায় সেই ছোট্ট ক'রে ঘোমটা টানা। সেই ব্যথিত দৃষ্টির কোমল একখানি মুখ। একটু হেসে বললেন, 'কি ভাই, আপনার রাগ পড়েছে? না, এখনো আপনার ধারণা আমি শুধু মিনমিনে গলায় লোক ভুলোই?'

মণিশংকর একটা স্বরলিপি তৈরি করছিলেন। তিনি হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বলে উঠলেন, 'কি ব্যাপার?' তারপরই হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললেন, 'ও বুঝেছি, বুঝেছি, সেই ব্যাপার' ব'লেই আবার নিজের কাজে মন দিলেন।

আমি ভীষণ লজ্জা পেয়েছিলাম। বাকী সময়টা আর মাথা তুলতে পারি নি। বাড়ী ফেরার সময় বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ললিতা-বউ। আমাকে দেখে বললেন, 'আমি ভাই একটুও রাগ করি নি। আমার সংগে এবার ভাব তো?' তাঁর ছেলেমানুষী দেখে আমি আরো লজ্জা পেয়েছিলাম। সংকোচ বোধ ক'রে ছিলাম। একটিও কথা না ব'লে শুধু অল্প হেসে পাশ কাটিয়ে চ'লে এসেছিলাম তাড়াতাড়ি।

ললিতা-বউ সত্যিই ছেলেমানুষ। মণিশংকরের সংগে তাঁর বয়সের অনেক তফাৎ। অনেকদিন পরে ললিতা-বউ নিজেই এসব কথা আমাকে বলেছিলেন।

মস্ত বড়লোকের একমাত্র মেয়ে ছিলেন তিনি। বালীগঞ্জ অঞ্চলে তাঁর বাবার নাম সবাই জানত। ললিতা-বউ গান শিখতেন মণিশংকরের

কাছে। একদিন তাঁদের মধ্যে ভালবাসা হলো। ললিতা-বউ কোন খোঁজ-খবর নিলেন না, কিছু জানতে চাইলেন না। বয়সের পার্থক্যও তিনি ভুললেন—তখন আরো কম বয়স, অত বাছ-বিচার করার ক্ষমতাও নেই তাঁর। তিনি শুধু ভালবাসার টানেই ভেসে পড়েছিলেন।

বাবা, মা, আত্মীয়-স্বজন তখন কত নিষেধ করেছিল। বাবা তো আর তারপর থেকে মেয়ের সংগে সম্পর্কই রাখেন নি। মা-ই শুধু লুকিয়ে-চুরিয়ে যোগাযোগ রাখতেন। কিন্তু ললিতা-বউয়ের দুর্ভাগ্যে তাঁর কোন হাত ছিল না। তাছাড়া, ললিতা-বউ নিজেও কাউকে জড়াতে চাইতেন না। সাধ ক'রে, স্বেচ্ছায় যে-জীবন তিনি বরণ ক'রে নিয়েছেন তার জন্যে অন্যকে ত্যক্ত ক'রে, বিব্রত ক'রে লাভ কি!

মণিশংকর নিজে ললিতা-বউ বলতেন ব'লে সবাই তাঁকে সেই নামেই ডাকত। তাঁর স্বভাবের জন্যে তিনি সকলকার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। লোকের জন্যে প্রাণ ঢেলে খুব করতেন।

একবার আমার অসুখ করেছিল। আমি কয়েকদিন শয্যাশায়ী ছিলাম। মণিশংকর গোস্বামীর কাছে যেতে পারি নি। ললিতা-বউ নিজেই এসেছিলেন আমার খোঁজ নিতে। আমি খুব ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলাম। কিন্তু ললিতা-বউ আমার গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে, ওষুধ খাইয়ে এমন ভাব করলেন যেন এটা তাঁর খুবই সহজ এবং স্বাভাবিক একটা কর্তব্য।

আরো ক'দিন এলেন আমায় দেখতে। আমি বললাম, 'ললিতা-বউ আপনি অতদূর থেকে আসেন কেন কষ্ট করে?'

ললিতা-বউ জবাব দেন নি, হেসেছেন শুধু। বেশী কিছু বললে দৃষ্টি দিয়ে মধুর শাসন করেছেন। আমার আপত্তি, প্রতিবাদ সব ভেসে গেছে।

ললিতা-বউ জীবনে যে সুখী হতে পারেন নি, তা বাইরে থেকে দেখে বোঝা যেত না। যাদের দেখবার চোখ ছিল না, তা'রা টেরও পায় নি। কিন্তু আমি বুঝতাম, আমার মনে হতো একটা কঠিন যন্ত্রণাকে তিনি অহরহ-ই তাঁর বুকের নিচে বহন ক'রে চলেছেন। ইচ্ছে করলেই যে বেদনা,

যে যন্ত্রণাকে তিনি ভূলুণ্ঠিত করতে পারেন না, অথচ তার দ্বারাই দিনে দিনে, তিলে তিলে লুণ্ঠিত হয়ে চলেন। আর, একফোঁটা একফোঁটা ক'রে সেই যন্ত্রণা, সেই বেদনা তাঁর চোখে জমা হয় কিন্তু মুখের হাসিটুকু মিলিয়ে যায় না। এই মমতা মাখানো হাসিটুকু এবং একটি প্রায়-প্রৌঢ় মানুষের বিস্রস্ত এবং অবিন্যস্ত জীবনকে একান্ত সঙ্গে ও সাহচর্যে সংগতি দেবার চেষ্টা,—লোকের ভুল বোঝার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এর নেপথ্যে তাঁর হৃদয়ের সীমাহীন বেদনার দহনকে কেউ তা'রা লক্ষ্য করে নি। তাতে তিনি একা একাই নীরবে জ্বলেছেন। কাউকে জানতে দেন নি। কোন বহিঃপ্রকাশ ছিল না।

কিন্তু আমি বুঝেছিলাম। আর সেকথা ললিতা-বউ যেন কেমন ক'রে টের পেয়েছিলেন। টের পেয়েছিলেন যে, আমি তাঁর ওপরের অভ্যস্ত সজ্জাকে অতিক্রম ক'রে ভেতরে হাত রেখেছি। মনের ভেতর। তাই ক্বচিৎ এক একবার আমার কাছেই তিনি উন্মুক্ত হতেন, উন্মোচিত। বলতেন, 'শোভনভাই, সারারাত্তির এই জানলায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতেই বোধহয় আমার জীবনটা কেটে যাবে।'

মণিশংকর রাত্তিরে বেরোতেন, বাড়ী ঢুকতেন সেই ভোরবেলায়। তখনো নেশার ঘোর কাটত না। ললিতা-বউ তাঁকে ধ'রে গাড়ী থেকে নামিয়ে এনে বিছানায় শুইয়ে দিতেন। জুতো-জামা ছাড়িয়ে দিতেন। এমনি চলত রাতের পর রাত।

একদিন আমি আমার জীবনের সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতাটি অর্জন করলাম। আমি তখনো মণিশংকর গোস্বামীর কাছে গান শিখতে যাই বটে, তবে আস্তে আস্তে নিজেকে বাইরে মেলবার চেষ্টায় ব্যগ্র হয়েছি। তখন।

পশুপতি বোস লেনের বাড়ীতে সেদিন কেউ ছিল না। কোথায় অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন হচ্ছে জ্যাঠামশাই গিয়েছিলেন সেখানে। আর, জ্যেঠিমা সরস্বতীকে নিয়ে গিয়েছিলেন কলুটোলায় তাঁর ভাইয়ের বাড়ীতে। ছিল শুধু গৌর। আমি আর গৌর দোতলার ঘরে বসে বসে গল্প করছিলাম।

হঠাৎ ঝড়ের বেগে ঢুকলেন ললিতা-বউ। কি রকম এলোমেলো চেহারা তাঁর। মাথায় কাপড় নেই। চাবিসুদ্ধ আঁচলটা হাতে নেমে এসেছে। উস্কো-খুস্কো চুল। আর চোখ যেন আগুনের আঁচে জ্বলছে।

গৌরের দিকে একবার চেয়ে নিয়েই তিনি আমাকে বললেন, 'তোমার সংগে একটু দরকার আছে, আড়ালে চল।' আমার মনে হলো, এ যেন অন্য কেউ কথা বলছে, আমার পরিচিত সেই ললিতা-বউ নয়। কণ্ঠে কি কাঠিন্য, কি উত্তাপ!

আমি গৌরের দিকে একবার তাকাতেই গৌর যেন বুঝল সব। সে ঘর ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু আমিই ললিতা-বউকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। চলে গেলাম ছাদে, চিলকুঠরীতে।

ঘরে ঢুকেই ললিতা-বউ দরজাটা টেনে দিলেন। মিথ্যে বলব না, আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম। ললিতা-বউয়ের সেই কোমল, করুণ ও নমনীয় চেহারা থেকে কেমন যেন একটা বুনো অভিপ্রায় উঁকি মারছিল।

কিছুক্ষণ আমরা দু'জনেই কথা বলতে পারলাম না। আমাদের সামনে একটা পরাক্রান্ত দ্বিধা, সংকোচ এবং উৎকণ্ঠা বিপুলশক্তিতে পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল। তাকে অপসারিত করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না।

শেষ পর্যন্ত আমিই বাধা সরালাম। বললাম 'কি হয়েছে ললিতা-বউ?' জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে গলাটা ঈষৎ কুঞ্চিত হলো, কম্পিত। ললিতা-বউ আমার কাছে এগিয়ে এলেন। খুব কাছে। একটি সর্বনাশের মতো। এত কাছে তাঁর আসা উচিত নয়। কোন বিবাহিতা স্ত্রী'রই কোন অবিবাহিত তরুণের কাছে আসা উচিত নয়। এলেই সর্বনাশ হয়।

আমার সমস্ত গায়ের রক্ত যেন ছলাৎ ক'রে উঠল। কে যেন আমার শরীরের দাহ্য পদার্থে আগুন নিক্ষেপ করল।

ললিতা-বউ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন সোজাসুজি।

আমার সামনের বায়ুস্তরে তাঁর গায়ের গন্ধ ভাসছে। আঁচল প'ড়ে গেছে মাটিতে। অনাবৃত বুক ঘন উত্তেজনায় উঠছে, নাবছে। পাখীর পেটের মতো।

ললিতা-বউ খপ্ ক'রে আমার একখানা হাত চেপে ধরলেন, তারপর উদ্‌ভ্রান্তের মতো বললেন, 'তুমি আমাকে নিয়ে পালাবে শোভন?'

আমি ছিট্‌কে কয়েক পা সরে এলাম। নারীকে আমি খুব কাছ থেকে কখনো দেখি নি। কোন নারীকেই না। মা নারী ছিলেন কিন্তু মাকেও আমি কাছ থেকে দেখতে পাই নি। আমি রক্তে রক্তে একটা নতুন আহ্বান শুনলাম। ললিতা-বউ হঠাৎ পিছন ফিরে তাঁর পিঠের দিকের জামাটা তুলে ধরলেন। 'দেখ, দেখ শোভন, তোমাদের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিটির কাণ্ড দেখ।'

বলেন আর হু-হু ক'রে কাঁদেন।

আমি দেখলাম তাঁর সারা পিঠটা দাগড়া-দাগড়া হয়ে গেছে। রক্ত জমে গেছে এক এক জায়গায়।

পিঠের জামাটা নামিয়ে, ঘুরে দাঁড়িয়েই ললিতা-বউ বললেন, 'আরো দেখবে?' বলেই তিনি পায়ের কাপড়টা তুলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'থাক্ ললিতা-বউ আমি সব বুঝেছি।'

'না, তুমি দেখ, সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে আমার পায়ের কি অবস্থা করেছে। নেশা ক'রে এলে মানুষটা একেবারে জন্তুর অধম হয়ে যায়। এতদিন আমি কাউকে কিছু বলি নি। নিজের ব্যথা নিজেই বয়ে এসেছি। মুখ বুজে সব সহ্য করেছি। কিন্তু শোভন, তুমিই বল আর কত সহ্য করব? একদিন সত্যি সত্যি ভালবেসে বিয়ে করেছিলুম ব'লে এত যন্ত্রণা সহ্য করি নইলে কবেই তো শেকল কেটে আমার বেরিয়ে যাবার কথা। আমিও তো মানুষ, একদিন ভালবেসেছিলুম বলেই কি সারাজীবন এত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে হবে? তাছাড়া আমার ছেলে নেই, পুলে নেই আমার কিসের বন্ধন? আর, থাকলেই বা কি! বন্ধন যখন ভীষণ হয়ে ওঠে তখন হাজার ঐশ্বর্য থাকলেও সেটা

গলায় ফাঁস হ'য়ে বসে। শোভন, আমি আর পারছি না। তুমি আমাকে বাঁচাও। আমাকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে চল শোভন!'

আমার একটা হাতের ওপর ললিতা-বউয়ের ছু'টো ব্যাকুল হাত থরথর ক'রে কেঁপে উঠল।

কয়েকমিনিট আমি একটা নির্বাক অস্থিরতায় কাটালাম। তারপর সরে এলাম। সরে জানলার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ালাম। তখন সন্ধ্যা হচ্ছে। কলকাতার আকাশে ধোঁয়ার অভিসার আরম্ভ হয়েছে। সেই প্রবহমান ধোঁয়ার অসীম পরিব্যাপ্তির ভেতরে ভেতরে রাস্তার এবং বাড়ীর আলোগুলিকে প্রাচীন, জীর্ণ এবং নির্জীব মনে হচ্ছে।

আমি আবার ঘুরে দাঁড়ালাম। ললিতা-বউয়ের চোখ আমার দিকে দৃঢ় নিবদ্ধ। সে চোখে আশা এবং আতংক পাশাপাশি শুয়ে আছে। উৎকণ্ঠা এবং উত্তেজনা। তাঁর শরীরের দ্রুত-লয়, উত্থান-পতন এখনো থামে নি। শুধু ইতোমধ্যে খসে-পড়া আঁচলটা আবার তাঁর বুককে রক্ষা করছে।

আমি বললাম, যতদূর সম্ভব শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বললাম, 'তা হয় না ললিতা-বউ। জীবনটা কিছু একমুহূর্ত্তের উন্মাদনা নয়। যে-সব বড় বড় ঘটনায় জীবনের দিক্-পরিবর্তন হয় সেগুলো হয়ত হঠাৎই আসে তবু ভাল ক'রে বুঝতে হয়, নিজেকে প্রস্তুত করতে হয় তার জন্যে। বলতে পার অনুশীলন করতে হয়। নইলে এখন একরকম, তখন একরকম, পরে আরেকরকম—তাতে জীবনের হিসেবে বড় গোলমাল হ'য়ে যায়। কোনটার প্রতিই সুবিচার করা হয় না।'

আমি থামলাম। ললিতা-বউয়ের মুখের দিকে তাকালাম। তারপর এগিয়ে গিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললাম, 'ঠিক তোমাকে গ্রহণ করতে আমি এখন প্রস্তুত নই ললিতা-বউ। যদি কখনো হই, জেন, পরে কোনদিন আর তার নড়চড় হবে না। তবে তেমন সিদ্ধান্ত আমি হয়ত নিতে পারি না।'

'কেন?' অস্ফুট কণ্ঠে বলল ললিতা-বউ।

'কেননা, কোনদিন আমি সেভাবে ভেবে দেখি নি। সেরূপে কল্পনা করি নি। এ সম্ভাবনাটার কথা আমার মনে আসে নি। আমি

প্রস্তুত ছিলাম না। তোমার দুঃখ বুঝে আমি ব্যথিত হয়েছি। তোমার করুণ চাহনি দেখে আমার বুকের ভেতরটা বহুবার হু-হু ক'রে উঠেছে। হয়ত, হয়ত তোমাকে আমি ভালও বেসেছিলাম। কিন্তু সেটা মনের ভেতরে ঠিক ক'রে উদ্দেশ না-নেওয়া একটা উপলব্ধিমাত্র। একটা চৈতন্য শুধু। তার আকার ছিল না, আয়তন ছিল না। এমতাবস্থায় আমি কি করব ললিতা-বউ? আমার কি করা উচিত? তুমিই বল! আমি কি পারি তোমায় গ্রহণ করতে?'

আমার কথা শুনে ললিতা-বউ কেমন যেন ম্লান হ'য়ে গেলেন। আস্তে আস্তে একটা কোমল ছায়া পড়ল তাঁর চোখে, মুখে। তিনি খানিক চুপ ক'রে থেকে খুব মিয়ানো গলায় বললেন, 'ও, বেশ।' ব'লেই আঁচল দিয়ে ভাল ক'রে মুছে নিলেন চোখটা তারপর মেঘের কোলে রোদ্দুরের মতো তাঁর অশ্রুসিক্ত মুখে একটুকরো অপ্রতিভ হাসি খেলে উঠল। তিনি বললেন, 'আজকের কথাগুলো ভুলে যেও ভাই। আমার হঠকারিতা ক্ষমা করো। মনে করো ললিতা-বউয়ের মাথা খারাপ হয়েছিল একদিন, শুধু একদিন। আর পার তো' পৃথিবীর লোককে পরে কখনো জানিও আমার কথা। জানিও আমি তোমার সংগে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম' (ললিতা-বউ, আমি তোমার কথা রেখেছি। তুমি জানলা আমি বিশ্বস্ত সংবাদদাতার মতোই তোমার খবর বলেছি লোককে। তুমি যা আমি সেইভাবেই এঁকেছি তোমাকে। এতটুকু অতিরঞ্জিত করি নি, এতটুকু অতিকৃত করি নি। শুধু তোমার সব কথার পর যে কথাটা অনুক্ত থেকে গিয়েছিল, যেটা তুমি আমাকে বলতে বল নি, সেটাও যোগ ক'রে দিয়েছি। হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভালবেসেছি। সেদিন নয়। একটু একটু ক'রে। আস্তে আস্তে। তোমার উপস্থিতিতে নয়, অনুপস্থিতিতে। আমার প্রতিদিনের কার্যের নিভৃতে, আমার না-বলা বাণীতে। কৃপণের ধনের মতো সেই ভালবাসা আমার প্রত্যহ বেড়েছে। একক এবং অমর্ত্যীয় ঐশ্বর্যের মতো। মীনাক্ষি তার নাগাল পায় নি। না পেয়েও কোন ক্ষতি হয়নি তা'র। আর, মীনাক্ষি সেকথা ভাল করেই জানে)।

শেষের দিকে কান্নায় গলাটা তাঁর বুজে গিয়েছিল। তিনি আর দাঁড়ান নি। ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ঘর থেকে। তারপর দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যেতে লাগলেন।

আমি পেছন থেকে বারবার চাপা গলায় ডাকলাম, 'ললিতা-বউ, ললিতা-বউ শোন, ললিতা-বউ—।'

ললিতা-বউ আর ফেরেন নি।

কিন্তু আমি জানতাম না সেই তাঁর সংগে শেষ দেখা। জানলে আমি তাঁকে অমন ক'রে ছেড়ে দিতাম না। আমি সময় নিতাম। আমার যুক্তির কাছে আমার হৃদয় পরাভূত হতো। আমার সেই একটিমাত্র চৈতন্য এবং উপলব্ধির বোধোদয়কে আমি সীমাহীন আয়তনে প্রসারিত করতাম। তাতেই অবগাহন করতাম। বলতাম, 'ললিতা-বউ আমাকে তুমি একা ফেলে যেতে পার না। তোমাকে আমার সত্যিই দরকার। তুমি ছাড়া আমার দিন চলবে না। আমাকে তুমি উপযুক্ত করে নাও।'

যেদিন সন্ধ্যায় ললিতা-বউ পশুপতি বোস লেনের বাড়ী থেকে চলে গেলেন, সেদিন মাঝ রাত থেকেই তুমুল বৃষ্টি নেমেছিল। একটানা সেই বৃষ্টি পরের দিন দুপুর পর্যন্ত থামে নি। সারা আকাশ কালীবর্ণ। রাস্তা-ঘাটে জল থৈ-থৈ করছে। ট্র্যাম, বাস সব বন্ধ। গলির ভেতরে ভেতরে হাঁটু-জল! লোকজন সেই জলে কাপড় গুটিয়ে ছপ্ ছপ্ ক'রে হাঁটা-চলা করছে।

আমি সারাদিন বাড়ী থেকে বেরোতে পারি নি। প্রকৃতির বর্ষণ-ক্লান্ত চেহারা আমার মনে ভারী হ'য়ে বসেছিল। তাছাড়া মন এমনিতেও ভাল ছিল না। আর্থিক অবস্থা দুশ্চিন্তার কারণ হ'য়ে উঠছিল ক্রমশই। আর গত রাতের নিদারুণ অভিজ্ঞতাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। একটা নিরেট ভারী বস্তুর মতো আমার বুকের মধ্যে এপাশ থেকে ওপাশ গড়িয়ে ফিরছিল।

সারাটা দিন গল্পের বই পড়ে, গান গেয়ে সরস্বতীর পড়া দেখিয়ে

দিয়ে কাটালাম। অন্যমনস্ক হতে চাইলাম। তারপর সকাল সকাল খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লাম। বিছানায় অন্ধকারের নীরব প্রশান্তিতে ললিতা-বউয়ের কথা নতুন ক'রে মনের সবটুকু জুড়ে বসল। গতরাতের সেই আশ্চর্য দৃশ্যটি আমার চোখের সামনে যেন পুনরভিনয় হলো…

'তুমি আমাকে নিয়ে পালাবে শোভন…দেখ, দেখ, তোমাদের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিটির কাণ্ড দেখ… ।'

আস্তে আস্তে চেতনার দড়িদড়াগুলো শিথিল হতে থাকল, চিন্তাগুলো ছত্রাকার হ'য়ে যেন ভাসতে লাগল, দুলতে লাগল শূন্যে। তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল। নরম নরম পায়ে। ঘুম নামল।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ দরজায় দুম্-দুম্ ক'রে ঘা পড়ল। ঘুম ভেঙে গেল আমার। আমি তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলতেই ব্যস্ত হ'য়ে ঘরে ঢুকল গৌর। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মণিশংকরবাবু আর নিখিলেশবাবু এসেছেন, তোমাকে ডাকছেন, শীগ্গির যাও।'

এত রাতে মণিশংকরবাবু! আমার হৃৎপিণ্ডটা সজোরে দুলে উঠল। একটা অমঙ্গলের আশংকা বৃশ্চিকের দংশনের মতো বুকের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত জ্বলিয়ে দিয়ে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম পৌনে একটা। তখন আবার অন্য সম্ভাবনায়, অসহ্য বিরক্তিতে ভরে উঠল মনটা। ভাবলাম, মোদো-মাতালদের কাণ্ডই আলাদা।

নিচে নেমে এসে দেখি মণিশংকর মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছেন। পথের জল-কাদার ওপরেই। আর তাঁর সাম্‌নে নিখিলেশ চক্রবর্ত্তী অস্থিরভাবে পদচারণা করছেন। আমি কাছে গিয়ে দেখলাম তাঁর মুখটায় চিন্তার এক পুরু আস্তরণ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হয়েছে?'

আমার গলা শুনে, মণিশংকর মাথা থেকে হাত নামিয়ে মুখ তুলে তাকালেন। সে দৃষ্টি শূন্য এবং অসহায়। কি যেন একবার বলতে গেলেন তিনি কিন্তু পারলেন না। শুধু শরীরটা একবার নড়ে উঠল আর ডান হাতটা করুণভাবে এলিয়ে পড়ল হাঁটুর ওপর।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হয়েছে?' এবার আমার গলাটা একটু চড়া পর্দাকে আশ্রয় করল।

জিজ্ঞাসা ক'রেই আমি নিখিলেশ চক্রবর্ত্তীর দিকে তাকিয়েছিলাম। নিখিলেশ খুব কুণ্ঠিত হ'য়ে নিচু গলায় বললেন 'ইয়ে একটা কাণ্ড হয়েছে। একটা দুর্ঘটনা—'

আমি বললাম, 'দুর্ঘটনা! কিসের দুর্ঘটনা?'

নিখিলেশ আরো এগিয়ে এসে প্রায় কাণের কাছেই বললেন, 'ললিতা-বউ ঘণ্টা দুয়েক আগে আত্মহত্যা করেছেন।'

ললিতা-বউ আত্মহত্যা করেছে! ক্ষোভে, রাগে আমি নিজের হাতটাই সবেগে কামড়ে ধরলাম। দাঁত বসিয়ে দিলাম। ইচ্ছে হলো সামনে যে-লোকটা এখন ভালমানুষের মতো, নিতান্ত অসহায় আর কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো বসে আছে, তার ওপর আমি হিংস্র পশুর শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলি। পৃথিবী থেকে এইসব ভালমানুষরূপী শয়তানদের ভার কমিয়ে দিই।

আমি অত্যন্ত দিশেহারা এবং আত্মহারা হয়েছিলাম। আমার মনের ভারসাম্য ছিল না বললেই হয়।

সেই সময় রাস্তা দিয়ে একটা কুকুর যাচ্ছিল। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, তার একটু তফাৎ দিয়ে। আমি হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে রুদ্ধ আক্রোশে কুকুরটার পেটে সজোরে এক লাথি বসিয়ে দিলাম। কুকুরটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে। তার যন্ত্রণাকাতর বিকট চীৎকার রাত্তিরের মৌনতা টুটে শব্দের এক উৎকট আবহাওয়া তুলল।

আমার এই আচরণে নিখিলেশ আমার দিকে অবাক হ'য়ে তাকালেন আর মণিশংকর অত্যন্ত উদাস ও নিস্পৃহভাবে। আমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলাম না। আমি ভাবছিলাম ললিতা-বউয়ের কথা। তার প্রতি আমার রাগ হচ্ছিল। ভাবছিলাম ললিতা-বউ কি নির্বোধ! এত নির্বোধ যে আত্মহত্যা করে! এত দুর্বল এবং এত কাপুরুষ! জীবনের যন্ত্রণা সহ্য করতে না-পেরে শুধু একটা দুর্বল আবেগের দাস হয়ে মৃত্যুর

দ্বার দিয়ে পলায়ন করায় কোন গৌরব নেই, সম্মান নেই। আছে শুধু একটা নিদারুণ লজ্জা আর নিরতিশয় ভীরুতা। তার চেয়ে ললিতা-বউ বিদ্রোহী হলো না কেন? তার চারপাশের শৃংখল, বন্ধন, অবরোধকে ভেঙে ফেলল না কেন সে? মৃত্যুতে মুক্তি না-খুঁজে এই জীবনেই তা'র দুঃখ, কষ্ট, শাস্তি থেকে মুক্ত হলো না কেন? তাতে সে নতুন ক'রে বাঁচতে পারত। তাতে তা'র এতদিনকার প্রচেষ্টাটুকু এমন ক'রে মিথ্যে হয়ে যেত না।

আমার ভেতরে যেন একটা প্রবল প্রভঞ্জন দুরন্ত বেগে ছুটোছুটি করছিল। আমি নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না। অত্যন্ত বিচলিত এবং উত্তেজিত হচ্ছিলাম। তবু বহু কষ্টে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম।

নিখিলেশবাবুকে উদ্দেশ্য ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বেশ হয়েছে। তা, তাঁর দেহটা এখন কোথায়?' আমি নরম ক'রে বলার চেষ্টা সত্ত্বেও কথাটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর শোনাল। নিজেই বুঝতে পারলাম। নিখিলেশবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হাসপাতালে। কাপড়ে আগুন দিয়ে পুড়েছিলেন তো' তাই একবার চেষ্টা ক'রে দেখবার জন্যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোন লাভ হয় নি। পথে যেতে যেতেই মারা গেছেন।'

আমার মনে আছে আমি পর পর পাঁচ রাত্তির ঘুমোতে পারি নি। কি দারুণ অস্থিরতা আমার সকল সত্তা ব্যেপে বিদ্যুতের মতো ঘন ঘন চমকে যাচ্ছিল। আমি চোখ বুজতে পারি না। চোখ বুজলেই ললিতা-বউকে দেখতে পাই। ললিতা-বউয়ের দগ্ধ, ভয়ংকর চেহারাটা ভেসে ওঠে। বহু চেষ্টায় একটু গাঢ় তন্দ্রাভাস হলেই নানা রকম বিশ্রী স্বপ্ন আমার চোখ থেকে ঘুমের সব সম্ভাবনাকে মুছে নিয়ে যায়।

স্বপ্ন! আমি ভেবেছি। একটা অন্তহীন, অবয়বহীন অন্ধকারপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভেবেছি। স্বপ্নরা তো' মন থেকে জন্মায় না। তাদের জন্ম বাসনার গর্ভে। অপূর্ণ কিংবা অতিচিন্তিত

অত্যন্ত মন-সংযোজিত বাসনাগুলোই ঘুমের ঘোরে জীবনের ব্যাকরণ না-মেনে কখনো হ্রস্বাকারে কখনো দীর্ঘাকারে, কখনো খুব কুৎসিত আবার কখনো খুব সুন্দর হ'য়ে স্বপ্নের পোষাক প'রে মানুষের অচেতন সত্তার ওপর দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে বেড়ায়। কিংবা বলা যায়, স্বপ্নরা যেন ছড়িয়ে-থাকা অজস্র মণি-মুক্তো। নিদ্রাকল্প মানুষ সেই সব মণি-মুক্তোর ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে ভেসে চলে যায়। সেখানে কোন সময়ের কড়াকড়ি নেই, নেই কোন যুক্তি-নিয়ম মানার ঝঞ্ঝাট। শুধু ভাসতে ভাসতে হয় বেদনায় গিয়ে পৌঁছোও, নয় আনন্দে; হয় ভয়ে নয় ভয়হীনতায়।

আমি ক'দিন ধরে স্বপ্ন দেখেছিলাম। ক্রমাগত নানা উদ্ভট স্বপ্নে ভেসেছি। কখনো দেখি একটা প্রকাণ্ড কুকুর আমাকে তেড়ে আসছে কামড়াতে। কি ভীষণ তার চোখ আর হাঁ! কি বড় বড় ধারাল দাঁত! কাছে আসতেই সেই কুকুরটা হঠাৎ ললিতা-বউয়ের দগ্ধ মৃতদেহ হয়ে উঠল। কখনো দেখলাম, চিলকুঠরীর জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ললিতা-বউ। আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সে কি ভীমা-ভৈরবী মূর্তি! মুখে শুধু বলছে, 'আমি বাঁচতে চাই। আমাকে বাঁচাও।'

আমি আতংকিত চেহারায় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছি। ঢকঢক ক'রে জল খেয়ে ঘরময় পায়চারী ক'রে বেড়িয়েছি। ললিতা-বউয়ের জন্যে আমার কষ্ট হয়েছে। একটা দুর্বার প্রক্ষোভ আমার অন্তরের দিগ্বিদিকে উত্তাল-উচ্চকিত হয়েছে। নিজেকেও দোষ দিয়েছি। অপরাধী সাব্যস্ত করেছি, আমিও কী দায়ী নই ললিতা-বউয়ের মৃত্যুতে? তাকে বাঁচাবার আমার কী কোন দায়িত্বই ছিল না? ললিতা-বউ তো বাঁচতেই চেয়েছিল? উচিত ছিল এরকম একটা সম্ভাবনার কথা আমার আগেই ভাবা। পূর্বাপর বিবেচনা না-করে তাকে প্রত্যাখ্যান করা আমার ঠিক হয় নি।

কিছুদিন অত্যন্ত মনস্তাপে কাটল। কিছুতেই মনের গ্লানি আর মোছেনা। কিন্তু সময় ব'লে কথা। জগতের বড় বড় দুঃখ, কষ্ট, বিচ্ছেদকে নিঃশেষে শুষে নিতে সময়ের চেয়ে ভাল ওষুধ কিছু নেই। ক্রমে ক্রমে আমিও অনেকটা সইলাম, সামলালাম।

তাছাড়া শৈশব থেকে বহুজন-পরিবৃত জীবন যাপন না ক'রে এবং একলা, আমার চারপাশের দুঃখ, বিচ্ছেদ, দারিদ্র্যকে স্পর্শ করতে করতে আমার মধ্যে একটা বৈরাগ্য জন্মাচ্ছিল। আমি জীবনের যন্ত্রণা, বেদনাকে আপন ক'রে আমার সীমার মধ্যে শান্ত আলোকচ্ছটার মতো আবরিত করতে পারছিলাম। তার উত্তপ্ত স্থিরদ্যুতিটুকু শুধু আমার হৃদয়ের রুদ্ধ কক্ষে মহান দহন সৃষ্টি করছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম মানুষের কাতরতা একটা নির্বোধ অভিব্যক্তিমাত্র। কেননা, সহায়-সম্বল কিছুই স্থির থাকার জিনিস নয় এবং পৃথিবী আপন বেগে ছুটে চলে। সুতরাং, মানুষ নিরন্তর দুঃখ-বেদনার ভাবাবেগে অস্থির হ'লে পৃথিবীর যাত্রাপথে বারবার তা'র পা মিলবে না। এবং পৃথিবী তা'কে অক্লেশে পরিত্যাগ ক'রে চলে যাবে।

আসলে বোধহয় আমি স্বভাবে বাবার মতো হচ্ছিলাম।

ললিতা-বউ গেল, বাবা গেলেন, চাকরী নিয়ে অতবড় একটা গোলমাল হলো আর আমিও পশুপতি বোস লেনের বাড়ী ছাড়লাম। পর পর অনেকগুলো পরিশ্রমের কাজ ক'রে আমার জীবন যেন এবার শান্ত হ'য়ে বিশ্রামে বসল।

আমি বাড়ী ছাড়ব শুনে জ্যেঠিমা হাঁ-হাঁ ক'রে উঠেছিলেন। খুব দুঃখিত হ'য়ে বলেছিলেন. 'শোভন কি আজও আমাদের আপন ক'রে নিতে পারলি না রে? এখনো তোর কিসের দ্বিধা, কিসের সংকোচ? তুই আর আমার গৌর কি পর?'

আমি প্রথমটা জবাব দিইনি। কী জবাব দেব! এঁদের স্নেহের কাছে বারবার মাথা নিচু হ'য়ে যায়, এঁদের বিশুদ্ধ আন্তরিকতার কাছে পরাভব না মেনে উপায় থাকে না। মানুষ হিসেবে এঁরা কত খাঁটি, এঁদের প্রবৃত্তিগুলো কত সৎ! আ. দেশে মানুষ আছে অসংখ্য, কিন্তু মানুষের মতো মানুষ কই? কয়েকটা বড় মানুষ চাই না আজ, ঘরে ঘরে ভাল মানুষ চাই।

আমি বললাম, 'জ্যেঠিমা অমন ক'রে বলবেন না। তাহলে সত্যিই আমার যাওয়া হবে না। আমি কি সেজন্যে যেতে চাচ্ছি! আমি বাইরে

বেরিয়ে দুনিয়ার হালখানা ভাল ক'রে টের পেতে চাই। একটু আত্মনির্ভর হ'তে চাই। নিজের পা'য়ে দাঁড়াব ব'লে আপনার কাছছাড়া হচ্ছি কিন্তু পর হ'য়ে যাচ্ছি না।'

জ্যাঠামশাই একটুও আপত্তি করেন নি। তিনি সব শুনে বলেছিলেন, 'ঠিক, এই তো' মুরারীর ছেলের মতো কথা। আমি খুব খুশী হয়েছি বাবা যে, তুমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দুনিয়াদারী দেখতে চাইছ। দেখ, শুধু ক্রিয়েচার অফ্ সারকামষ্টান্স্ হ'য়ে কোন লাভ নেই। য়ু্য মাষ্ট লীন্ ফরোয়ার্ড—কাজ কর, কাজ কর আর এগোও।'

একটু একটু ক'রে আমার কাজের সুবিধে হলো। রোজগার পত্তর বাড়ল। গোটাকয়েক গানের ট্যুশনি পেলাম, এমনি ছেলে পড়াবার ট্যুশনিও জুটল একটা। এখানে-ওখানে গান গাইবার ডাক আসতে লাগল। রেডিওতে প্রোগ্রাম পেলাম। প্রথম রেডিও প্রোগ্রামের টাকা পেয়ে জ্যেঠিমাকে একটা গরদের শাড়ী কিনে দিয়েছিলাম। তিনি তাতে কি খুশী! সকলকে ডেকে ডেকে দেখাতে লাগলেন, 'দেখ, আমার ছেলের কাণ্ড দেখ।'

খরচের ব্যাপারে আমি বরাবরই সাবধানী ছিলাম। নিজেকে প্রায় বঞ্চিত করেই পয়সা সঞ্চয় করতে চাইছিলাম আমি। সব সময় লক্ষ্য রাখতাম কোথায় এতটুকু সাশ্রয় হয়। মীর্জাপুরে আঠার টাকার ঘরে থাকতাম। সকালবেলা চা'য়ে ভিজিয়ে পাঁউরুটি খেতাম। সারাদিনে আর কিছু খেতাম না কয়েক কাপ চা ছাড়া। বিকেলে বেলা চারটে নাগাদ ধর্মতলার এক গলিতে বেঞ্চের ওপর বসে দু'বেলার খাওয়া সেরে নিতাম। চার আনায় চারখানা মোটা মোটা পরটা আর তার সংগে এমনিতে অনেকখানি ক'রে আলুর তরকারী দিত। তাই খেতাম আর পুরো দু'গ্লাস জল খেতাম। খেয়ে পাশের দোকান থেকে একপয়সায় একটি পান কিনতাম। কিমাম দিয়ে উড়িয়া দোকানীটি পান সাজত খুব ভাল। চিবোতে চিবোতে যখন চিত্তরঞ্জন এ্যাভিন্যু ধ'রে হেঁটে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে একটা ট্যুশনি করতে যেতাম তখন বিকেলের আলো পড়ে আসত। একটা নিভন্ত আগুনের মতো শহরের সারা দিনের কোলাহলটা নিস্তেজ হ'য়ে পড়ত।

আমি কথা রেখেছিলাম। ছাতনার জায়গা-জমি উদ্ধার করেছিলাম শেষপর্যন্ত। অবনী জ্যাঠা তখনো বেঁচে ছিলেন। চোখে ভাল দেখতে পেতেন না। শরীরের একটা দিক পড়ে গেছে। হাঁটা-চলা করতে পারেন না। আমায় চিনতে পেরে বললেন, 'এই ছাখ্ কি শাস্তি হয়েছে আমার! মরতেও পারছি না। যক্ষের মতো তোদের বিষয় পাহারা দিয়ে বসে রয়েছি। নিয়ে যা, নিয়ে যা—আমায় মুক্তি দে।'

জায়গা-জমি উদ্ধার করেছিলাম ঠিক কিন্তু আমি তা' নিজের জন্যে রাখি নি। সেটাকে কতখানি লাভজনক ক'রে আমার ভোগের বৃত্তকে সম্পূর্ণ করা যায় তার হিসেব কষতে বসি নি। আমি পরে সেটা দিয়ে দিয়েছিলাম। দান করেছিলাম। উনিশ-শ' একান্ন সালের আঠারই এপ্রিল ভূ-দানের পুরোহিত আচার্য বিনোবা ভাবে যখন দেশের লোককে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন যে, জমিহীন দরিদ্র কৃষকদের জন্যে তোমরা মুক্ত হস্তে জমি দান কর। কেননা যে-মাটি নিয়ে তোমরা আমার আমার করছ তা' তোমার একার নয়। আসলে তা' ভগবানের এবং সমষ্টির ও সম্প্রদায়ের।

আমি-কোন কিছু না-ভেবেই দিয়ে দিয়েছিলাম। তাঁকে অর্পণ করেছিলাম। দেবার পরে মনে হয়েছিল, বাবা সামনে নেই। থাকলে হয়ত তিনি খুশীই হতেন। আমার এই ব্যবস্থা অনুমোদন করতেন আনন্দের সংগে।

কিন্তু এই নিরবশেষ দান গৌরের এতটুকু পছন্দ হয় নি। বেশ কিছুদিন পরে ও জানতে পেরে বলেছিল, 'এসব বাজে, বাজে, অত্যন্ত বাজে জিনিস। ও ভূদান-টুদান কিছুই টিঁকবে না। অল সেল্ফ এক্জ্উম্‌ড ষ্টাণ্ট।'

আমি বলেছিলাম, 'দেখ, এই পৃথিবীতে কোন্‌টা বাজে আর কোন্‌টা কাজের তা' কি আমরা আলাদা ক'রে বাছতে পারছি? আমি দল, মত কিছুই বুঝি না। বুঝি মানুষের মংগল, মানুষের কল্যাণ যে-পথে নিহিত আছে সেটাই আসল পথ, সেটাই আসল মত। যে-পথ আর যে-পথিককে বাস্তব দেখা যায়, প্রাণের সংগে অনুভব করা যায়—শুধু বাক্যের ধোঁয়ায়,

তর্জনে-গর্জনে আর মেলা-মিছিলে শেষ হ'য়ে যায় না—আজ আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ সব বিশ্বাস খুইয়ে সেই পথ আর সেই পথিককেই আকুল হ'য়ে খুঁজছে। যিনি দলীয় শক্তি, ক্ষমতার লোভ এবং অত্যন্ত সাধারণ মর্ত্যীয় দুর্বলতাকে জয় ক'রে কেবল মানুষের মংগলের জন্যেই জীবন উৎসর্গ করেছেন—যিনি সত্যিকার মানুষ। আর, টেঁকা না-টেঁকার কথা বলছ? স্থায়ীভাবে কী টেঁকে পৃথিবীতে? কী টিঁকেছে? ভারতের বর্ণাশ্রম প্রথা? প্রজানুরঞ্জন অশোকের রাজত্ব? জুলিয়স সীজারের সার্বভৌমত্ব? গ্রীস মিসরের সভ্যতা? বাঙালীর চরিত্র? কোন্‌টা বল?'

গৌর সেদিন আর কিছু বলে নি, চুপ ক'রে গিয়েছিল। অনেক পরে, জ্যাঠামশাই মারা যাবারও কিছু পরে বলেছিল, 'শোভন তুই ঠিকই বলেছিলি। সত্যি, কোন্‌টা টেঁকে আর কোন্‌টা টেঁকে না, কি ভুল আর কি ঠিক এ বলা বড় শক্ত। আজ নিজেদের দিয়ে সব বুঝতে পারছি।'

পশুপতি বোস লেনের গোটা সংসারটার তখন ভীষণ অবস্থা। জ্যাঠামশাই মারা গেছেন। বাড়ী মর্টগেজ, দেনায় প্রায় সব ডুবে আছে। ভেতরে ভেতরে অবস্থা যে এমন পোকায়-কাটা জীর্ণতা পেয়েছিল কেউ তা' টের পায় নি। জ্যেঠিমাও নয়।

জ্যাঠামশাই তাঁর সময়কাল থেকে অনেক পিছিয়ে ছিলেন। তিনি নিজেকে কালের আবহাওয়ায় সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন্ নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন প্রায় সবাই বিবেক ভুলে, নীতি ভুলে, প্রচলিত সামাজিক অনুশাসন অগ্রাহ্য ক'রে শুধু অর্থ ও আরামের অন্বেষণে নিজেদের ভাগ্যের প্রাসাদকে সুরক্ষিত করতে-চেয়েছিল তখন জ্যাঠামশাই সেই স্ফীত প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারেন নি। রাতারাতি সৌভাগ্যের চূড়ো ছুঁয়ে জীবনের প্রচলিত ব্যবহারকে হঠাৎ বদলে ফেলতে মন সরে নি তাঁর।

তাই, যখন অন্যান্যরা নিজেদের বিচার বিবেচনাকে একটু আলগা ক'রে ফুলে-ফেঁপে অস্থির হয়েছে, জ্যাঠামশাই সনাতন বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধ'রে তখন থেকেই কুঁচকে-গুটিয়ে আসছেন। আর, ক্রন্দন

সেটা বাড়তে বাড়তে, কালের নতুন তালে পা ফেলতে না-পেরে আস্তে আস্তে নিজের দীনতা, জীর্ণতা জাহির করেছিল। ভেতরে ভেতরে ক্ষয়িত হয়েছিল প্রাণশক্তি।

কিন্তু কেউ তা' জানত না। জানত না, তার কারণ জ্যাঠামশাই ছিলেন স্থিতধী মানুষ। লম্ফ-ঝম্প ক'রে নিজের দুঃখ-কষ্ট সকলকে জানিয়ে সমবেদনা আদায়ের বিন্দুমাত্র চেষ্টা ছিল না তাঁর। সব দুঃখ-বেদনাকে অকম্পিতচিত্তে, নিজের ভেতরে বন্ধ ক'রে অবিচলিত থাকার শক্তি তিনি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। তাই মারা যাবার আগে পর্যন্ত কাউকে তিনি কিছু বুঝতে দেন নি। ওপরের কাঠামোটাকে ঠিক রেখেছিলেন।

কিন্তু তাতে একটা কুফল হয়েছিল। ছেলেরা কেউ দায়িত্ব নিতে শেখে নি। অবুঝের মতো, একটা ফাঁকা আভিজাত্যের হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিল।

বড় ছেলে তবু বাবাকে ব্যবসায় একটু-আধটু সাহায্য করত। কিন্তু গৌর মাঝপথে হঠাৎ লেখাপড়া থামিয়ে দিয়ে মহা হৈ-চৈ ক'রে রাজনীতি আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার যাবতীয় কাজ সংগ্রহ ক'রে তাতেই নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিল।

আমি মাঝে মাঝে তা'কে বোঝাতে চাইতাম। আমি নিজে লেখাপড়াকে কোনদিন অবহেলা করি নি। করবার সংগতিও ছিল না। পড়াশুনায় ভাল ছিলাম না বটে, তবু মোটামুটিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ একটা পেয়ে গিয়েছিলাম। এমনিতে আজকাল ওজিনিসটার কোন মূল্য নেই, তবু আমি জানতাম, ছাপ ছাড়া আজকাল আবার হয়ও না কিছু।

গৌরকে বললেই গৌর বলত, 'আরে বাবা, পড়াশুনার ও বাঁধাবাঁধি আমার ভাল লাগে না। কোন কিছু আবশ্যকীয়ভাবে আর নিয়ম ক'রে করতে হবে ভাবলেই আমার কিরকম অনীহা আসে! তাছাড়া, আমি হচ্ছি বুর্জোয়া বাড়ীর ছেলে। চাকরী ক'রে তো আর খেতে হবে না কোনদিন। সুতরাং ওই পড়াশুনা আর পাশ-ফেলে আমার কি এল-গেল? হ্যাঁ, যদি বল তাতে তোমার জ্ঞানলাভ হয়, তাহলে বলব, আমার

প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভের জন্যে যেটুকু পড়াশুনা করা দরকার তা' আমার খুশীমত করব। তার জন্যে নিয়ম ক'রে কলেজে যেতে হবে কেন, নিয়ম ক'রে পরীক্ষাই বা দিতে হবে কেন, আর সেই পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে অত মাথাব্যথাই বা হবে কেন। বল? তাছাড়া একটা কি জান, জীবনের আনন্দকে যত নিয়মের নিগড়ে বাঁধবে তত দেখবে জীবনটা শুক্‌নো মরুভূমি হ'য়ে উঠেছে। পৃথিবীর যাবতীয় ভার তোমার বুকে চেপে বসেছে। তুমি দম নিতে পারছ না। তার চেয়ে সব খুলে-মেলে দাও, বেঁধো না, বন্ধ করো না।'

আমি বলেছিলাম 'কিন্তু ওটা তো এসকেপিষ্টদের কথা। জীবনে আনন্দের প্রয়োজন আছে ঠিক। আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত হ'তে বলছি না। আনন্দং রূপামৃতং—আনন্দ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান, আশীর্বাদ। কিন্তু সেই আনন্দ অত সহজে মেলে না। নিয়মহীন, দায়িত্বহীন প্রচণ্ড কোলাহলের মাঝে জীবনের সেই আনন্দ লুকিয়ে নেই। তা'কে বহু মূল্যে অর্জন করতে হয়। 'ইন্ এ ডিফারেণ্ট ফর্ম, বীয়ণ্ড এনি মীনিং উই ক্যান অ্যাসাইন্ টু হ্যাপিনেস্।' সব আবশ্যকতা, সব দায়িত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েই তার মাঝখান থেকে আনন্দের পথ ক'রে নিতে হয়। কোন কিছু এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। হেরে গিয়ে রণে ভংগ দেওয়া যাবে না। জীবনে মুক্তির আনন্দ যদি পেতে চাও, আগে দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, বাঁধাবাঁধি ইত্যাদি সব প্রতিকূলতার সংগে মোকাবিলা কর, যোঝ। কেন, জাননা, 'দেয়ার ইজ্ মোর টু আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড, হোল্ড ফাস্ট টু ছাট, অ্যাজ দি ওয়ে টু ফ্রিডম।'

গৌর শোনে নি। আমার এসব গুরুভার কথাকে সযত্নে পরিহার করেছে। ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্য ক'রে বলেছে, 'অত ভেবে-চিন্তে, হিসেব কষে হবেটা কী? জীবনকে যদি সহজে নিজের নাগালে না-পেলাম তাহলে মনুষ্যজন্মে কী লাভ! আসলে ভেতরে ভীষণ জ্বালা, ভীষণ জ্বালা—কিছু আর ভাল লাগছে না।'

'কিন্তু তুমি কী এমন ক'রে বলতে পার? এত সহজে? তোমার আনন্দের ধারণা, জীবনের ধারণা কী এত সস্তা হ'তে পারে?'

'কেন ?'

'তুমি না রাজনীতি কর? তোমার না জীবন সম্পর্কে এক বিশেষ মত আছে? তুমি কী অত সাধারণ ধারণার অনায়াসলভ্য পরিণতিতে বিশ্বাসী হতে পার?'

'কিন্তু আমি তো' সর্বাগ্রে মানুষ। আমার সাধ-আহ্লাদ, ইচ্ছে-অনিচ্ছেগুলো স্বাভাবিক ধারণায় ঘুরবে, ফিরবে এতে আর আশ্চর্য কী?'

আমি বললাম, 'কিন্তু অন্য কেউ যদি এমন ক'রে বলত, তোমরা, রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকরা তক্ষুণি লাফিয়ে উঠে তা'কে রিঅ্যাকশনারী ব'লে গালাগাল দিতে। ব্যাপার কি জান, মতবাদের ধ্বজা উড়িয়ে রাজনীতির সার্কাসে যারা কসরৎ আর ভেল্‌কী দেখিয়ে চমক লাগায় তা'রা যা' বলে, তা' তা'রা নিজেরা বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করলেও নিজেদের জীবনে অভ্যাস করে না। তা'রা সুযোগের জন্যে ঠিক ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকে। নিজের সুখের জন্যে, নিজের ক্ষমতার জন্যে ষোল আনার হিসেবে একটি পয়সারও গোলমাল করে না। অথচ এরাই যখন পরকে পরামর্শ দেয়, জনসাধারণকে বন্ধুর বেশে 'আলো' দিতে যায়, তখন অন্য সুরে অন্য কথা বলে। তোমার কথাই ধর না কেন! এই যে তুমি এখন 'বেসরকারী'ভাবে জীবন সম্বন্ধে, তোমার সুখ, আনন্দ, ইচ্ছে, অনিচ্ছে সম্বন্ধে ধারণা দিলে, এই যে মুখে বলছ তুমি বুর্জোয়া নও, অথচ মনটিকে ক'রে রেখেছ পাকা বুর্জোয়া—এরকমই তো' বেশীর ভাগ লোক! তারাই তো' রাজনীতি আর সমাজ-জীবনের আসর জুড়ে বসে আছে! তাদেরই হুক্কাহুয়ার ঠেলায় দেশের প্রাণ আজ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। আমি বলি কি গৌর, ওসব ছাড়! ছেড়ে সংসারের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাও। দল ছেড়ে, ঘন ঘন মতের অদল-বদল ছেড়ে, নিজের হৃদয়-দলকে প্রস্ফুটিত করবার চেষ্টা কর। আগে নিজেকে দিয়ে আরম্ভ কর, নিজেকে যথাসম্ভব নির্ভুল শক্তিতে তৈরী কর। এক থেকে অনেকের অন্বেষণে বেরোও। আগে একক পরে দশক। আর, তাতেই দেখবে জীবনের আনন্দকে তুমি আয়ত্ত করতে পেরেছ। সে আনন্দ হাটে-মাঠে-সভায়

মেলে না। সে আনন্দের মৃত্যু নেই। কি আমার কথাগুলো খুব 'ভার্বোজ্‌' মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে শুধুই ভাবাবেগের চাপল্য?'

গৌর মুখ নিচু ক'রে ঘাড় নাড়ল। এমনভাবে নাড়ল যার অর্থ হ্যাঁ-ও হয়, না-ও হয়।

কিন্তু তবু আমি গৌরকে ফেরাতে পারি নি। সে যত বেগে ছুটে চলছিল তত বেগেই চলল; অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না-করে। সংসারের প্রতি এবং নিজের প্রতি নিশ্চিন্ত দায়িত্বহীনতার সংগে। জ্যাঠামশাই এবং জ্যেঠিমা মাঝে মাঝে বলতে চাইতেন, তা'র ভবিষ্যতের ভাবনায় উদ্‌বিগ্ন হতেন কিন্তু সেসব কথা গৌর গায়েই মাখত না যেন। সব কথাই পিছ্‌লে পিছ্‌লে পড়ে যেত।

জ্যাঠামশাই যেদিন হঠাৎ হার্টফেল ক'রে মারা গেলেন, গৌর বোধহয় সেদিনই প্রথম বিচলিত হয়েছিল। আমি সেই প্রথম ওর চোখে একটা অসহায় ছায়াকে পদচারণা করতে দেখেছিলাম।

এতবড় একটা সংসারের মাথা থেকে জ্যাঠামশাই এমন নিঃশব্দে এবং অকস্মাৎ সরে যাবেন, একথা কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। দিব্যি সুস্থ, সবল মানুষ, প্রতিদিনকার অবশ্যকর্তব্যগুলিকে যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। ভোর চারটেয় উঠে গংগাস্নানে গিয়েছিলেন। মাথায় রক্তচন্দনের ফোঁটা কেটেছিলেন। নিত্যকার দেবপূজায় বসেছিলেন। তাঁর বসবার ঘরের ঘড়িতে দম দিয়েছিলেন, ডেট-ক্যালেণ্ডারের পাতা কেটেছিলেন। খবরের কাগজ পড়েছিলেন। তারপর বারোটার পর আহারাদি সেরে রাধাবাজার ষ্ট্রীটে বেরিয়েছিলেন। সেইখানেই তাঁদের হার্ডওয়্যারের সাবেকী ব্যবসা ছিল। গাড়ীতেই গিয়েছিলেন তিনি। থার্টি-টু মডেলের পুরনো একখানা ফোর্ড ছিল। তিনি এবং মাঝে মাঝে জেঠিমা ছাড়া সে-গাড়ীতে কেউ চড়ত না বড় একটা। শুধু সরস্বতী যখন ছোট ছিল তখন তা'কে গাড়ীতে ক'রে ইস্কুলে পৌঁছে দেওয়া আর নিয়ে আসা হতো।

সেই গাড়ীতে গিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন আর এসেছিলেন। সনাতন ড্রাইভার বহুদিনের পুরনো। যতদিনের গাড়ী ততদিনের চাকরী

তা'র। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি। বহুদিন পর পর তার সংস্কার হতো। গঞ্জিকা সেবন করত সনাতন। তা'র লালচে চোখে কখনো কোন ভাষা বসতে পেত না। নাকের ওপরে, কপালের অমসৃণ, বয়সের ভারবাহী চামড়াটা সব সময়েই একটু বিরক্তির ভাবে কুঁচকে থাকত। বাঁ-হাতের তালু এবং আঙুলে গঞ্জিকা-মাহাত্ম্যের স্পষ্ট ছাপ, যেন খড়ি উঠে গেছে হাতের।

সেই সনাতন রোজকার মতো জ্যাঠামশাইকে নিয়ে পশুপতি বোস লেনের বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল বেলা বারোটার পর। ঠিক ফটকটার সামনে এবং রাস্তায় পড়বার আগে অভ্যাসবশত দু'বার হর্ণ বাজিয়েছিল, "উ-উয়ো, উ-উয়ো' ক'রে। এমন কর্কশ এবং প্রাচীন সুরের হর্ণ আজকাল আর শোনা যায় না। পাশের কালীতারা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ছোকরাটা রাস্তায় বালতি পেতে তখন চান করছিল (রোজই এইসময় করে)। সে বুঝেছিল বারোটা বেজে গেছে। কোণের দত্তদের বাড়ীর বেকার ছেলে ঘণ্টে খাওয়া-দাওয়া সেরে স্যাণ্ডো গেঞ্জী আর লুংগি প'রে একটি সিগারেট ধরিয়ে কালীতারা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের চাতালে ব'সে (রোজই এইসময় বসে) স্নানরত ছোকরাটার ভিজে গামছার ফাঁক দিয়ে তা'র নিম্নাঙ্গ লক্ষ্য করছিল (আমি অনেকদিন দেখেছি তাকে) নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে! জ্যাঠামশাইয়ের গাড়ী বেরোতেই সেও বুঝেছিল বারোটা বেজে গেছে।

কিন্তু আধ ঘণ্টা পরে সেই গাড়ী যখন আবার উল্টোদিক থেকে ফিরে এসে ফটকে ঢুকল কোন সাড়াশব্দ না-ক'রে এবং তারপর বাড়ীর ভেতর অল্প একটু ব্যস্ততা, অল্প একটু ছুটোছুটি, কিছু হাঁকডাক এবং শেষে জেঠিমা ও সরস্বতীর আর্তকান্না আর অন্যান্য লোকদের সশংক কলরব উঠল তখন সবাই ছুটে এসেছিল বাড়ীর ভেতরে; ভীড় করেছিল। কালীতারা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ছোকরাটি, দত্তদের বাড়ীর ঘণ্টে, রামখেলোন গোয়ালা, পানওয়ালা, মুদী—কেউ বাদ ছিল না।

আমি দেখি নি। কিন্তু শুনেছিলাম জ্যাঠামশাই পেছনের আসনে যেমনভাবে হেলান দিয়ে বসে গিয়েছিলেন, তেমনিভাবেই ফিরে

এসেছেন। অফিস পর্যন্ত পৌঁছন নি। শুধু চোখ দু'টো তাঁর বন্ধ। যেন হঠাৎ ভীষণ ঘুম পেয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘাড়টা ঈষৎ কাত্ হ'য়ে গেছে। গলাবন্ধ সার্ট কাপড়ের নিচে গুঁজে তার ওপর কোট প'রে গিয়েছিলেন তিনি। সনাতন কোটটা গা থেকে খুলে নিয়েছিল, আর জামার গলার বোতামটা দিয়েছিল আল্‌গা ক'রে। মুখে তাঁর কোথাও এতটুকু যন্ত্রণার চিহ্ন ছিল না।

জ্যাঠামশাই মারা যাবার পর ফাঁক এবং ফোকরগুলো এক এক ক'রে প্রকট হ'তে লাগল। তারা একসংগে হুড়মুড় করেই এসে পড়ল যেন। ভাল ক'রে শ্রাদ্ধ করবার মতোও অবস্থা ছিল না। পাত্রের জল ফুরোতে ফুরোতে একেবারে তলায় এসে ঠেকেছিল।

জ্যেঠিমা ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। তা'রা কোন কথা না-ব'লে মুখ নিচু করেছিল। তিনিও আর একটি কথা বলেন নি। তাঁর চেহারা থেকে সেই সদা হাসি-খুশী ভাবটি অন্তর্হিত হয়েছিল তখন। নিরাভরণ দেহ যেন সদা থানের অনন্ত এক বিষাদ দিয়ে লেপা।

আশ্চর্য মনের জোর দেখেছিলাম তাঁর। জ্যাঠামশাই বেঁচে থাকতে তাঁকে এরূপে কখনো দেখি নি। তখন মনে হতো স্নেহে-ধর্মে-উদারতায় তিনি শুধুই কোমল-স্বভাবা এক নারী। সংসারের দুরন্ত ঝড়ে যিনি নমিত এবং দমিত হ'য়ে পড়বেন। কিন্তু পরে বুঝলাম, জ্যাঠামশাইয়ের ব্যক্তিত্বের আড়ালে তাঁর চরিত্রের অনেকখানিই ঢাকা পড়েছিল। নইলে বিপদের কালে অমন শক্ত হাতে সংসারের হাল তিনি ধরতে পারতেন না।

বাড়ীর দামী দামী আসবাবপত্র এক এক ক'রে পাওনাদারদের হাতে তুলে দিয়ে দেনা মিটোলেন জ্যেঠিমা! এইসব দেখে গৌর তিনদিন বাড়ীই ফিরল না। গৌরের বড়দা একটু ভালমানুষগোছের এবং দুর্বল চিত্তের মানুষ। সে চারিদিকে অর্থের আশায় ব্যাকুল হ'য়ে ছুটোছুটি ক'রে ব্যর্থ হ'য়ে বাড়ীতে মা'র ওই শক্ত চেহারা দেখে দিশেহারা হ'য়ে একসময় ছোটছেলের মতো কেঁদে ফেলল।

আমি সংসারে যথাসম্ভব সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। বলেছিলাম,

'জ্যেঠিমা, এতদিন তো' খুব ছেলে ছেলে করেছেন এবার ছেলের একটা কাজ করতে দেবেন আমায়?'

জ্যেঠিমা শান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হেসে বলেছিলেন, 'আমি জানি তুমি কি বলবে! শুধু ছেলে থাকলেই যে হয়না, তা' তো' দেখতেই পাচ্ছি। ছেলের মতো ছেলে থাকা চাই। না বাবা, তুমি যে বলেছ এই ঢের। আমার নিজের সামান্য কিছু আছে, তাছাড়া গয়নাগুলো রয়েছে কি করতে! ও আপদে আমার তো' আর কোন প্রয়োজন নেই। শুধু মেয়েটার জন্যে কয়েকখানা রাখব। এখন কোনরকমে চালিয়ে দিতে পারব তারপর তুমি তো রইলেই!'

আমাকে এমনি ক'রে বারবারই ফিরিয়ে দিয়েছেন জ্যেঠিমা। পরে যখন আমার অবস্থার উন্নতি হয়েছে, আর্থিক সচ্ছলতা বেড়েছে তখনও তিনি আমার সাহায্যের প্রস্তাব সস্নেহে এবং বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করতে চাইতেন। অসম্ভব আত্মমর্যাদা জ্ঞান ছিল তাঁর।

কিন্তু যেদিন সত্যি সত্যি গয়নার বাক্সে হাত পড়ল, সেদিন আমার পক্ষে আর চুপ ক'রে বসে থাকা সম্ভব হয়নি।

গৌর খুব সকালে আমার মীর্জাপুরের বাসায় গিয়েছিল। সে-ই বলল আমাকে। আমি তখন কাগজ-পত্র নিয়ে নানাবিধ হিসেবে বসেছি। আমার ট্রুপ তৈরি হবে তারই তোড়জোড় চলেছিল তখন। আমি খুব ব্যস্ত। নিজের যা' কিছু স্বল্প সঞ্চয়, সব ঢেলেছি এই পরিকল্পনায়। একটু চালু হ'লে, স্থির আছে, এক পয়সাওয়ালা বন্ধু ব্যাপারটিতে আগ্রহী হবে। গৌর গিয়ে বলল, 'শোভন, মা আজ সকালে সরকারবাবুকে তাঁর গলার হারছড়া দিয়েছেন বিক্রী করতে আমি দেখলাম।'

সংসারের সব পুরনো লোকজন চ'লে গিয়ে ওই বৃদ্ধ সরকারবাবুটি রয়ে গিয়েছিলেন। জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁকে যাবার কথা বলা হতেই তিনি প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, 'কেন আমি কি এতই ভারী ঠেকছি আপনাদের কাছে যে, আজ চল্লিশ বছর পরে আপনারা আমায় তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন?' জ্যোঠিমা আর কোন

কথা বলতে সাহস করেন নি। শ্বশুরের আমল থেকে আছেন তিনি। জ্যেঠিমা যখন এবাড়ীতে প্রথম বউ হ'য়ে আসেন তারও আগে থেকে।

আমি-তক্তপোষে বসে ছিলাম। গৌরের কথা শুনে কাগজ-পত্র সব গুটিয়ে রেখে, তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে জুতোটা পা'য়ে গলিয়ে বললাম, 'চল্ তো' আমার সংগে!'

রাস্তায় নেমে কয়েকমিনিট আমরা কথা বলতে পারি নি। তারপর আমি হঠাৎ বললাম, 'এরকমভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকিস নে গৌর, একটা কিছু কর।'

কথাটা বলেছিলাম একটু রূঢ় স্বরে। আমার গলায় রুদ্ধ অনুযোগটা স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল। বলেই লজ্জিত হয়েছিলাম। বুঝেছিলাম কথাটা ওভাবে বলা ঠিক হয়নি। গৌর অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। বাইরে হৈ-চৈ ক'রে বেড়ালে কি হবে! খুব ছোট আঘাতও তা'কে ভীষণভাবে লাগে।

গৌর প্রথমে থতমত হ'য়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর খুব আস্তে আস্তে একটা ক্লান্ত বিষণ্ণতাকে ওর গলায় টেনে টেনে বলল, 'কী করব বল্? কোন রাস্তাই পাচ্ছিনা যে! কোনদিন ভাবিনি তো' এসব কথা। আজ হঠাৎ নতুন ক'রে ভাবতে গিয়ে দিশেহারা হচ্ছি।'

একটু চুপ করল গৌর। ওর এই দুঃখের ভারটুকু আমার মনকেও জড়িয়ে ফেলেছিল যেন। আমিও ওর অসহায়তায় অস্বস্তিবোধ করছিলাম। একটু থেমে গৌর আবার বলল, 'তুই ঠিকই বলতিস্। তখন যদি শুনতাম তোর কথা। আসলে কি জানিস, বাবা যদি আমাদের যথার্থ অবস্থাটা বোঝবার সুযোগ দিতেন কোনদিন, তাহলে হয়ত আমরাও এমন ফাঁকায় ফাঁকায় গা-ভাসিয়ে বেড়াতাম না। কোথাও না কোথাও জুতে যেতাম। আজ এই অবিশ্বাস্য অবস্থাটার ঘোর কাটাতেই ভীষণ বেগ পাচ্ছি। ভাবতেই পারছি না, আমি যে-বাড়ীর ছেলে, তা'কে আজ দু'বেলা দু'মুঠো অন্নসংস্থানের জন্যে কিসের কিসের উমেদারী করে বেড়াতে হবে!'

আমি বললাম, 'আজকের দিনে সেটা কিছু অসম্মানের নয়। তাছাড়া

তুমি তো' রাজনীতি করেছ। এসব পুরনো ধারণা থেকে এতদিনে তোমার মুক্ত হওয়া উচিত ছিল।'

'হ্যাঁ, অবস্থা দুর্বিপাকে প'ড়ে জীবনসংগ্রামের অনেক কথা বলেছি, পড়েছি, শুনেছি কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই, নিজেকে এমন অসহায় অবস্থায় কোনদিন কল্পনা করি নি। অধিকাংশ মানুষই বোধহয় তাই। নিজেকে সবসময় নিরাপদে রেখে স্বস্তি পেতে চায়। অথচ, যাবতীয় থিয়োরী রিজ্‌ন, ইজ্‌ম-এর সহযোগিতায় জীবনের সারাৎসারকে অক্লেশে অন্যের ওপর প্রয়োগ করে। যেই নিজের আঁতে ঘা লাগল অমনি তা'রা যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে ওঠে। আমার অবস্থাও হয়েছে ঠিক তাই। আমি জানি, কারো বাবা মারা গেলে কিংবা হঠাৎ সংসারে বিপর্যয় ঘটলে দৃঢ়চিত্তে সংগ্রামে ঝাঁপ দেওয়াই উচিত। উচিত মান-সম্মানের ঠুন্‌কো বোধটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যে-কোন জীবিকায় নিজেকে নিয়োজিত করা। কিন্তু শোভন, এত উচিত তো' শুধু বইয়ের পাতায় লেখা থাকে, পলিসির ডাইরেকটিভস্‌-এ পাওয়া যায়—জীবনের সংগে, মানুষের সংগে তার কতটুকু সম্বন্ধ? কতটুকু মিল?'

আমি চুপ ক'রে থেকেছিলাম। গৌরকে কোন উত্তর দিই নি। আমার মনে হয়েছিল বলি, গৌর, এখনকার পৃথিবীতে এরই নাম জীবন। আমরা, সাধারণ মানুষরা এখন এমন এক যুগে বাস করছি যখন যন্ত্রণাকে, বেদনাকে অংগের বাস বলে ভাবতে হচ্ছে। প্রতিনিয়ত তার ক্লেশকর স্বাদ পেতে পেতে আমরা এগোচ্ছি মৃত্যুর দিকে। যেমন ক'রে আগেকার দিনে বিরাট বন্দীদলকে লোহার শেকলে বেঁধে, অনেক পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি পার ক'রে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া হতো, তেমনি ক'রে আমাদেরও নিয়ে যাওয়া হয় আজকাল। সেই হাত-পা বাঁধা, অশেষ যন্ত্রণা-পাওয়া বিরাট বন্দীদলটি হচ্ছি আমরা, একালের সাধারণ মানুষরা। আর সেই দুর্গম-দুস্তর যাত্রাটুকুই জীবন, একালের জীবন। তাছাড়া, তুমি কি দেখনি আজ পৃথিবীতে কি প্রচণ্ড কলরব, কতরকমের শব্দের সমাবেশ! দেশে দেশে রাজনীতির আসরে, সভা-সমিতি-অনুষ্ঠানে জগতের মংগলামংগলের ভাবনায় কত ন্যায়, নীতি, তর্কের ছড়াছড়ি! কিন্তু

তবু তাতে মানুষের কোন উপকারই হলো না, আমরা আজও অস্বস্তি আর অনিশ্চিয়তায় ভুগতেই রইলাম। এ যেন রাত হ'লে বাড়ীর বাইরে অসংখ্য আলোর মালা সাজিয়ে ভেতর বাড়ীটাকে অন্ধকারের আশংকায় রাখা। যেন ভেতরের মানুষগুলো পথ হাতড়ে, দিশা না-পেয়ে অন্ধকারে ঠোকাঠুকি লেগে মরতেই থাকল অথচ বাইরের উদ্ভাসিত আলোকে অন্দর সম্পর্কে কিছু আলোচনায় নিশ্চিন্ত হওয়া চলল। আমার মনে হয়, জগতের সেই সব বড় বড় কল্যাণকর ভাবনায় মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা আজ নিষ্পেষিত হচ্ছে। সকলেই আজ সমষ্টির চিন্তায় ব্যস্ত রয়েছেন ব'লে প্রাতিস্বিক মানুষ তারই চাপে দম নিতে পারছে না, আস্তে আস্তে তাদের অস্তিত্ব সংকুচিত হ'য়ে আসছে। আমার নিজের ঘরে আগুন লাগলে আমি যেমন কোন উৎসাহেই পরের ঘরের আগুন নেভাতে যেতে পারি না তেমনি আমার নিজের সুখ-শান্তি-বসবাস বিপদগ্রস্ত হ'লে আমি কোন্ শক্তিতে সমষ্টিগতভাবে জাগতিক সুখ, আনন্দ, শান্তিপূর্ণ সহবাসের কথা ভেবে ঈদৃশ ভাবনার পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেকে কর্মঠ করতে পারি? আগে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, তবে সমষ্টির প্রশ্ন। ব্যক্তিকে নিয়েই সমষ্টি। আর এই ব্যক্তিগত দুর্বলতার জন্যেই ঈপ্সিত ফলটি দূরে দূরেই থাকছে, হাতের নাগালে পাওয়া যাচ্ছে না। স্বস্তি এবং শান্তি তাই এত দুর্মূল্য হ'য়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের কাছে। অথচ তুমি দেখ গৌর, এদের শান্তি শান্তি ক'রে গর্জন করা দেখে মাঝে মাঝে মনে হয়, সুখ-শান্তি-সংহতি যেন কোন পাঠ্য পুস্তকের সবচেয়ে কঠিন একটা অধ্যায়। সেটাকে আয়ত্ত করার জন্যেই প্রাণপণ চেষ্টা চলেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, এরা জানেনা যে, ও জিনিসগুলো এমনই পিচ্ছিল পদার্থ যা শুধু 'কর কর, ধর ধর' বললেই আয়ত্ত করা যায় না। ভেতরে ভেতরে একক প্রচেষ্টায় অর্জন করতে হয়। প্রত্যেক মানুষকে সুযোগ দিতে হয় তার। আর তা' হয়না ব'লেই কাগজে, কলমে, কেতাবে এবং রাষ্ট্রসংঘের বক্তৃতাসভায় আমাদের ভাগ্য থেমে থাকছে, ভারী পাথরটাকে কোনমতেই আর নড়ানো যাচ্ছেনা। তাই আমরা একালেও হাত-বাঁধা বন্দীদের মতো যন্ত্রণার কঠিন পথ বেয়ে চলেছি। আমাদের

কোন ইচ্ছেতেই আমাদের হাত থাকছে না। পরের দয়ায় সঁপে দেওয়া আমরা এখন স্বাধীন দেশের পরাধীন চিত্তের মানুষ।

কিন্তু এসব কথা আমি গৌরকে বললাম না। এ আমার একান্ত ব্যক্তিগত ধারণা এবং হয়ত হাস্যকর ধারণাও। তাই গৌরকে কিছুই বলিনি। আমি চুপ ক'রেই ছিলাম। অনেকটা হেঁটে আমার কপালে ঘাম জমেছিল। পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে কপালটা মুছে ফেললাম। কারপর একটা চলন্ত ট্র্যামগাড়ীর পাদানি লক্ষ্য ক'রে লাফিয়ে পড়লাম। গৌরকে বললাম, 'আয়।'

পশুপতি বোস লেনের বাড়ীতে আমার আর ঢুকতে ইচ্ছে করত না। অত বড় বাড়ীতে লোক-জন নেই। সবসময় যেন খাঁ-খাঁ করে। বাইরে থেকেই মনে হয় যেন এক অতলস্পর্শী, ভয়ংকর শূন্যতার গর্ভে বাড়ীটা আস্তে আস্তে তলিয়ে যাচ্ছে। খুব খারাপ লাগত।

হয়ত এ-ও থাকবে না। কিছুদিনের মধ্যেই বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে। পৈতৃক ব্যবসাটাও হয়ত হাতছাড়া হবে। সব কিছু অন্যের হাতে তুলে দিয়ে ঋণমুক্ত হ'তে হবে।

গৌরের বড়দা চারিদিককার অপ্রত্যাশিত, অতর্কিত ঝক্কির সামাল দিতে দিতে জেরবার হ'য়ে পড়েছিল। শুকিয়ে আধখানা হ'য়ে গিয়েছিল শরীর। বারকয়েক তা'র বিয়ের ঠিক হয়েও নানা কারণে বাধা পড়েছিল। এই সর্বশেষ ও সর্বশক্তিশালী বাধাটির পর সে স্পষ্ট বলে দিয়েছিল আর বিয়ে করবে না। শুনে জ্যেঠিমা দুঃখিত হয়েছিলেন। কিন্তু কোন মীমাংসা করতে পারেন নি। তাঁর কিছু করবার ছিলও না।

আমি সোজা জ্যেঠিমার ঘরে ঢুকে বললাম, 'জ্যেঠিমা, আর তো শুধু চুপ ক'রে দেখা যায় না। এসময় হয় আমাকে আমার উপযুক্ত কাজ করতে দিন, নয়ত' বলুন আমি আ'র এবাড়ীর ছায়াও মাড়াব না। আপনারা হেজে যান, মজে যান একটা কথাও বলতে আসব না।

খানিকটা অভিভূত হ'য়ে বলেছিলাম। মুখটা তাই ঘুরিয়ে নিলাম।

'কেন বাবা, কি হয়েছে?'

'আপনি আজ হার বিক্রী করতে দিয়েছেন সরকার মশাইকে?'

'কে বললে! ও, গৌর বুঝি।' ব'লেই তিনি গৌরের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন। সে দৃষ্টির সামনে গৌর সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারল না। মাথা নিচু করল।

'হ্যাঁ দিয়েছি, উপায় ছিল না বলেই দিয়েছি বাবা'।

'সেইটাই কি সবচেয়ে সহজ উপায় মনে হলো, জ্যেঠিমা? কেন, আমি কি ছিলাম না? না, আজ আমাকে আত্মজন ব'লে ভাবতে বাধছে?'

'না বাবা, তা নয়। তুমি ছেলেমানুষ। তাছাড়া তোমার রোজগার এমন প্রচুর নয়, যা'তে তুমি এত বড় সংসারটার চারদিককার নানা ফাটল বোজাতে পার। তাই আর কি—'

'তাই সোনাদানা বিক্রী ক'রে সংসারের খাঁই মেটাতে হবে অথচ যা'কে ছেলে ব'লে ভাবেন তা'কে কিছু বলা যাবে না? এসব দেখে শুনে আপনি কি মনে করেন ওখানে আমি খুব সুখে থাকব, আমার গলা দিয়ে ভাত নাববে?'

'আচ্ছা বাবা, আচ্ছা, তুমি যাতে সন্তুষ্ট হও তাই কব। আমি আর বাধা দেব না।'

বলেই তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। এক মুহূর্ত দাঁড়ান নি।

আমি গৌরের দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হাসলাম, বললাম, 'কী, কেমন বুঝলে? কেমন হলো?'

গৌর আমার কথা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। আমি বললাম, 'কোন্ জায়গায় কি বললে, কি কি ফল দেয় দেখলি তো! আরে বাবা, এঁরা হচ্ছেন মায়ের জাত। ও মুখে যতই হম্বি-তম্বি করুন না কেন ছেলের কষ্টের কথায় বুক ফাটবার জন্যে ওঁরা তৈরী হয়েই আছেন। যেই বললাম, তাহলে আমার গলা দিয়ে ভাত নাববে না অমনি ওঁর ওজর-আপত্তি কোথায় ভেসে গেল!'

আমি বড় ক'রে হাসলাম। শব্দ ক'রে।

গৌর তা' দেখে ভাঁজ ফেলল কপালে। লম্বা ক'রে।

আমি হাসি থামালাম।

গৌর বলল, 'আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে হাসতে পারছি না ব'লে দুঃখিত'।

'কেন?' আমি অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম!

'কেননা, তাতে আমার লজ্জা। তুমি মা'র ওপর জিতে গেছ ব'লে হাসছ আর ঠিক সেইজন্যেই, আমি হেরে গেছি বলেই হাসতে পারছি না। নিজের অকর্মণ্যতাটা বড় বেশী ধরা প'ড়ে গেল নিজের কাছে। সত্যি, অবিলম্বে আমার একটা কিছু করা দরকার। কোথাও না কোথাও অ্যাডাজাস্ট ক'রে নেওয়া প্রয়োজন নিজেকে। নইলে বড় লজ্জা, বড় লজ্জা—।'

বলতে বলতে দ্রুত ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো গৌর। আমি কিছুই বলতে পারলাম না। হতভম্ব হ'য়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু শেষ অবধি জ্যেঠিমা আমার সাহায্য নেন নি। অত্যন্ত কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

ব্যবসাটাকে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করা যায় নি; বাড়ীটাকেও না। এক মাড়োয়ারীর হাতে তুলে দিতে হয়েছিল ব্যবসাটাকে। সে-ই কিনে নিল নামমাত্র দামে। তবে লোকটি কিছু বদান্যতা দেখিয়েছিল। কথা হলো, গৌরের বড়দা ওখানেই সব কিছু দেখা-শোনা করার একটা মাস মাইনের চাকরী করবে। নতুন মালিক এটুকু উদারতা দেখিয়েছিলেন। আর, বাড়ীটা যাঁর কাছে আশী হাজার টাকায় মর্টগেজ ছিল, তাঁকেই ছেড়ে দিতে হলো। ভদ্রলোক বাঙালী, তবু কোনরকমেই এত বড় দাঁও মারবার সুযোগ হারাতে রাজী হলেন না!

আমি কিছু সময় চেয়েছিলাম। অনেক ক'রে বুঝিয়ে বলেছিলাম অবস্থাটা। তাঁর বিবেকের দোহাই দিয়েছিলাম। অনেক অনুরোধ উপরোধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি সেসব সৎ-প্রবৃত্তির ধারও ধারেন না দেখলাম। তাছাড়া দয়া-দাক্ষিণ্য ইত্যাদি মানবিক দুর্বলতা যে কেবলমাত্র মূঢ়তারই নামান্তর, এইকথাই তিনি বিশ্বাস করেন ব'লে মনে হলো। তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন, বাঙালী জাতির প্রতি সহানুভূতিতে আখের নষ্ট করার মতো বিলাসিতা তিনি করতে

পারেন না। বললেন, 'না, মশয় না। ওসব সময়টময় আর হবেনা। আমি কিছু দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর নই। আর সে-ভদ্রলোকও অত্যন্ত আহাম্মক ছিলেন। জানেন তো, শেষ জীবনে তাঁকেও অর্থকষ্টে পড়তে হয়েছিল! আমি মশয় সাফ কথার মানুষ। ওসব আহাম্মুকী দয়া-দানে আমি নেই।'

বাড়ীর ব্যাপারে আমি কি খবর আনি সেজন্যে সকলে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করছিল। আমি যখন মুখ চুণ ক'রে গিয়ে জ্যেঠিমাকে বললাম, 'না জ্যেঠিমা কিছু করা গেলনা, লোকটা বেজায় পাজী' তখন সরস্বতী হঠাৎ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। গৌর রাস্তার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল চুপ ক'রে। গৌরের বড়দা একবার মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। আর জ্যেঠিমা একটিও কথা বললেন না, বাজপড়া গাছের মতো বসে রইলেন।

দেড় মাসের মাথায় বাড়ী ছেড়ে দিতে হলো ওঁদের। ভবানী দত্ত লেনে আমি একটা বাসা ঠিক ক'রে দিয়েছিলাম। সেখানেই ওঁরা উঠে এলেন। আসবার দিন সে কি করুণ ও মর্মান্তিক দৃশ্যের অবতারণা হলো! সরস্বতী কেঁদে কেঁদে চোখ রাঙা ক'রে ফেলল। গৃহত্যাগের দুঃখ তাকে ভীষণভাবে অভিভূত করেছিল। সমস্ত বাড়ীটাকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। যেন এই প্রথম পরিবেশটার সংগে তা'র পরিচয় হচ্ছে।

বাড়ীর তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসেও তা'র দৃষ্টি পড়ল, যত্নের অভাব দেখা গেল না। গাছে গাছে হাত বুলিয়ে বেড়াল। ঢুকতেই যে ফোয়ারাটা তার কাছে এসে দাঁড়াল একবার। দাঁড়িয়ে পরীর মূর্তিটার দিকে অপলক তাকিয়ে তাকিয়ে চোখের জল ফেলল। একবার ছুটে গেল বাড়ীর পেছনদিকটায়, প্রায়-নিশ্চিহ্ন-হয়ে-যাওয়া লিলি পণ্ডটার কাছে। চুপ ক'রে গিয়ে বসল সেখানে। গৃহত্যাগের আঘাত জ্যেঠিমাকেও লেগেছিল। কিন্তু তিনি হৈ-চৈ, কান্নাকাটি করেন নি। চুপ ক'রে ছিলেন। অস্বাভাবিক ভাবেই নীরব ছিলেন। নতুন

বাড়ীতে এ

কিছুতেই ক

ক'রে বে'

একটা

বলল'

কেন

নিন

কো৲

নিজে

ছুনিয়া

আমি

হলেন।

গম্ভীর গলায়

মহাপুরুষ নই।

না হ'য়ে পারিনা।

ওই আছাড়ি-পিছাড়ি

নেই। আমরা বলতে পারি না.

কারণ আমরা পণ্ডিত নই।

হ'য়ে ঢুকেছিলাম ওবাড়ীতে, জীবনের ছত্রি-

আজ হঠাৎ ভুলতে বললেই সব ভুলি কী ক'রে।

ঘরে ঘরে দেওয়ালে-দেওয়ালে, প্রতিটি ধূলোর কণায় আ

জ্যাঠামশাই বেঁচে রয়েছেন। তার কী হবে?'

ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলে চেআরের হাতলে মাথা গুঁজলেন জ্যেঠিমা। আমি আস্তে আস্তে তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম।

সন্ধ্যা গড়ালো, রাত্তির হলো তবু জ্যেঠিমা ঠায় একভাবে বসে রইলেন, আস্তে আস্তে শহরের কোলাহল মিলিয়ে এল। আর, ট্র্যাম-বাসের শব্দ শোনা যায় না। শুধু রাত্তিরের অখণ্ড নিস্তব্ধতা

থামের দিকে

য়েছিলেন।

র সংজ্ঞা

আমরা,

তুলে

ংকিত

সব

পরিষ্কার

হন' তখন

যোগী হতে

মে খুব দরিদ্রভাবে

দমলাম না। নিজের

থেকেও জোগাড় ক'রে

ষ্টার ত্রুটি করতে ভুললাম না।

চেয়েছিল। টাকা নয় গয়না।

ড় হবার সংগে সংগে অনেক বদলে

নে। এতটুকু অস্থিরতা ছিল না, প্রগলভতা

ণের কোথাও একটুও অতিরিক্ত, অতিরঞ্জিত ছিল না। কিন্তু স্বাভাবিক স্নেহ, মায়া, মমতা ছিল—ভালবাসা।

আমি একদিন ভবানী দত্ত লেনের বাড়ীতে যেতেই সরস্বতী আমাকে আড়ালে নিয়ে গেল। আমি অবাক হয়েছিলাম, খানিক উদ্‌বিগ্ন। কিন্তু সরস্বতী বলল, 'একটা অনুরোধ করব তোমায়?'

'কী অনুরোধ?'

'আগে অনুমতি দাও?'

'দিলাম।'

'তুমি তো' দল করছ, তোমার এখন টাকার দরকার। আমার সামান্য যে ক'টা গয়না আছে নেবে?'

আমি এতদিনে যেন ভাল ক'রে লক্ষ্য করলাম সরস্বতীকে। প্রত্যহের দেখার পরেও কোথায় যেন আবিষ্কারের বিস্ময় লুকনো ছিল। আমি দেখলাম, দু'হাতে দু'গাছা ডায়মণ্ড-কাটা চুড়ি আর কানে দুটো পাতলা দুল ছাড়া আর কোন অলংকার নেই ওর শরীরে।

'তুমি নিজেকে এমন লক্ষ্মীছাড়া ক'রে রেখেছ কেন?' আমি ওকে ধমক দিতে চাইলাম।

'কী হবে গয়না প'রে? গয়না প'রে কী হয়? আর তাছাড়া সংসারের এই অবস্থায় গয়না পরার সুখ আমি পাই কী ক'রে, বল?'

'অত খোঁজে তোর দরকার কী? তুই ছেলেমানুষ ছেলেমানুষের মতো থাকবি। আমরা এতগুলো লোক রয়েছি কী করতে? তাছাড়া তুই গয়না না প'রে, দীনহীন হ'য়ে থেকে সংসারের কোন্ সুবিধেটা করবি শুনি?'

'আমাকে যদি এখনো ছেলেমানুষ সাজিয়ে রাখলে তোমাদের সুবিধে হয়, তবে তাতে বাধা দেব না। কিন্তু তোমাদের জ্ঞাতার্থে বলছি আমি আর ছেলেমানুষটি নেই। আমার বয়স—' বলেই থামল সরস্বতী। এক অদ্ভুত সলজ্জ আবেশে তা'র চোখের পল্লবগুলি কেঁপে উঠল। তারপর দৃষ্টিটা মৃত্তিকাশয়ী হলো। একটু পরে মুখ তুলে বলল, 'যাক্। তাহলে আমার গয়না তুমি নেবে না?'

'না।'

'কেন জানতে পারি কী?'

'প্রয়োজন নেই ব'লে।'

'যদি কোনদিন প্রয়োজন হয় তাহলে নেবে তো?'

'বলতে পারছি না।'

'কিন্তু আমি বলতে পারছি। তোমার প্রয়োজনে আমার সাহায্য করার অধিকার আছে'—বলেই একটু থতমত হ'য়ে কথাটাকে ঘুরিয়ে নিতে চাইল সরস্বতী। 'হ্যাঁ, অধিকার আছে, যেহেতু তুমি আমাদের

পরিবারের থেকে আলাদা নও। যে অধিকারে তুমি আমাদের সংসারের সাহায্য করতে চাও ঠিক সেই অধিকারে আমরাও সাধ্যমত তোমার প্রয়োজনে লাগতে পারি।' কথা শেষ ক'রে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না সরস্বতী। শাড়ীর আঁচলটা গলার পাশ দিয়ে জড়িয়ে এনে ঠোঁটে চেপে ধ'রেই সে দ্রুত প্রস্থান করল।

ললিতা-বউ মারা যাবার পর মণিশংকর গোস্বামীর বাড়ী যাওয়া আমি প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলাম। বাড়ীটায় ঢুকতে ইচ্ছে করত না। খুব কমই যেতাম, আসতাম। আসলে মণিশংকরকে অমি যেন আর অন্তর থেকে মেনে নিতে পারছিলাম না। তাঁর জীবনে শ্রদ্ধার জিনিস-গুলো ক্রমেই কমে আসছিল। মানুষ হিসেবে তাঁর কুৎসিত ফাঁকিটুকু বারংবার ধরা পড়ছিল আমার চোখে। তিনি নিজেও আমার মনোভাব টের পেয়েছিলেন।

আমি গেলাম। বেশ কিছুদিন পরে গেলাম তাঁর কাছে। দল তৱি করেছি প্রথম অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি, সে খবরটুকু তাঁকে দিতে গেলাম। তাঁর উপস্থিতি কামনা করব। শুভেচ্ছা চাইব।

কিন্তু গিয়ে দেখলাম বাড়ীর দরজায় তালা ঝুলছে। জানলা কপাট সব বন্ধ। আমি বিস্মিত হলাম। কিছুদিনের যোগাযোগ নেই এর মধ্যে এমন কি পরিবর্তন হলো? কোথায় অন্তর্ধান করলেন মণিশংকর? পশুপতি বোস লেনের বাড়ী ছাড়ার পর নিখিলেশ চক্রবর্তীর সংগেও দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না। তাঁর কাছেও জিজ্ঞাসা করতে পারতাম।

কাছেই একটি পানের দোকান ছিল। দোকানের মালিক বৃদ্ধ বিহারীটি আমাদের অনেককেই চিনত। আমি তারই শরণাপন্ন হলাম। গিয়ে বললাম, 'কি নওলজী মাস্টারমশাইয়ের খবর বলতে পার?'

আমাকে দেখে একটু ঠাহর করবার চেষ্টা করল সে। তারপর চিনতে পেরেই ভীষণ ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল: 'আরে বাবুজী আপনি এতো দিন বাদ আইয়েছেন! মাষ্টারবাবু তো' বানারস চলিয়ে গেল!'

'সে কি ! কবে গেলেন ?'

'এহি তো আজ পাঁচ রোজ হইয়েছে।'

'কেন গেলেন কিছু জান ?'

'হামি বেশী কুছু জানেনা, লেকিন আজকাল মাষ্টারবাবুকে বহুত উদাস দেখায় ছিল, ঔর দারু-উরু পিনা বিলকুল ছোড়িয়ে দিছিলেন।'

মণিশংকর মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন ! শুনে আমি অবাক হলাম। তারপর মনে হলো এইটাই বোধহয় স্বাভাবিক। মানুষের চৈতন্যোদয় হয় আঘাতে যন্ত্রণায়। তা'র হুঁশ ফেরে।

আমি বৃদ্ধটির কাছে বিদায় নিয়ে আস্তে অস্তে ফিরলাম। বৃদ্ধ তখন পেছন থেকে বলছে, 'বাবু এ জীওন গঙ্গামাঈকা মাফিক আছে, কোথনো ধীরে, কোথনো জোরে বহে চলে যায়। কুছু মালুম হোতে দেয় না। হা-য় রামজীকে কি-রপা।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কথা শেষ করে লোকটি। কিন্তু সেই দীর্ঘশ্বাসের বেদনাটুকু যেন একখণ্ড পাতলা কাপড়ের মতো আমার সারা চেতনায় লেপটে যায়।

হঠাৎ আমি যেন কোন কিছুতে আর উৎসাহ বোধ করলাম না।

আমার চার পাশটা নিস্তেজ হ'য়ে এল। যেন আলো কমে গেল।

আমার শরীরের শক্তি হয়ে এল স্তিমিত।

একটা হাল-ছাড়া অবসাদ আমার সর্বাংগে যেন জ্বরের মতো লঘু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল।

বৃদ্ধ দোকানদারটির শেষ কথা ক'টি মনে হলো আমার। 'এ জীওন গঙ্গামাঈকা (এইখানে এসেই আমি যেন মনঃশ্চক্ষে গঙ্গার রূপ দেখতে পেলাম। তেমনি দীর্ঘ ও স্ফীত। শব্দ ক'টিও আপনা থেকেই আমার মনে স্থিতিস্থাপকতা পেল : 'গ অ-অ ঙ্গা আ-আ') মাফিক আছে, কোথনো ধীরে কোথনো জোরে বহে চলে যায়। কুছু মালুম হোতে দেয় না'।

আমি আকাশের দিকে তাকালাম। আমার মনে এক নিদারুণ নিস্পৃহতা গাঢ় হ'য়ে এল। কত অদ্ভুত অদ্ভুত কথা মনে হতে লাগল

আমার। মনে হলো, আকাশে ওই যে একটা আলোময় শক্তি কোটি কোটি বছর ধরে তার অমিত তেজ পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে রেখেছে সেটাও একদিন ধীর হ'য়ে আসবে, হবে হতোপ্রভ। জীবনের এই গতিশীলতা থেমে যাবে আস্তে আস্তে। আর, আর সেই প্যালিওজোয়িক যুগের প্রথম অ্যাজোয়িক পাথরের মতো এই পৃথিবীটা শুধুই প্রস্তরময় হ'য়ে উঠবে একদিন এবং পঞ্চাশ-ষাট হাজার বছর আগে এজগতে যেমন কোন মানুষের অস্তিত্ব ছিলনা, ছিল মানুষের মতো এক প্রাণী—তেমনি আবার এ পৃথিবী মনুষ্যশূন্য হবে। এই শতাব্দীর 'আলোকপ্রাপ্ত' মানুষের মতো প্রাণী'দেরও অস্তিত্ব মুছে আসবে। আমরা, পুরনোরা আমাদের সব পুঁজি নিয়ে চলে যাব, সরে যাব। তারপর একদিন পতনের বন্ধুর পথে আবার অভ্যুত্থানের আলো উঠবে। নতুন আলো। স্পন্দন জাগবে নতুন জীবনের। এই চলবে চক্রবৎ। এই যাওয়া আর আসা। এই ধ্বংস আর সৃষ্টি। এই জন্ম আর মৃত্যু। এই পুরনো আর নতুনের খেলা। আর, এই পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করতে করতে তবে পৃথিবী বাসযোগ্য হবে। জীবন সুন্দর হবে। মানুষের চিন্তা-চৈতন্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত হবে। যেমন ক'রে কোন ধাতব পদার্থ বেশী ঘর্ষণ ও ব্যবহারের দ্বারা ধারাল ও মসৃণ হয়।

আমি সেই কথা ভাবলাম। কেননা, মণিশংকরের হঠাৎ চলে যাওয়ার খবরে আমি ভীষণ অভিভূত হয়েছিলাম। তাই জগতের সব কিছুতেই আমি নশ্বরতা আবিষ্কার করলাম। সব কিছুতেই চলে যাওয়া, সরে যাওয়ার অদৃশ্য সংকেতকে খুঁজে পেলাম যেন।

ভাবলাম, এই কাজকর্ম, দলগড়া, সব মিথ্যে আস্ফালন ব্যতীত আর কিছু নয়। মনকে চোখ ঠেরে অকারণ নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করা। কেননা, সব কাজ এবং সব চেষ্টার পরেই মণিশংকরের মতো ওই 'হঠাৎ চলেযাওয়ার' ব্যাপারটা জীবনের কোন ভাঁজে লুকনো থাকে। সুতরাং মিছিমিছি এত লম্ফ-ঝম্প, দৌড়-ঝাঁপ ক'রে পরিশ্রান্ত হবার প্রয়োজনটা কী!

একটা প্রচণ্ড আলস্য ও ঔদাস্য আমাকে সেদিন ঘিরে রইল। বাসায়

এসে জামাকাপড় বদলাবার পর্যন্ত উৎসাহ পেলাম না। চৌকির ওপর শুয়ে পড়লাম টান টান হ'য়ে।

মণিশংকর তাহলে ভোগের আশ্রয় ছেড়ে কাশীবাসী হলেন শেষ পর্যন্ত? বৈরাগ্যকে বন্ধু করলেন?

উঠলাম, সিগারেট ধরালাম। তারপর আবার শু'লাম। এবং আবার সিগারেট ধরালাম এবং আবার শু'লাম। নিজেকে বহুবিধ চিন্তায় দুর্বল ক'রে ফেললাম। যখন আর চিন্তা করবার শক্তি রইল না তখন এই অনুভবে আমি নিজেকে বেঁধে ফেললাম যে, জীবন যখন এক্ষুণি এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না তখন মনের বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্যকে প্রশ্রয় দেওয়া বাতুলতা মাত্র। অদৃশ্য, অনবলোকিত সম্ভাবনার কথা ভেবে হাল ছেড়ে দেওয়া যায় না। আমাকে বেঁচে যখন থাকতেই হবে, তখন কাজও করতে হবে। অনেকটা তর্কশাস্ত্রের হেত্বাভাসের মতো বোঝালাম নিজেকে:

জীবন থাকলেই কাজ করতে হয়

আমার জীবন আছে।

∴ আমাকেও কাজ করতে হবে।

এই অনুভবটুকু আরাম দিল আমাকে; একটু নিশ্চিন্ত করল। তারপর একসময় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ ধাক্কাধাক্কিতে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ রগড়ে চৌকিতে উঠে বসেই দেখি, গৌর। বাঁ পা-টা চৌকির ওপর তুলে দিয়ে, আর ডান পা-টা মাটিতে রেখে সে মুখ থেকে একটা নীলচে-নীলচে ধোঁয়া বার করছে।

আমাকে তাকাতে দেখেই সে হেসে ফেলল।

'কিরে বিড়ি খাচ্ছিস যে! হঠাৎ এত দ্রুত পরিবর্তন তো ভাল নয়। বুর্জোয়া থেকে প্রলেতারিয়েত, একেবারে অপ্রেস্‌ড মিড্‌ল ক্লাস। ব্যাপার কি?'

গৌর চৌকির ওপর নিজেকে আধশোয়া অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে আমার দিকে কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবা!

এখন দেখছ কি, শালার কাজটা যদি লেগে যায় তো আর চিনতেই পারবে না।'

'বটে? তা' চিনতে এখনই একটু কষ্ট হচ্ছে। বিয়ে না হতেই হঠাৎ যেরকম বউয়ের ভাইয়ের গুণগান করছ, বিড়ি খাচ্ছ, তাতে একটু অচেনা ঠেকছে বৈ-কি!'

'রেলে একটা কাজ পাচ্ছি, জানিস!'

'রেলে? গুড্! এই তো চাই!'

'ধীরে বন্ধু ধীরে। রেলে শুনেই 'এলে' যেও না। আচ্ছা, রেলে কিসের কাজ হতে পারে বলে তোর অনুমান?'

'কেন, ক্লার্ক, এ-এস-এম, টি-টি-আই—কত কি!'

হাসল গৌর। তা'র প্রবল হাস্যে ঘরটা কেঁপে উঠল। পায়ের দোলায় মচমচ ক'রে উঠল চৌকিটা।

গৌরের সেই মূর্তির দিকে আমি অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলাম।

'না বন্ধু না। অত ছোটখাট কাজ না'। হাসির দমককে দমিত করে মুখে শুধু একটা অপার কৌতুকের আভাস রেখে বলল গৌর।

'জ্ঞান বিতরণ করার কাজ। খুবই মহৎ প্রফেসন। বই বই—

আমি ওর দিকে তাকিয়েই রইলাম।

কিন্তু গৌর আর কিছু বলল না। দেওয়ালে মাথা রেখে ওপর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চুপ ক'রে গেল। কিসের একটা ম্লান ছায়া যেন ওর মুখের সেই হাসির দীপ্তিকে আস্তে আস্তে মুছে নিল।

'কি ব্যাপারটা একটু খোলসা ক'রে বলনা বাবা! একটু ঝেড়ে কাশ।' হাল্কা হাওয়া ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় বললাম আমি।

গৌর একটু রাহুগ্রস্ত হাসি হেসে আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'একটা সেলিং এজেন্ট-এর কাজ। সোজাসুজি ক্যানভাসার বলতে পার। ট্রেনে ট্রেনে নানা বইয়ের চীপ্ এডিসন বিক্রী ক'রে বেড়াতে হবে। রাশিয়ান, জর্মন ক্লাসিকস্-এর ট্রানশ্লেসন, নানা সায়েন্টিফিক ফিকসন, আমেরিকান মিস্ট্রি থ্রিলার, এমারসনের প্রবন্ধের বই, ছোটদের ছবিওয়ালা ছড়ার বই—এইসব আর কি!'

আমি এতটা ভাবি নি। গৌরের কাজের ফিরিস্তি শুনে আমি স্তম্ভিত হলাম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাক্‌শক্তি রহিত হ'য়ে গেল। হঠাৎ খুব নাটকীয়ভাবে কঠিন নীরবতা নেমে এল ঘরে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে, নিজেকে আরেকটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টায় এবং ব্যাপারটির করুণ ও ভারী অবস্থাটিকে অপসারিত করতে গৌর বলল, 'অবশ্য এটা নিতান্তই সাময়িক। এখন একেবারেই বসে আছি তাই। পরে কোন মানানসই কাজ খুঁজে নিলে চলবে।'

আমি ভাবছিলাম আজ দেশের কি করুণ অবস্থা! দিকে দিকে মানুষের প্রাণশক্তি কিভাবেই না অপব্যয়িত হচ্ছে! লোক কাজ করতে চায় না এমন তো নয়, কাজ করতে চায়। কিন্তু কী কাজ করবে? ইভ্‌ন্ ইন ডিস্ট্রিবিউসন অফ ওআর্কস ডেমোক্র্যাসী স্যুড বি মেনটেইণ্ড। এভরিবডি মাষ্ট গেট দেয়ার ওন প্রপার অ্যাণ্ড আনপিঞ্চিং স্যু'জ্‌ টু পুট অন। ভাবলাম আমি।

তারপর ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে বললাম, 'দেখ, একটা কথা বলি শোন্ গৌর। তুই একাজ করিস নি। আমি তো ট্রুপ ফর্ম করেছি— তুই বরং আমার সংগে আয়। আমারও কাজের সুবিধে হবে আর তুইও একটা সম্মানজনক জীবিকা পাবি।'

গৌর একবার শুধু মুখ তুলে স্থির ও গাঢ় দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে তারপর মাথা হেঁট ক'রে বসে রইল। কথার জবাব দিল না। আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত উত্তরের অপেক্ষা ক'রে বুঝলাম প্রস্তাবটা গৌরের মনঃপুত হয়নি। তাই এ-সম্পর্কে সে আর আলোচনাই করতে চায় না। আমি চুপ ক'রে গেলাম।

পরে একদিন ভবানী দত্ত লেনের বাড়িতে গৌরের ঘরে ঢুকে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। গৌর তখন তার সেই মহৎ জীবিকায় লেগেছে। ওর ঘরটা ছিল একেবারে শেষ দিকে। সম্পূর্ণ আলাদা, কারো সংগে কোন সম্পর্ক ছিল না।

আমি অবাক হ'য়ে দেখলাম, ঘরময় যতরাজ্যের বই ধূলোর মতো

উড়ছে। আর, দেওয়ালে যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য, লেনিন, রবীন্দ্রনাথ, আব্রাহাম লিংকন, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র এবং তার সংগে নর্মা শিয়ারার, তারাসুন্দরী আর দুর্গাদাসের ছবি বিচিত্র ঘেঁষাঘেঁষিতে টাঙান রয়েছে। এক দেওয়ালে কনফুসিয়সের সেই বাণী 'জেন' শব্দটি লাল পেন্সিলে বড় বড় ক'রে একটি পিজবোর্ডের গায়ে লেখা। আর, ঘরজুড়ে বহু তারের গায়ে গায়ে বেশ কয়েকটি খাঁচা ঝুলছে। তাতে নানারকমের সব পশু-পক্ষী—কাঠবেড়ালী পর্যন্ত। আমি এই সর্বব্যাপী বৃহৎ আয়োজন দেখে থ' হ'য়ে গেলাম।

খুব একটা সতৃপ্ত হাসিতে মুখ ভরিয়ে গৌর বলল, 'কি বুঝছ? দিস্ ইজ্ মাই কিংডম। অ্যাণ্ড হিআর আই অ্যাম দি মোনার্ক অফ অল্ আই সার্ভে, নান টু ডিসপ্যুট।'

'তাতো বুঝলাম, কিন্তু হঠাৎ এই বিষমডিগবাজী কেন?'

'ডিগবাজী! ডিগবাজী নয়, ডিগবাজী নয়। ভেবে দেখলাম, এ হার্মফুল ট্রুথ ইজ বেটার ছান এ ইউজফুল লাই। তাই, জীবনের ছাঁচ একেবারে বদলে ফেলেছি। তোমার কথাই ঠিক—দল, মতের অদলবদল ছেড়ে হৃদয়-দলকে প্রস্ফুটিত করার কজে লেগেছি এখন! কিন্তু তার আগে কমপ্লিট্ ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স্ অফ্ মাইণ্ড্ অর্থাৎ কিনা চিত্তের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা হওয়া দরকার তো! সেটা যে-কোন মানুষেরই খুব সাধারণ এবং খুব স্বাভাবিক এক দাবী।'

'তা' তোমার এই রাজত্বের প্রজা কে এবং কারা?'

'কেউ নয়। মনুষ্য প্রজা বলতে আমিই এক।'

'তুমি প্রজা! তাহলে রাজা কে?'

'আমার হৃদয়। কিং অফ মাই লাইটেড চেম্বার। আমি তারই আজ্ঞাবহ, বশংবদ প্রজা—সাবজেক্ট।'

'কিন্তু তোমার রাজা যদি তোমাকে পথে বসান, মূর্খ ভোজরাজা অথবা খেয়ালী মোহম্মদ-বীন-তুঘলক হন—তখন?'

'সম্প্রতি তারই জন্যে অনুশীলন এবং গবেষণা চলছে। রাজাকে শুধু রাজর্ষি হলে চলবে না, রাজা যদি মহর্ষি হন তবেই মানুষ ও

সমাজের পক্ষে তা' কল্যাণকর। বর্তমানে সেই অবস্থাপ্রাপ্তির সাধনা স্বরু হয়েছে।'

'কিন্তু সংসারের প্রতি দায়, কর্তব্য ?'

'যতদূর সম্ভব সেই ঘানি চালু রাখা হবে। তবে, সংসার বাবা-মা, ভাই-বোন এসবই মিথ্যে—জলের আলপনা।'

'একালে কিন্তু কোন মহৎকাজ করতে গেলেও সংসারকে এড়িয়ে যাওয়া চলে না। বুদ্ধ, চৈতন্য হবার দিন বোধহয় ফুরিয়েছে।'

'সেইজন্যেই তো' যতদূর সম্ভব ঘানি চালু রাখার কথাটা ব্যবহার করলাম। তা না হ'লে কবেই সব দড়িদড়া আল্‌গা ক'রে বেরিয়ে মনের সাধে ঘুরে ফিরতাম।'

'কিন্তু জ্যেঠিমা যে দুঃখ করেন, তোরা আজকাল ওঁকে ভাল ক'রে কেউ দেখিস না। তোদের এখন হাত-পা শক্ত হ'য়ে গেছে, নিজের নিজের সব স্বার্থ নিয়ে আছিস—'

গৌর চোখ পাকিয়ে তাকাল, বলল, 'সবরকম কাজ-কর্ম নিজেদের যাবতীয় দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা, শ্রান্তি-ক্লান্তি ইত্যাদির পরেও মানুষের পক্ষে যতটুকু মাতৃকর্তব্য পালন করা সম্ভব একালে তা' নিশ্চয়ই করা হয়। তবে, ওঁর ইদানীং নানারকম বাই জন্মাচ্ছে—উনি সকলের মাথায় পা দিয়ে হাঁটতে চান। আর। হাত-পা শক্ত করার কথা কি বলছিস ? সেটা সব বাবা-মা'ই করতে বাধ্য। সেটা তাঁদের ন্যায্য দায়িত্ব। এমন কিছু অলৌকিক কাজ তাঁরা করেন না ! নিজেদের প্রয়োজনে সন্তানদের ডেকে আনবেন পৃথিবীতে আর হাত-পা শক্ত ক'রে দেবেন না তো কি ছাল-ছাড়ানো মুরগীর বাচ্ছা ক'রে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেবেন ? বল্‌, কে চায় পৃথিবীতে জন্মে প্রতিনিয়ত রথের চাকায় পিষ্ট হতে ? কে চায় জীবন-জীবন ক'রে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে ভয়ংকর মৃত্যুর স্বাদ নিতে ?'

আমি কিছুক্ষণ স্থির চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর বইয়ের আবর্জনা সরিয়ে একটু আসনের ব্যবস্থা ক'রে বসে বললাম, 'এই না বলছিলে আজকাল তুমি হৃদয়ের অনুশাসন মেনে

চলছ? রাজাকে নাকি মহর্ষি বানাতে চাইছ? এই কি তার নমুনা? তাছাড়া, আমি তো এমন কথা কখনো বলিনি যে, বাপ, মা সব মিথ্যে, তাঁরা শুধু সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র এবং তাঁরাই সব অশান্তির হেতু?'

'ও-টুকু আমার নিজের সংযোজন এবং সংশোধন। দেখ, এটা দশরথের বেটাদের কাল নয়—অত ভক্তি ও আনুগত্য দেখাবার সময় ও সুযোগ একালের নেই। একালে শুধু স্পীড, গতি—যতির কোন স্থান নেই এখন। চাই বেগ, আবেগ নয়।'

'বুঝলাম, তুমি একটি নরাধম। তোমার ওই হৃদ্-পরিবর্তন ইত্যাদি কথাগুলো নেহাৎই বাজে—আসলে এটা খেয়াল পরিবর্তন, এক খেয়াল থেকে আরেক খেয়ালের খেয়া পার হওয়া।'

'তাই বা মন্দ কি! তাতেও ক্ষণিক জীবন আছে, খানিক। আজকালকার দিনে ক্ষণিক যা' তারও দাম কম নয়। তাকে তুমি ফেলতে পার না।'

'আমি তা'তে বিশ্বাস করি না।'

'আমি করি।'

'আবার ঠকবে।'

'আর বোকা হব না।'

আমি চুপ ক'রে গেলাম। আর কথা বলা নিরর্থক। বুঝলাম গৌর বেপরোয়া হয়েছে। অনেক কিছুই বর্জন করতে পেরেছে। আমি ওর সম্বন্ধে ভয় পেলাম।

ভয় যে নিতান্ত অমূলক নয় তা' টের পাওয়া গেল বছর দেড়েক পরে। তখন আমার অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে। প্রথমবার দিল্লী ঘুরে গেছি। মীনাক্ষির সংগে পরিচয় হয়েছে। মীনাক্ষি এসেছে কলকাতায়। আমি বাসা-বদল করেছি।

একদিন ভোরবেলা গৌর এসে হাজির হলো।

আমি তখন ঠন্‌ঠনে কালীবাড়ীর উল্টো দিকে বেচু চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটের একটা বাড়ীতে থাকি। ছোট বাড়ী কিন্তু পুরো বাড়ীটাই নিয়েছিলাম। থাকা, কাজকর্ম, গানের ক্লাস সবই সেখানে হতো।

তখন শীতকাল। ভাল ক'রে ফর্সা হয় নি। সেদিন আবার ভোর থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। কালো হ'য়ে ছিল আকাশটা। বাইরেটা জল-রং-এ আঁকা অস্পষ্ট ছবির মতো লাগছিল।

আমি সকাল সকাল উঠে বিছানার ওপর লেপমুড়ি দিয়ে চুপ ক'রে বসে ছিলাম। আমার সামনে রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। লোক নেই। মাঝে মাঝে দু'একজন মানুষ ধুসর এবং আবছা হ'য়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। থিয়েটারের দৃশ্যের মতো। রাস্তায় ছাই এবং উচ্ছিষ্টের স্তূপাকার। ময়লা তোলা গাড়ী আসে নি। দুধের টিন বসান সাইকেল নিয়ে সামনে থেকে ছুটে এল একটা লোক। আমার দৃষ্টির অন্তরালে গেল। লং-জাম্পের মতো লাগল ব্যাপারটা। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়ে ট্র্যাম চলে গেল। আমি দেখতে পেলাম না কিন্তু তার ঘণ্টাটা শুনতে পেলাম।

এমন সময় ভিজতে ভিজতে গৌর এল।

গায়ে একটা চকোলেট রঙের আলোয়ান। বৃষ্টির ফোঁটা প'ড়ে প'ড়ে সেটা সেই মুহূর্তে কৃষ্ণ বর্ণ হয়েছে! গৌরের মুখে, চোখের কোলে বারিবিন্দু।

'কিরে তুই এত সকালে?'

'এই এলাম আর কি!' টেবিলের এটা-সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল গৌর।

'জ্যেঠিমা ভাল আছেন তো?'

'হ্যা।'

আমার কথা বলা শেষ হ'য়ে গেল। আমি থামলাম। এবার গৌর নিজ প্রয়োজনবোধে মুখ না খুললে আমার করনীয় কিছু নেই। শুধু সময়কে নিঃশব্দে যেতে দেওয়া।

আমি ওর দিকে তাকালাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম। ওর সংগে চোখাচখি হ'য়ে যেতেই ও তাড়াতাড়ি দৃষ্টিটা নাবিয়ে নিল। একটা পেপার ওয়েটকে নিয়ে ব্যস্ত হলো অকারণ। পেপার ওয়েটটা হঠাৎ হাত থেকে ফস্কে মাটিতে পড়ল। শব্দ ক'রে

গড়িয়ে গেল মাটিতে। গৌর উঠে গিয়ে সেটা কুড়িয়ে আনল। টেবিলের কাছাকাছি এসে আবার চোখাচুখি হ'য়ে গেল আমার সংগে।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ও পেপার ওয়েটটা যথাস্থানে রাখল। তারপর অবনত মুখেই বলল, 'ইয়েএকটাব্যাপার হ' 'ছে।'

কথাগুলো পরিষ্কার শোনাল না। ক্ষয়িত ও অস্পষ্ট হ'য়ে বেরোল। আমি অপেক্ষা করলাম।

এবার ও আমার দিকে সোজা হয়ে তাকাল। গলা থেকে সব সংকোচ ঝেড়ে ফে'লে বলল, 'একটা ব্যাপার হয়েছে।'

'কী বলো?' এতক্ষণে কথা বললাম আমি।

গৌর খাটে, আমার পাশে এসে বসল। সহজ হ'য়ে।

'আমাদের সনাতন ড্রাইভারকে চিন্‌তে তো—'

হ্যাঁ চিনি বৈকি! জ্যেঠামশাই মারা যাবার পর এবং গাড়ী বিক্রী ক'রে দেবার পর তা'কে আর দেখিনি যদিও, শুনেছিলাম সে নাকি এখন কোন্ এক অভিনেত্রীর গাড়ী চালায়। অভিনেত্রীটির মদ্যপানের অভ্যাস আছে। সনাতন লুকিয়ে তা'র জন্যে মদের বোতল আনত। এবং একদা বহনের সংগে সংগে তার সেবনও শুরু হয়। আগে ছিল গাঁজা এখন হলো মদ। দু'টিই কঠিন উপসর্গ। এবং এ দু'য়ের শক্ত পাল্লায় সনাতন যখন হাবুডুবু খেতে লাগল সংসার তখন ছিকেয় ওঠবার জোগাড়। বড় ছেলে অনেকদিন আগেই আলাদা হ'য়ে গিয়েছিল। সে একটা গ্যারেজের মিস্ত্রী। রাজাবাজার অঞ্চলে থাকে। সোনাগাছির এক বেশ্যাকে বিয়ে করেছিল সে। বিয়ে ক'রে নাকি সুখীই হয়েছিল। তারপরে এক মেয়ে; বছর উনিশেক বয়স হবে। মেয়েটি ভারী সুশ্রী এবং স্বভাবটি তা'র মধুর। পশুপতি বোস লেনের বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসত। তখন দেখেছি। ছোট ছেলেটার বয়স বছর তেরো। ইস্কুলে পড়ে। শ্যামবর্ণ, মিষ্টি মুখ। লেখাপড়ায় ভাল। কিন্তু জন্ম থেকে তা'র একটা কাণ ছিল না। সেজন্যে তা'কে একটু বীভৎস দেখালেও

তা'র কথাবার্তা শুনলে প্রাণটা জুড়িয়ে যেত। আর কিছু মনে হতো না, তখন মায়া হতো।

শুনেছিলাম মদের নেশায় সনাতন নাকি ইদানীং তা'র সংসারের অবস্থা ভয়াবহ ক'রে তুলেছিল। টাকা পয়সা দিত না নিয়ম ক'রে। বাড়ীতে অর্ধেক দিন হাঁড়িই চড়তে পেত না। ছেলেটার পড়াশুনার ব্যাঘাত হতো। রাত্তিরে ফিরে রোগা, রক্তহীন স্ত্রী'টির ওপর জুলুম করত। এমন কি, অত বড় মেয়ের গায়েও হাত তুলত, পরনের কাপড় ধ'রে টান দিত। স্ত্রী নিজের ওপর অত্যাচারে বিচলিত হয়নি কিন্তু অত বড় মেয়ের গায়ে হাত দেওয়ায় এবং কাপড় ধ'রে টানায় ভয় পেয়েছিল। ছোট ছেলেকে পাঠিয়েছিল বড় ছেলের কাছে। বড় ছেলে নাকি এসে একদিন আচ্ছা ক'রে শাসিয়ে গিয়েছিল বাপকে। হুজ্জত ক'রে বস্তীর লোক জমিয়ে ফেলেছিল। বলেছিল, 'শালা, বাপের এ্যায়সী কি ত্যায়সী, ফের যদি এরকম শুনি তো' দেখবে মজা।' সনাতন নাকি সেদিন নেশা করে নি। দাওয়ায় বসে ছেলের সব গালাগাল মন্দ, চুপ ক'রে শুনে তারপর নির্বিকার ভাবে একটা বিড়ি ধরিয়ে ঘরে চলে গিয়েছিল। দিন দু'য়েক ভাল ছিল। তারপর আবার সেই কাণ্ড। স্ত্রী অভিনেত্রীটির ঠিকানা জোগাড় ক'রে তা'র বাড়ীতেও গিয়েছিল। অভিনেত্রীটি মুখে প্রচুর সমবেদনা জানিয়ে এর একটা বিহিত করবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। তারপরের ঘটনা আমি আর জানতাম না।

'হ্যাঁ, কী হয়েছে সনাতনের ?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'সনাতনের কিছু হয়নি। সে যেমন দু'নেশার গাড়ী হাঁকিয়ে সংসারটাকে গোল্লায় দিচ্ছিল, তেমনিই দিচ্ছে। এতটুকু পরিবর্তন হয়নি কিন্তু বাড়ীর অন্য লোকদের সেই দাপটে মর-মর অবস্থা। হাড়ির হাল হয়েছে সংসারের।' গৌর চুপ করল

আমি ওর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

গৌর মাথা নিচু ক'রে বলল, 'সনাতনের মেয়ে লক্ষ্মীকে জান তো ?'

'হ্যাঁ, জানি।'

গৌর মাথা তুলে আমার চোখের দিকে সোজা তাকাল।

'লক্ষ্মীকে আমি বিয়ে করতে চাই।'

আমি স্তম্ভিত হলাম। সনাতন ড্রাইভারের মেয়ে লক্ষ্মীকে বিয়ে ক'রবে রামতর্ণু চক্রবর্তীর ছেলে! যুগ পাল্টেছে, সমাজ পাল্টেছে, কিন্তু তাই ব'লে এত বড় একটা দুর্ঘটনাকে কি ঘটতে দেওয়া যায়? আমি বললাম, 'তুমি সবদিক ভাল ক'রে ভেবে বলছ তো?'

'নিশ্চয়ই। এমন একটা নিয়ম ছাড়া কাজ করছি আর ভাল ক'রে ভাবব না? অনেক ভেবেছি। নিজের সংগে অনেক যুদ্ধ করেছি। তারপর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'জ্যেঠিমার কথা বিবেচনা করেছ? এত সব দুঃখ-যন্ত্রণার পর এই বয়সে তাঁকে আবার নতুন ক'রে আঘাত দেওয়া কি ঠিক হবে?'

'উপায় নেই শোভন। তিনি যদি এতে আঘাত পান আমি নাচার কারণ একদিক রাখতে গেলে আরেকদিক রাখা যায় না। তাঁর প্রতি যথাকর্তব্য করতে গেলে, লক্ষ্মীর প্রতি আমার অকর্তব্যতার বোঝা বেড়েই চলবে। আমি তা'কে বাঁচাতে চাই।'

'তুমি তা'কে ভালবাস?'

'ভালবাসা!' গৌর একটু ঘাড় ঘুরিয়ে কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'ভালবাসি কিনা ভাববার সময় পাইনি এখনো। তবে তা'র প্রতি কোমলতা অনুভব করি। তা'র কষ্টে ব্যথা পাই, আর বুঝি, ও-সংসারে সনাতনের আশ্রয়ে থাকলে সে আর বাঁচবে না। মান-সম্মান যাবে তারপর হয়ত কোনদিন শুনব গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েছে। না, সে অবস্থা আমি ঘটতে দিতে চাই না।'

আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল গৌর। কেন জানিনা, আমি তাকাতে পারলাম না ওর দিকে। আমার মাথা হেঁটে হ'য়ে গেল। একটা অপরাধ-বোধ জাগল।

'কিন্তু আমার কাছে কেন এসেছ তুমি?' আমি মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করলাম।

'আমি জানি, মা রাজী হবেন না। তুমি যদি তাঁকে একটু বুঝিয়ে বল সমস্ত অবস্থাটার কথা। তাছাড়া, বিশ্বসংসারে সবাই

আমায় পরিত্যাগ করলেও তুমি কি করবে সেটা আমার জানা দরকার।’

আমি সমস্ত দৃশ্যটা যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম। জ্যেঠিমা রাজী হবেন না। নতুন ক’রে আঘাত পাবেন। আর হয়ত, সে-আঘাত সহ্য করার জন্যে টিঁকেও থাকবেন না। গোটা সংসারটা লণ্ডভণ্ড হ’য়ে যাবে। পশুপতি বোস লেনের অতবড় নামজাদা বনেদী বংশের ভবিষ্যত-পরিচয় হয়ত সনাতন ড্রাইভারের মেয়ে লক্ষ্মীর গর্ভজাত সন্তান বহন ক’রে বেড়াবে আজ থেকে কয়েক বছর পরে, কলকাতা শহরের কোন অখ্যাত গলির অন্ধকারে নগ্ন সভ্যতায় সেই পরিচয়টা বড় হ’য়ে উঠবে, তারপর কালক্রমে সে-ও তা’র রক্তের চিহ্ন রেখে যাবে এই পৃথিবীতে কিন্তু রামতনু চক্রবর্তী এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের বহু যত্নে গ’ড়ে তোলা সেই শিক্ষা, ঐতিহ্য এবং জীবনযাত্রা আর কোনদিন ফিরে আসবে না। একদিন হয়ত জাত ঘুচে যাবে, শ্রেণী ঘুচে যাবে, মানুষের সামাজিক বৈষম্য দূর হবে কিন্তু একটি পরিবারের সেই বিশেষার্জিত প্রতিবেশ এবং বিবিক্ত ঐতিহ্যকে চেষ্টা করেও আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষকে রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়ত আছে, হয়ত কোন প্রাচীন সভ্যতাকেও ধ’রে রাখা যায় যাদুঘরের বিস্ময়ে কিন্তু একটি প্রাচীন পরিবারের সেই নিজস্ব পরিবেশটুকু কেমন ক’রে টিঁকে থাকে পরিবর্তনের ভর্ৎসনায় যদি উত্তরপুরুষরা তা’কে রক্ষা করার যোগ্যতাই না পেল!

আমি বললাম, ‘গৌর তুমি আমাকে জান। কর্তব্যবোধটা চিরকালই আমার কাছে বড়। যা’ হয় তা’ নয়, যা’ হওয়া উচিত তার প্রতিই আমি বিশ্বাসী। সেই মতেই আমি নিজেকে চালাবার যথাসম্ভব চেষ্টা করি। বাবাকে দেখেছিলাম, এখানে এসে জ্যাঠামশাইকে দেখলাম। তাঁদের জীবন থেকে যা’ সঞ্চয় করেছি সেটা আমার কাছে ফেলনা নয়। আমি তা’র মর্যাদা রাখতে চাই। মর্যাদাহীনতার এই অভিশাপ আজ সারা দেশটার বুক জুড়ে। গৌর, তোমার এই ব্যাপারের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে কিন্তু সমর্থন নেই। আর,

জ্যেঠিমাকে আমি বলতে পারব না। আমার কাছ থেকে আর শেষ প্রহারটা তিনি না-ই বা পেলেন। তবে তোমাকে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব। হ্যাঁ, আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও।'

গৌর ছিট্‌কে সরে গেল আমার পাশ থেকে। একটা তীব্র ঘৃণায় ও ক্রোধে তা'কে মুহূর্তের জন্যে ক্ষিপ্ত পশুর মতো ঠেকল। চাপা গর্জন ক'রে সে বলল, 'শালার পৃথিবীর এই নিয়ম। সকলের তালে তাল দিয়ে, মন জুগিয়ে চল তাহলেই সব ভাল। নইলে যেই একটু নিজের ইচ্ছে খাটিয়েছ অমনি বাপ, মা, ভাই, বোন, বন্ধু সবাই টুঁটি চেপে ধ'রে বলবে, তুমি শালা অপরাধী, অন্যায় করেছ। শোভন, কর্তব্য তোমরা একাই করতে আসনি দুনিয়ায়। আমিও করছি। আমি একটি মেয়ের জীবন রক্ষা করছি। যা'র সামনে অনেকগুলো দিন আছে। অনেক ছোট ছোট সাধ-আহ্লাদ, অনেক ছোট-ছোট হাসি-খুশী বেদনায় নীল হ'য়ে রয়েছে। অথচ, সে-গুলোর দাবী তোমাদের কারুর চেয়ে কম হবার কথা নয়। তবে তোমার কাছে এসে আমি ভুল করেছিলাম—'

বাইরেটা বিষণ্ণ হ'য়ে রয়েছে। বৃষ্টির বিরাম নেই। ঘরের মধ্যে একটা অস্পষ্ট আলোকাভাস অচল হ'য়ে রয়েছে একই ভাবে। তার শরীরহীন ব্যাপ্তির গুরুভারটুকু টের পাওয়া যায়। চকোলেট-রঙের আলোয়ান গায়ে-দেওয়া গৌর, তা'র হাত-পা সঞ্চালন, তা'র উত্তেজনা অশান্ত দৃষ্টি, কথা-বলার সংগে সংগে মুখের পেশীর সংকোচন-প্রসারণ আমার মনে প্রয়োজনানুযায়ী গুরুত্ব সৃষ্টি করতে পারছিল না। কাঁচের গায়ে জল পড়লে যেমন অনায়াস মসৃণতায় পিছ্‌লে যায় তেমনি গৌরের সব কথা, সব অঙ্গ সঞ্চালন আমার বুকে বসতে পারছিল না, শুধু পতনের মৃদু আঘাত সৃষ্টি করেই স'রে স'রে যাচ্ছিল।

'কেন, আমার কাছে এসে ভুল করেছ কেন বলছ?' অনেকটা আত্মগতভাবে বললাম যেন। প্রশ্নে যথোচিত শক্তি রইল না।

গৌর আমার দিকে স্থির চোখে তাকাল। দৃষ্টি ওর অনেকটা নরম।

তারপর বলল, উত্তাপহীন কিন্তু ক্ষোভ-গম্ভীর গলায় বলল, 'না, তোমার কাছে আসা আমার উচিত হয় নি।'

আমার কাছেই এগিয়ে এল সে। খুব কাছে।

'আমার জানা উচিত ছিল, তুমি এ ব্যাপার সমর্থন করতে পারবে না। তোমার সে সাহসই নেই।'

'মানে ?'

'মানে! তুমি ভীরু, তুমি কাপুরুষ। তুমি জীবনে নীতি মান, সংস্কার মান কিন্তু জীবনের প্রয়োজনকে স্বীকার করতে সাহস পাও না।'

'কিসে তুমি আমার সে ভীরুতা দেখেছ ?'

'দেখি নি ? জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তুমি সে ভীরুতা দেখাও নি ?'

'কোন্ কথা বলছ তুমি ?'

'ললিতা বউকে তুমি স্বীকার করতে পেরেছিলে ? সে যে বাঁচবে ব'লে ছুটে এসেছিল তোমার কাছে, তুমি কী পেরেছিলে তাকে রক্ষা করতে ? তোমার নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানেই সে যে মরেনি, অকালে স'রে যায় নি একথা তুমি জোর ক'রে বলতে পার ? কি তফাৎ আছে তোমাতে আর সেই শালার ভণ্ড মণিশংকরে ? বরং একদিক থেকে সে উন্নত। সে যে পাষণ্ড তা' ঢাকবার তা'র কোন চেষ্টাই ছিল না, কিন্তু তুমি! তুমি তো' মুখোস-আঁটা দুর্বৃত্ত, শয়তান! ওপরে ভাল সেজে থাক তলে তলে সব সময় দায়িত্ব এড়াবার ফিকির খোঁজ! অস্বীকার করতে পার এসব কথা ?'

গৌর আমার কাঁধ ধ'রে প্রবল ঝাঁকুনি দিল।

যন্ত্রণা, কি কঠিন যন্ত্রণা আমার বুকের ভেতর ভারী পাথরের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে ফিরতে লাগল গৌরের প্রতিটি কথায়। যে ক্ষতটা সময়ের প্রলেপে আস্তে আস্তে শুকিয়ে এসেছিল, গৌর যেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তা'কে রক্তাক্ত ক'রে তুলল। আমি নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করলাম। আর বুঝলাম, আমার সবচেয়ে জোরালো ও শক্তিশালী কথা ও যুক্তি দিয়েও আমি গৌরকে বোঝাতে পারব না।

বোঝাতে পারব না আমার নির্দোষিতা, আমার সততা। কোন্ বিবেচনা ও কার্যকারণে আমি ললিতা বউকে সেদিন প্রত্যাখ্যান করেছিলাম্। সেটাই তখন আমার কাছে একটা মংগলজনক সমাধান মনে হয়েছিল। একথা আমি বোঝাতে পারব না আমি ভীরুতায় সরে যেতে চাইনি। আমি তাকে মরতে দিতে চাইনি। তবু সে মরল। সেটা আমার কাপুরুষতা নয়। আমার হিসেবের ভুল। পরে বুঝেছিলাম, আমার প্রত্যাখ্যানে তা'র মংগল ছিল না।

আমি বললাম, 'গৌর, আমি সেদিন প্রস্তুত ছিলাম না। তোমার কথা সত্যি নয়। আমি কাপুরুষ নই। তবে হ্যাঁ, সংস্কারের সংকোচ আমার ছিল বটে।'

'সংকোচ নয়, সেইটেই তোমার ভীরুতা। সাহসের অভাব। তাই আমাকে তুমি যে আজ সমর্থন করতে পারছনা সেটা খুব আশ্চর্যের নয়। আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল যে, সবচেয়ে বড় বন্ধু হয়েও তোমার কাছ থেকে আমি এ ব্যাপারে কোন সাহায্যই পাব না।'

'সাহায্য আমি তোমাকে করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু জ্যেঠিমার কথা আর এতবড় বংশের ঐতিহ্যের কথা ভেবে এ ঘটনায় আমি সম্মত হ'তে পারছি না। আমার সমর্থন নেই কিন্তু সহানুভূতি আছে।'

'ধন্যবাদ।' গৌর চলে গিয়েছিল।

কিন্তু আমি ভবানী দত্ত লেনে গিয়েছিলাম। জ্যেঠিমাকে বলেছিলাম সব কথা। গৌরের যে কি অসহায় অবস্থা তাও বুঝিয়ে ছিলাম। তিনি কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। কিন্তু মুখটাকে এমন পাথর করেছিলেন আর চোখ দুটোকে এমন কঠিন যে, আমার বুঝতে দেরী হয়নি তিনি বরং মৃত্যুকেও স্বীকার করা শ্রেয় মনে করবেন কিন্তু বেঁচে থাকতে এমন অঘটনকে মেনে নেবেন না। কিছুতেই না।

সব শুনে গৌরের বড়দা বলল, 'মা, তুমি যদি ওই ছেলেকে আর এ বাড়ীতে ঢুকতে দাও, তাহলে স্পষ্ট জেন আমার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক জন্মের মতো ঘুচে গেল। ছিঃ ছিঃ কারুর কথা ভাবল না

একটা যা-তা মেয়েকে বিয়ে ক'রে সকলের মুখে চূণ-কালী দিতে চায়।'

এতটা আমার ভাল লাগে নি। গৌরের বড়দার আঁচরণ। এতটা নিষ্ঠুর হওয়া তা'র উচিত ছিল না, সমর্থন না থাকলেও সমস্ত ব্যাপারটা সহানুভূতির সংগে বিবেচনা করা উচিত ছিল। অথচ পশুপতি বোস লেনের বাড়ীতে প্রথম যখন ঢুকি এই বড়দাকেই দেখেছিলাম কত স্নেহপ্রবণ, ভালমানুষ। প্রত্যেকের প্রতি কখনো তার বিবেচনা অভাব হয়নি। আজ কি আশ্চর্য্য ভাবে বদলে যাচ্ছে সময় আর মানুষ! কত দ্রুত শিথিল হ'য়ে পড়েছে পুরনো অভ্যাস, জীবনের ব্যবহার!

লক্ষ্মীকে বিয়ে ক'রে জ্যেঠিমাকে প্রণাম করতে গিয়েছিল গৌর। তিনি ওর মুখের ওপর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। বড়দা সারাদিন বাড়ী থাকে নি। শুধু সরস্বতী এগিয়ে এসেছিল। নিজের গলার হারটা খুলে পরিয়ে দিতে গিয়েছিল লক্ষ্মীর গলায়। গৌর বাধা দিয়েছিল। বলেছিল, 'না, থাক্ ওটা এবাড়ীর জিনিস। ওটা আর নাই বা দিলি।' কান্না সামলাতে পারে নি সরস্বতী। গৌরের বুকে মুখ গুঁজে বলেছিল, 'ছোড়দা এই ক'টা দিনে আমরা এত পর হ'য়ে গেলাম যে, একটা জিনিসও দেবার অধিকার হারিয়েছি তোর বউকে?'

গৌর বলল, 'দিস্, নিজে রোজগার ক'রে দিস। আর পারিস্ তো মাঝে মাঝে যাস তোর গরীব, বংশের কলংক এই ছোড়দার কাছে'।

কিন্তু গৌর আমাদের কারো সংগেই আর সংযোগ রাখতে চায় নি। আমি একদিন গিয়েছিলাম বেলেঘাটার বস্তীতে, ওর আস্তানায়। আমাকে দেখে ও খুব খুশী হয়েছিল ব'লে মনে হয়নি। শরীর খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল খুব। গালের হাড় দু'টো ঠেলে উঠেছিল আর অমন গায়ের রঙ জ্বলে কি হ'য়ে গিয়েছিল। আমি বললাম, 'গৌর আমাকে তুই সহজভাবে নিতে পারছিস না কেন, আমি তো তোর সেই শোভনই আছি।'

গৌর কোন উত্তর করল না শুধু একটু ম্লান হাসল। তারপর প্রসংগ পাল্টাল। 'কেমন আছিস, কাজকর্ম কেমন হচ্ছে?'

তারপর আরেকদিন ওকে দেখেছিলাম। সেদিন আমাকে ও চিনতেই চায় নি। এড়িয়ে চলে গিয়েছিল।

কি একটা দরকারে কৃষ্ণনগর যাচ্ছিলাম। ব্যারাকপুরের পরে কোন একটা ষ্টেশন থেকে গৌর উঠেছিল। এক হাতে ব্যাগ, এক হাতে খোলা কিছু বই। আমি প্রথমটা খেয়াল করি নি। হঠাৎ গলা শুনে চম্‌কে উঠলাম : 'ওয়ার্ল্ড ক্লাসিকস, রাশিয়ান, জর্মন, য়্যমেরিকান— অ্যাট রিডিউসড প্রাইস, জলের মত সস্তা দরে। চেখভ, আন্তন চেখভ, তলস্তয়, কালেকটেড এসেজ্‌ অফ এমারসন—'

আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, 'গৌর!'

গৌর আমার দিকে তাকাল। শান্ত দৃষ্টি। সে দৃষ্টির কোথাও ব্যস্ততা ছিল না, উত্তেজনা ছিল না। শুধু শরতের মেঘের মতো এক টুক্‌রো ব্যথা হাল্কা হ'য়ে ভেসে ছিল, আর ছিল আমাকে চেনবার চেষ্টা। যেন মনে করবার চেষ্টা করছে ও আমাকে। তারপর কোন কথা না-বলে বই আর ব্যাগ নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ; কোন ষ্টেশন না-আসবার আগেই।

সেদিন রাত্তিরে বাড়ী ফিরে আমি দেওয়ালে মাথা ঠুকেছিলাম। মনে মনে বলেছিলাম, আমি ধন মান কিছুই চাইনা। কেবল সেই অবস্থাটা ফিরে পেতে চাই যাতে খুব আপনার জনরা এমনি ক'রে পর হ'য়ে যায় না!

জ্যেঠিমা গৌরকে মেনে নিতে না-পারলেও গৌরের জন্যে খুব ভাবতেন। বড় ছেলের আড়ালে আমার সংগে প্রায়ই সে-বিষয়ে কথা বলতেন, দুঃখ করতেন। আর, আক্ষেপ করতেন, কি সংসার কি হ'য়ে গেল ব'লে। আর, সরস্বতীর জন্যে ভয় পেতেন। পাছে সে-ও হঠাৎ কোন কাণ্ড বাধিয়ে বসে! চটপট তা'র বিয়েটা সেরে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরস্বতী প্রতিবাদ করেছিল। বলেছিল, 'না আমি কাজ করতে চাই, কেরিআর করতে চাই।'

চাকরী নিয়েছিল সরস্বতী। আর আমি, বহু কষ্টে জ্যেঠিমার সম্মতি আদায় করেছিলাম, আমার ট্রুপে থাকবার। বড়দা মুখ ব্যাজার

করেছিল। তা'র ইচ্ছে ছিলনা, বোনকে এতটা অবাধ স্বাধীনতা দেবার। কিন্তু নেহাৎ আমি বলেই মুখ ফুটে বিরক্তিটা প্রকাশ করতে পারে নি। সরস্বতী আসাতে আমার খুব উপকার হয়েছিল— আর সে-ও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল বাড়ীর ওই ম্রিয়মান আবহাওয়া থেকে খানিকটা সরে থাকতে পেয়ে।

৪.

তারপর বছর তিন-চার কেটেছে। নানা জায়গা ঘুরেছি দল নিয়ে। মীনাক্ষি এসেছিল আমার জীবনে হঠাৎ। তা'কে ভালবেসেছি। ওর সংগে ভাল ক'রে পরিচয় হবার আগে পর্যন্ত আর কোন নারীর প্রয়োজন অনুভব করি নি। ভালবাসার অভাব মনে আমার শূন্যতার স্বষ্টি করে নি।' কিন্তু মীনাক্ষিকে জানবার পর বুঝেছিলাম মস্ত বড় এক ফাঁককে বুকে বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি এতকাল। আমার অগোচরে আমার প্রেমের জন্যে জায়গা করা ছিল মনে, অথচ তার খোঁজ রাখি নি। আমি শুধুই কাজ করেছি আর জীবনের নানা ঘটনাকে সামাল দিতে ব্যস্ত থেকেছি।

দ্বিতীয়বার অনুষ্ঠান করতে এলাম দিল্লীতে। পরশু রাত্তিরে আমার শো'। এবার আর কালীবাড়ীতে নয়, মস্ত সিনেমা-হাউসে; বৃহত্তর আয়োজনে। মীনাক্ষি এসেছে আমার সংগে। সরস্বতী আসে নি। ছুটি পায় নি অফিস থেকে। তাছাড়া, জ্যেঠিমা বুড়ো হ'য়ে পড়েছেন। তাঁর শরীরের অবস্থা ভাল নয়। তিনি আর ঘর ছেড়ে বেরোতেই পারেন না।

গৌর কখনো সখনো আসে। দাদাকে লুকিয়ে দূর থেকে দেখে যায় মা'কে। ঘরে ঢোকে না। মা-ছেলে দু' জনের কারো মুখেই কথা থাকেনা। শুধু জ্যেঠিমার চোখ জলে ভেসে যায়। শুনেছি, গৌর ট্রেনে ট্রেনে ক্যানভাসারি করা এখন ছেড়ে দিয়েছে। ছোট্ট একটি বইয়ের স্টল করেছে বৈঠকখানা বাজারের কাছে। কিন্তু সরস্বতীকে আমি আজও ভাল করে বুঝি নি।

হোটেলের সাম্‌নে আমার টাঙাটা এসে থামল।

১.

'সমুদ্রে যেরূপ অনবরত নানাদিক্ হইতে অবিশ্রান্তভাবে নদনদী ও বৃষ্টির জল প্রবেশ করিতে থাকিলেও, সমুদ্র কখনও 'যথেষ্ট হইয়াছে এবং আর আবশ্যক নাই'—ইহা বলে না এবং তাহার যে অভাব সেই অভাবই থাকিয়া যায় অর্থাৎ সমুদ্র বর্ধিত হয় না, সেইরূপ সর্বদিক হইতে নানা ভোগ্য দ্রব্যের রাশি সর্বদা প্রাপ্ত হইয়াও কামকামী ব্যক্তি শান্তি পায় না।' (গীতা : ২য় অধ্যায় : ৭০)

আমি সমুদ্র হ'তে চাইনি। আমি নদী হতে চেয়েছিলাম। একটি নিশ্চিত পূর্ণতায় আমার পরিতৃপ্তি চেয়েছিলাম। অভাবের অসম্পূর্ণতায় আমি কামকামী হতে চাইনি। না, আমি কামকামী ব্যক্তি হ'তে চাইনি কখনো। কেননা, আমি জানতাম সমুদ্রের পক্ষে যা' শোভা পায় মানুষের পক্ষে তা' পায় না। সমুদ্র বিশাল। তাই তার অভাবও বিশাল। সমুদ্র কামকামী হ'তে পারে। তার বুকে চিরকালের অতৃপ্তি এবং ক্ষুধা প্রকাণ্ড হ'য়ে থাকতে পারে। কোন নির্দিষ্ট সীমায় তার আবশ্যকতার পরিসমাপ্তি না-হতে পারে। কিন্তু আমরা মানুষ। আমরা ক্ষুদ্র জীব। আমাদের শেষ আছে। সমুদ্র অশেষ। আমাদের কামনা-বাসনা নিশ্চয়ই একটা উচ্চতায় শেষ হ'য়ে যাওয়া উচিত। মানুষ কখনো গোটা পৃথিবী হ'তে পারে না। মানুষ একটা ছাতনা হ'তে পারে। মানুষ একটা কলকাতা হ'তে পারে কিংবা বড়জোর একটা বাংলা দেশ হ'তে পারে কিন্তু মানুষ গোটা পৃথিবী হ'তে পারে না। মানুষ সমুদ্র হ'তে পারে না, মানুষ দারুকেশ্বর নদী হ'তে পারে; অজয় কিংবা রূপনারায়ণ কিংবা বড়জোর পদ্মা হ'তে পারে। আমি তাই নদী হ'তে চেয়েছিলাম। আমার অভাবটাকে একটা মাপের মধ্যে বেঁধে ফেলতে চেয়েছিলাম। শুধু অভাবের বোধটাকে আমার বুকের ভেতর আলোড়িত হ'তে দিতাম কিন্তু আমি নিবৃত্ত হ'তে জানতাম। আবশ্যকতা

ও অনাবশ্যকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট হুঁশ ছিল আমার। 'যথেষ্ট হয়েছে আর নয়' একথা বলতে আমি শিখেছিলাম। আমি জানতাম, নদী আপন বেগে পাগলপারা হ'তে চায় বটে কিন্তু তার ছোটার শেষ আছে।

তবু আমার বিপদ হলো, কেননা মীনাক্ষি চেয়েছিল আমি সমুদ্র হই। সে আমাকে নদীর মতো নির্দিষ্ট ক্ষমতায় দেখতে চায় নি! সে আমাকে সমুদ্রের মতো ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। বিশাল হ'তে বলেছিল। বি-ঈ-ঈ-শা-আল। আমার অভাব বোধকে সীমাহীন ক'রে তুলতে চেয়েছিল। ওর ইচ্ছে ছিল, পাওয়ার ক্ষিধেটা আমার মধ্যে বেড়ে যাক এবং সেই পাওয়ার নেশায় আমি ছুটে চলি; বেগে অত্যন্ত বেগে, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূণ্য হ'য়ে। একরোখা তেজী ঘোড়ার মতো কিংবা আধুনিক কথায় বলা যায় রকেটের মতো। ধন, মানকে আমি ভেদ ক'রে চলব। আমার ছোটার তীব্রতায় নিজেকেই ভুলে থাকব আমি। লোকে তা' দেখে মুগ্ধ হবে, অবাক হবে। এই চেয়েছিল সে। কিন্তু আমি তা' চাইনি। আমি অস্থিরতা চেয়েছিলাম, অতৃপ্তি চেয়েছিলাম। কিন্তু সে আমার ভেতরে; বাইরে নয়। বাইরের ক্ষিধেটা প্রচণ্ড হ'য়ে আমাকে একদিন গিলে ফেলুক আমি তা' চাইনি। আমি বৈশ্বানর হ'তে, কামকামী হ'তে চাইনি। কেননা আমি জানতাম ভোগ্য পদার্থ লাভ করার একটা দুর্বার নেশা আছে। মদ্যপায়ীর নেশার চেয়েও সেটা ভয়ংকর। সেই নেশা মানুষকে একদিন গ্রাস করে ফেলে; তার দোরগোড়ায় সর্বনাশকে এনে হাজির ক'রে দেয়।

পশুপতি বোস লেনের পাশের বাড়ীর একটা ঘটনা আমার মনে আছে। যদিও সামান্য ঘটনা কিন্তু তা' আমাকে প্রচুর শিক্ষা দিয়েছিল সেদিন। আমি বুঝেছিলাম মানুষ অতিরিক্ত কামকামী হ'লে তার ফল ভাল হয় না; বিপদ হয়। পশুপতি বোস লেনের বাড়ীর একপাশে ছিল কালীতারা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার আর অন্য পাশে নিরাপদ পাল নামে এক ডেআরি মার্চেন্ট-এর বাড়ী। ভদ্রলোক কোন্‌কালে বরিশালে ছিলেন তার ঠিক নেই। পার্টিশনের বহু আগে থেকেই কলকাতায় এসে দিব্যি জমিয়ে বাস করছিলেন; রেডিও, রেফ্রিজারেটর আর

বন্দুকের লাইসেন্স নিয়ে। কিন্তু সময়কালে তিনিও কৌশলে রিফিউজী লোন্ আদায় করতে ছাড়েন নি। তারপর কি ক'রে যেন সরকারী চাকরীও জোগাড় করেছিলেন। পুনর্বাসন দপ্তরে। সেখানে মোটা টাকার গোলমাল ক'রে ধরা পড়েন। আদালতে তাঁর বিচার হয়। কিন্তু কয়েকদিন মাত্র হাজত বাস ক'রে তিনি হাসতে হাসতেই বাড়ী ফিরে আসেন। শুনেছিলাম তিনি পাড়াময় ব'লে বেড়িয়ে ছিলেন, পাবলিক ওয়ার্ক করার বড় ঝামেলা। অকারণ, মিথ্যে মিথ্যে ভাল লোকদেরও হয়রান হ'তে হয়। আর, পুনর্বাসন দপ্তরের তো' কথাই নেই। সবচেয়ে কঠিন দায়িত্ব সেখানে। সং লোকেরাও হাত-ময়লা হবার বদ্‌নাম পায়। তিনি আরও বলেছিলেন, উদ্বাস্তুরা হচ্ছে শূয়োরের বাচ্ছা। ভিখিরীর অধম। ওদের কোন ভাল করতে নেই।

কিন্তু ঘটনাটা নিরাপদকে নিয়ে নয়। নিরাপদর বাড়ীতে এক বিধবা আশ্রিতা ছিল, নাম তরুবালা। আশ্রিতা অথচ ঝিকে ঝি, রাঁধুনীকে রাঁধুনী। বছর বত্রিশেক বয়স হবে। বাতাবী লেবুর মতো ভারী গোলগাল, শাদাটে একখানি মুখ। কপালের ওপর দিয়ে তেল-চুপচুপে পাতা-কাটা চুল। বেশ আঁটসাঁট পুষ্ট শরীর। ভারী পায়ের গোছ। সাদা থান আর সেমিজ প'রে পাড়া দিয়ে কাজে-অকাজে ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে বেড়াত। মনে হতো কাম যেন টস্‌টস্ ক'রে গড়িয়ে পড়ছে দেহ দিয়ে। আমি দেখেছি, অনেকেই কেমন একটা ইচ্ছে-ইচ্ছে চোখ ক'রে তা'র দিকে তাকিয়ে থাকত। বেশ ছিল তরুবালা। নিরাপদর আশ্রয়ে খাচ্ছিল-দাচ্ছিল, কাজকর্ম করছিল আর পাড়ার লোকের চোখ খারাপ (অথবা ভাল) করছিল। কিন্তু তরুবালা বেশ থাকতে চায় নি। ওর ক্ষিধে ছিল, অভাব ছিল। তরুবালা কামকামী ছিল। সে অনেক টাকা-পয়সা, অনেক সুখ, আরাম চেয়েছিল। সে যে কোথায় ভেসে যেত অথচ তার বদলে একটা নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে, খেয়ে প'রে বাঁচছে এতে সে খুশী ছিল না। তা'র মনে হয়েছিল, তার আবশ্যক এখনো ফুরোয় নি; যথেষ্ট সে পায় নি। তরুবালা সমুদ্র হ'তে চেয়েছিল। তাই একদিন ও পালিয়ে গেল।

সানসাইন ইলেকট্রিক কোম্পানীর ফিটার মোহন, (পুরো নাম ছিল মোহনবাঁশী দাস) ওকে লোভ দেখিয়েছিল। অনেক টাকায়-পয়সায় এবং আরামে থাকবার লোভ। রাজরাণীর মতো থাকবে; রেঁধে, ঝিগিরি ক'রে হাড় কালি করতে হবেনা। তরুবালাও এমন বোকা যে, মোহনের কথায় পুরোপুরি বিশ্বাস করেছিল। রাজরাণী হবার যে ওর কোন সংগতি নেই এবং মোহনেরও তা'কে সুখ ও আরামের গরমে রাখবার শক্তি নেই একথাটা সে বোঝে নি।

ওর সংগেই বেশী গুজগুজ ফুসফুস করত, দেখতাম। কিন্তু তখন কেউই বোঝে নি যে ওরা চুপিচুপি অমন ভয়ংকর মতলব আঁটছে। তবে মোহন ওকে সুখ দিয়েছিল, আরাম দিয়েছিল প্রায় রাজরাণীর মতো। কথা রেখেছিল। কিন্তু মাত্র একদিনের জন্যে। তাও পুরো নয়, কয়েক ঘণ্টার পরেই ওদের সুখের স্বর্গ পুলিশের উপদ্রবে ছারখার হ'য়ে যায়।

নিরাপদর বাড়ীতে পুলিশ এসেছিল তরুবালার খোঁজ করতে। আমি আর গৌর লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের সংগে গিয়েছিলাম। শিকদার-বাগানের পেছন দিকে একটা বাড়ীর একতলায় একখানা ঘর নিয়েছিল মোহনবাঁশী। পুলিশ গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল। তখন হেমন্তকাল। বিকেল থাকতে থাকতে রোদটা পড়ে যায়। একটা শিরশিরে হাওয়া দেয় আর হাত পায়ের চামড়ায় টান ধরে। দরজায় ধাক্কা দিল পুলিশ। বেশ কিছুক্ষণ পরে মোহনবাঁশী এসে দরজা খুলল। তা'র চুল এলোমেলো, চোখ লাল। একটা আণ্ডার-ওয়্যার পরা। অত লোক আর পুলিশ দেখে সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ওকে সরিয়ে ভেতরে ঢুকল পুলিশ। তরুবালা শু'য়ে ছিল। নতুন তোষক আর লেপে শু'য়েছিল। পুলিশ দেখে ধড়মড় ক'রে উঠে পড়ল। কাপড় নেই, শুধু শায়া পরা। গোলাপী সাটিনের নতুন শায়া। গায়ে ভেল-ভেটের নতুন ব্লাউজ। বোতাম পর্য্যন্ত লাগান ছিল না। তরুবালার শাদা এবং উঁচু বুক দু'টি স্বতন্ত্র এবং আশ্চর্য জীবের মতো উঁকি মারছিল। এক গা গয়না; গিলিটির কি সোনার তা' জানিনা। ঘরময়

ভুরভুর করছে গন্ধ। একপাশে নতুন তোরঙ্গ, গোলাপফুলের ছাপ দেওয়া টিনের সুটকেশ, জলের কুঁজো। কুলুঙ্গীতে একটা নতুন আয়না, বুরুশ, চিরুনী। একদিকের দেওয়ালে একটা ব্র্যাকেটে শাড়ী, ধুতি আর পাঞ্জাবী ঝুলছে। পাঞ্জাবীতে সোনার বোতাম লাগানো। ঘরের আরেক কোণে তরুবালার বৈধব্যের সাজ; থান আর সেমিজ মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। এবং জলের কুঁজোর কাছেই 'শিক্ষক-ছাত্রী মিলন-রহস্য' নামে একটি চটি বই পড়ে আছে—পোর্ণোগ্রাফীর বই।

পুলিশ ওদের দু'জনকেই ধরে নিয়ে গেল। যাবার সময় তরুবালার কি হাউহাউ ক'রে কান্না! বেচারী তখন উপলব্ধি করেছে যে, কতবড় ভুল কাজ সে করেছে। আরামে থাকার লোভে কতবড় বিপদ ডেকে এনেছে নিজের। মোহনবাঁশীকে সে কেঁদে কেঁদে অভিসম্পাত দিতে লাগল। মিথ্যে প্রতারণায় তা'কে ভুল স্বর্গে এনেছে ব'লে।

মোহনবাঁশি যে দোকানে কাজ করত সেই দোকানের মালিক সদাশিব রক্ষিতের বাড়ী থেকে বাক্স ভেঙে ও টাকা-পয়সা, গয়না চুরি ক'রে এনেছিল। বোকা বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারেনি যে, ও নিশ্চয়ই ধরা পড়বে, ওর সুখ ভোগ করা হবে না। কিংবা হয়ত বুঝতে পেরেও নির্বোধ হয়েছিল। ভোগ্য পদার্থ পেয়ে কামকামী হবার নেশায় ওর বিবেচনা আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছিল। তাই, একরোখা তেজী ঘোড়ার মতো হ'য়ে গিয়েছিল মোহনবাঁশী! ওরা দু'জন। ঘটনাটা আমার মনে বসে গিয়েছিল সেদিন। ঘটনার অন্য অন্য দর্শকের মতো আমি হাসি নি। এর রসাল দিকটায় মজে আমার যৌনকামিতাকে সন্তুষ্ট করতে চাই নি। আমি মানুষের প্রবৃত্তি দেখে অবাক হয়েছিলাম। ক্ষিধের বহর দেখে এবং ক্ষমতার বাইরে লোভী হবার দুর্বার দুর্বলতা দেখে। ঘটনার ট্র্যাজেডীটুকু আমার মনকে গভীরভাবে ছুঁয়েছিল। আমি তার থেকে অনেক শিক্ষা পেয়েছিলাম। আসলে বাবার বৈরাগ্য বয়স হবার সংগে সংগে আমার মনকেও আবৃত করছিল ধীরে ধীরে। ঘরের রোদকে একটু একটু ক'রে ছায়া যেমন ঘিরে ধরে, তেমনি।

তাই, মীনাক্ষি যখন আমার ক্ষিধে এবং অভাববোধকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আগুনের মতো গন্‌গনে ক'রে তুলতে চাইল আমি তখন অসহায় বোধ করলাম। আমি বললাম, 'আমি তা চাই না। যশ, অর্থ আমার কাজের সংগে সংগে স্বাভাবিকভাবে যা' আসে আমি তা'তেই খুশী। তার জন্যে আলাদা ক'রে আয়োজন করতে পারব না। আমি যা' পাচ্ছি তা'তেই সন্তুষ্ট। আমার মনের চাহিদা মিটছে, পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার প্রয়োজনীয় রসদ পাচ্ছি। আর কি দরকার!'

কিন্তু মীনাক্ষি তা'তে সন্তুষ্ট ছিল না। সে চাইছিল আমি বড় বড় লোকেদের দ্বারস্থ হই, উঁচু উঁচু সমাজে। তাদের সংগে মিলি-মিশি, পাঁচটা সাজানো সাজানো কথা বলি, মেপে মেপে খুক্ খুক্ ক'রে হাসি, টেনে টেনে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে শেষ বাক্যের ওপর চাপ দিয়ে কিছু বিদগ্ধ আলোচনায় অংশ নেই, পরিবেশের মান রাখতে মৃদু ক'রে একটু মদ্য সেবন করি তারপর কায়দা ক'রে নিজের কথা পেড়ে কাজ বাগিয়ে নিয়ে আসি। দরকার হ'লে সবরকম প্রভাব, প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়েও পথ পরিষ্কার করা দরকার আমার, মন্ত্রীমহলের কাছা-কাছি ঘোরাফেরা করা দরকার। তাছাড়া, এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, বাইরের নানা জায়গায় মুহুর্মুহু সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি-দল যাচ্ছে ফাঁক বুঝে তার একটার পাণ্ডা হ'য়ে পড়তে পারলে কত সুবিধে!

মীনাক্ষি যখন এসব কথা বলত আমাকে, তখন অত্যুৎসাহে ওকে কিরকম অবসন্ন দেখাত! দেখে আমি অবাক হতাম। আমি বুঝতে চেষ্টা করতাম ওর মধ্যে এই সব নেশা হঠাৎ ঢুকল কেমন ক'রে। তারপর নিজেই বুঝতে পারতাম যে, অবস্থার তারতম্য মানুষকে আশাবাদী ক'রে তোলে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুই পাওয়া হয় না ততক্ষণ মানুষের মনে আশাটাশাগুলো মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকে মৃতপ্রায় জন্তুর মতো, হতাশা, বেদনার গুরুভার তা'কে থেঁৎলে রাখে; বিশেষ ঘাড় তুলতে দেয় না। কিন্তু যেই একটু পাথরটা সরলো, একটু তারতম্য হলো অবস্থার অমনি মানুষ সেই সিঁটকে-থাকা জন্তুটাকে প্রস্তুত করতে থাকে তারপর রাস্তা আরেকটু ফাঁকা দেখলেই কসে চাবুক চালায় তার

পিঠে; তাকে ছোটায়। এত ছোটায় যে কোন কিছুই দেখতে পায় না, না নিজেকে, না পথের বাধাকে। তখন কোন কিছুকেই আর অন্যায় বোধ হয় না। সব সময় ছুটে চলার নেশায় নিজেকে ব্যস্ত রাখে। তখন পথের ধুলো পড়ে। পুরু হ'য়ে ধুলো জমে বিবেকের ওপর। একটা ভারী স্তর রচনা করে। তার তলায় চাপা পড়ে যায় বিবেক, বুদ্ধি। থাকতে থাকতে অনেকদিন পর সেটা আর কাজ করে না। তারপর একদিন সেটা মরেই যায়।

মীনাক্ষি যখন আমার কাছে প্রথম এসেছিল তখন ওর মধ্যে এই উচ্চকিত আশা ছিল না, একটা সদিচ্ছা ছিল। আস্তে আস্তে সেটা বেড়েছে। এখন ও নিজেকে ছোটাতে চায় সংগে সংগে আমাকেও। তাছাড়া, নিজেকে মূল্যবান ক'রে তোলার এবং বাইরের প্রসাদে স্ফীত হবার ইচ্ছেটা ওর রক্তে আছে। দিল্লীতে অনুষ্ঠান করতে আসবার পর সেটা আকার পেল। অনুষ্ঠান খুব সাফল্য পেয়েছিল, ভাল লেগেছিল লোকের। বেশ টিকিট বিক্রী হয়েছিল। একদিনের জায়গায় দু'দিন করতে হলো।

প্রথম রাত্তিরে অনুষ্ঠানের শেষে মীনাক্ষি একজনকে ভেতরে নিয়ে এল আলাপ করাবার জন্যে। ভদ্রলোকের নাম ভুবনেশ্বর সহায়। বিহারের লোক। সংগীত-নাটক-আকাদামীতে আছেন। ছিপছিপে, আধময়লা চেহারা, পরিষ্কার ক'রে দাড়ি-গোঁফ কামানো। বয়স কত হবে বলতে পারি না; সম্ভবত বত্রিশ থেকে ছত্রিশের মধ্যে। গলাবন্ধ কোটপ্যান্ট পরা আর চুলটি পরিপাটি ক'রে আঁচড়ানো। না, মাথায় গান্ধী টুপি ছিল না। ভদ্রলোক প্রথমেই অযাচিতভাবে তাঁর স্মিত হাসি উপহার দিলেন আমাকে তারপর বললেন, 'আপনার আজকের অনুষ্ঠান খুব ভাল হয়েছে'। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনি একটা চেআরে বসলেন। মীনাক্ষি তাঁর জন্যে একটু বেশী তৎপর হ'য়ে রইল। ভদ্রলোক যা বলেন, প্রায় সব কথাতেই সে হ্যাঁ-হ্যাঁ করে। সেটা আমার ভাল লাগল না।

একথা-সেকথার পর ভদ্রলোক বললেন, 'খুবই দুঃখের ব্যাপার যে,

টেগোরের পর বাংলাদেশে আর কম্পোজিট কালচার সৃষ্টি হ'তে পেল না।'

মীনাক্ষিও তাঁর সংগে দুঃখ প্রকাশ করল।

আমি বললাম, 'আপনি রবীন্দ্রনাথ জানেন?'

ভদ্রলোক ভীষণ অবাক হ'য়ে একবার মীনাক্ষির মুখের দিকে আরেকবার আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। তারপর যেন অত্যন্ত বেদনার্ত হ'য়ে বললেন, 'হোআই, হি ওয়াজ এ গ্রেট পোয়েট।'

আমি হাসলাম, বললাম, 'শুধু ওইটুকু জেনেই কি বাংলাদেশের বর্তমান কালচার সম্বন্ধে শেষ কথা বলা চলে? তার ইম্‌প্যাক্টটা বোঝা যায়?'

তিনি বেশ একটু বিরক্ত হ'য়েই বললেন, 'আপনি যা-ই বলুন না কেন বাংলাদেশের কালচার এখন ডাইং কালচার। যামিনী রায় নিজের পুরনো আঁকা নিজেই নকল করেন, তারাশঙ্কর ব্যানার্জি, শরৎচন্দ্রের উন্নত সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নন্। আর আধুনিক কবিদের কথা বাদ দিন। সব কিছু নিয়ে বাঙালীদের হৈ-চৈ করা স্বভাব বলে তাঁরা নিজেদের সৃষ্টিতে তৃপ্ত থাকতে পারছেন।

আমি আবার হেসে বললাম, 'তবে আর কি বাংলাদেশের সব কথা তো' আপনার জানা হ'য়ে গেছে, হিসেবনিকেশ সবই সেরে ফেলেছেন। প্রত্যক্ষভাবে কিছু অবহিত না হ'য়েও। আমাদের দেশের বুর্জোয়া সমাজের স্নবদের মজা হচ্ছে, তা'রা না জানে মাতিস-পিকাসো, না জানে যামিনী রায়-নন্দলাল অথচ নিজেরা এদের সম্বন্ধে শেষ মতামতটুকুও দিতে ছাড়েনা, আশ্চর্য! তবে আপনাদের কথা ধরিনা, আপনাদের জন্যে সত্যি দুঃখ হয়, বাংলা সম্বন্ধে কত কম জেনেও আপনারা নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে আছেন ব'লে। তারাশংকর ব্যানার্জির কথা বলছিলেন না, তিনিই বোধহয় আধুনিক ভারতের একমাত্র ধ্রুব ঔপন্যাসিক। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে একটি নিজস্ব পরিমণ্ডল আছে, একটি নিজস্ব পৃথিবী। যা' পৃথিবীর মহৎ সাহিত্যিকদের মধ্যে থাকে। তলস্তয় রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলেও ফক্‌নার ইত্যাদিতে যার উপস্থিতি আপনি

লক্ষ্য করবেন। আপনি হয়ত এসব জানেন না। কারণ আপনি তারাশংকর পড়েন নি। তবে হ্যাঁ, বাংলার কবিদের বাদ দেওয়াই উচিত। সুধীন্দ্র, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব বাবুরা কেন যে ভারতমাতার জয় আর রঘুপতি রাঘবের প্রশস্তি গেয়ে কবিতা লেখেন নি, সেটাই খুব আশ্চর্যের ব্যাপার।'

আমার কথায় ভদ্রলোক ভীষণ রুষ্ট হলেন। তিনি রাগে গরগর করতে করতে চেআর ছেড়ে উঠে পড়লেন, মীনাক্ষিকে বললেন, 'চলুন মিস চ্যাটার্জি।' মীনাক্ষি আমাকে অনেক বাধা দিয়ে অবস্থাটাকে সরল করতে চেয়েছিল কিন্তু ভদ্রলোকের কথার ধরণে আমি নিজেকে সামলাতে পারি নি, হয়ত একটু ছেলেমানুষ হ'য়ে পড়েছিলাম। যাবার সময় ভদ্রলোককে বললাম, 'আপনি কিছু মনে করবেন না। দেশ স্বাধীন হবার পর বাঙালীরা হঠাৎ আপনাদের কাছে নানা দিক থেকে এত অপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে কেন, কোন্ অপরাধে, তা' জানি না। প্রায় সর্বত্রই একটা বিদ্বেষ ফুঁসে ফুঁসে উঠছে যেন। কিন্তু আপনাদের মুখ আর ক্ষমতা আছে বলেই কি এমন ক'রে বলা উচিত? উচিত নিজেদের ধারণা সম্বন্ধে এত বায়াস্ট হওয়া?'

ভদ্রলোক কিছু বললেন না, শুধু নমস্কার ক'রে বেরিয়ে গেলেন মীনাক্ষির সংগে।

পরের দিন সকালে মীনাক্ষির বাড়ী গিয়ে দেখি তা'র মুখের চেহারাই বদ্‌লে গেছে! অস্বাভাবিক ভারী আর কপালটা তখনো বিরক্তির ভংগীতে কুঁচকনো। আমি বললাম, 'গতরাত্রের ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিলনা, ভদ্রলোক নিজেই অবস্থাটা ইনভাইট করলেন।'

মীনাক্ষি বলল, 'তোমার পোলাইট হওয়া উচিত ছিল।'

আমি বললাম, 'তোমার কথা ভেবে হ'তে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু উনি এমন উল্টো-পাল্টা কথা বলতে আরম্ভ করলেন যে না বলে উপায় ছিল না, না বললে অন্যায় হতো। আমি তো' তোমার মতো সব বিষয়ে হ্যাঁ-হ্যাঁ করতে পারি না, মিথ্যে জেনেও। কি অদ্ভুত বদলে গেছ তুমি?'

মীনাক্ষি চেআর ছেড়ে লাফিয়ে উঠল প্রায়। বলল, 'তোমার এই কথার এবং গত রাত্রের ব্যবহারের প্রতিবাদে আমি আজকের শো'য়ে যাব না'। মীনাক্ষি গটগট্ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বলতে চাইলাম, একটা সামান্য ব্যাপারে তুমি অমন করছ কেন? কিন্তু মীনাক্ষি শুনল না। তা'কে এত দুর্বিনীত হ'তে এই প্রথম দেখলাম আমি।

সেদিনকার অনুষ্ঠানের শেষে ছোট্ট একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। আগুন ধ'রে গিয়েছিল ভেতরে। বেশী কিছু হবার আগেই অবশ্য আগুনটাকে নিভিয়ে ফেলতে পারা গিয়েছিল কিন্তু একটা পাখোয়াজ আর হারমোনিঅমকে রক্ষা করতে গিয়ে আমার ডান হাতটা পুড়ে যায়। সেই হারমোনিঅম, সরস্বতী যেটা কেনবার জন্যে টাকা দিয়েছিল্ আমায়।

মীনাক্ষি সেদিন সত্যিই এল না। রাত্রে হোটেলে গিয়ে খবর নিয়ে এল, হাত কেমন আছে ইত্যাদি। আর বলল, পরের দিন ওদের বাড়ীতে কিছু লোককে ডাকা হয়েছে। বাবা মেয়ে দু'জনেই এ ব্যাপারে উদ্যোগী। আমি যেন নিশ্চয় ক'রেই উপস্থিত থাকি।

আমি তখনই জানিয়ে দিলাম, আমার পক্ষে যাওয়া বোধহয় সম্ভব হবে না। আমি শীগগির শীগগির কলকাতায় ফিরে যেতে চাই। আমার শরীর এবং মন দুই-ই খারাপ।

আমি যাইনি পরের দিন। মীনাক্ষিও এলনা আমার খবর নিতে। ওকে আমি ফোন করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কবে আমরা দিল্লী ছাড়ব।' মীনাক্ষি বলল, 'তোমরা চলে যাও, আমি এখন যাচ্ছিনা।' আমি বললাম, 'কেন?' ও বলল, 'আমি ভাবছি নিজেই একটা ট্র্প করব, সহায় আমায় সাহায্য করবে বলেছে।'

আমি ফোন ছেড়ে ছুটে গেলাম ওর বাড়ীতে। বেয়ারার কাছে শুনলাম ও ওপরে আছে। আমি ঘরে ঢুকে দেখলাম খাটে শু'য়ে শু'য়ে কি যেন পড়ছে মীনাক্ষি। মাথার কাছে টেব্ল ল্যাম্প জ্বালানো, দিনের বেলাতেও। আমি যেতেই ও সসংকোচে খাটের ওপর উঠে বসল,

কাপড়ের এলোমেলো ভাবকে তাড়াতাড়ি কাটিয়ে তুলল। পায়ের দিকের কাপড়টা টেনে দিল গোড়ালী পর্যন্ত।

আমি ওর এই পরিবর্তনটুকু লক্ষ্য করলাম। ও আমার সংগে একটিও কথা বলল না। আমিই বললাম, 'হঠাৎ সব কিছু বদ্‌লে ফেলার চেষ্টা কেন জানতে পারি?'

মীনাক্ষি এতক্ষণে আমার দিকে সোজা হ'য়ে তাকাল, বলল, 'কিন্তু তার আগে কালকে না-এসে আমাকে এবং বাবাকে এমন অপদস্থ করার কারণটা বলবে কী?'

আমি বললাম, 'মীনাক্ষি আমি তো' তোমায় আগেই বলেছিলাম আসতে পারবনা। এসব হট্টগোল আমার ভাল লাগে না। আমি প্রাণ থেকে এসবের কিছুই সাড়া পাইনা। তুমি বল, তুমি আমাকে ভালবাস কিন্তু আমার এইসব অনুভূতিকে, ভালো লাগা না-লাগাকে তুমি সম্মান করনা কেন? ভালবাসাটা কী শুধু পরস্পরের সান্নিধ্যেই গড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে?'

মীনাক্ষি খাট ছেড়ে উঠে বলল, 'হ্যাঁ, আমিও সেটা বুঝতে পারছি কিছুদিন; কেবল কাছাকাছি থাকলেই ভালবাসা জন্মায় না। এই দেখনা, আমরা এতকাল নির্বোধের মতো ভেবে আসছিলাম যে, আমরা দু'জনে দু'জনকে ভালবাসি। কিন্তু আমাদের দু'জনের মধ্যে কত তফাৎ, সব জিনিস দেখবার ও ভাববার কত পার্থক্য! হ্যাঁ আমি চাই লোকজনের সংগে মেলামেশা, অর্থ, মান, প্রতিপত্তি—এসব আমার ভাল লাগে। কিন্তু তুমি, তুমি নিজের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে থাকতে চাও, নির্জন আলস্যের বিলাসকে চাও প্রশ্রয় দিতে।'

'না তুমি একে বিলাস বলতে পারনা মীনাক্ষি, এটা আমার বিশেষ অনুশীলন, অভ্যাস। আমি এতেই শান্তি পাই। কিন্তু যাক্ এসব কথা, সত্যিই কি তুমি আলাদা দল ক'রে আমার কাছ থেকে সরে যেতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কেন?'

'তোমার সংগে থেকে আমার কোন লাভ নেই। আমি চিরকাল তোমার ইচ্ছের ছায়া হ'য়ে থাকতে চাই না। আমার নিজের একটা সম্মানজনক জীবন চাই। পরিচয় চাই। আমি কাজের মধ্যে দিয়ে নিজেকে খুঁজে পেতে চাই, কারো অধীনতায় নয়।'

আমি বললাম, 'অধীনতা! ভালবাসা কি অধীনতা?'

মীনাক্ষি বলল, 'ভালবাসা শুধু একপক্ষের বিবেচনায় গড়ে ওঠে না। অন্যজনের সহানুভূতি এবং বিবেচনা না থাকলে সেটা অধীনতা হ'য়ে পড়ে বৈকি!'

'বেশ তো', তুমি আলাদা দল কর, নিজে বিকশিত হও, আমার ইচ্ছাপূরণ হ'য়ে থাকতে হবেনা তোমাকে, কিন্তু তা' বলে আমাদের সম্বন্ধটাকে বাতিল করতে চাও কেন?'

'না, তা' হয়না শোভন। তোমার আমার মধ্যে বহু গরমিল, স্বভাবের এবং প্রকৃতির গরমিল। ভালবাসা দিয়ে তা' ঢাকা যায় না। একদিন আমিই বলেছিলাম, তোমার আর আমার মধ্যে মিল আছে অনেক ব্যাপারে। আজ আমি নিজেই সেকথা প্রত্যাহার করছি। ভালবাসাকে প্রতিদিনের, প্রতিমুহূর্তের পরীক্ষায় না-ফেললে তার শক্তি টের পাওয়া যায় না। আমি তোমায় ভালবেসেছি সত্যি, হয়ত আজও বাসি কিন্তু শোভন আমি ভবিষ্যৎ-দুর্ঘটনা এড়াতেই তোমাকে বলছি আমাদের সরে যাওয়া দরকার। কেননা, ভালবাসা এমনই একটা মহৎ এবং পবিত্র জিনিস যা নিত্যদিনের তুচ্ছে, সংঘর্ষে, ব্যক্তিগত রুচি-অরুচির আবহাওয়ায় শুকিয়ে ওঠে, মলিন হয়। এটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে তোমার একটা নিজস্ব নীতি আছে, ধারণা আছে জীবন সম্পর্কে, জীবন-পরিচালনা সম্পর্কে। তোমার মতো জোরালো না-হলেও হয়ত আমারও আছে সে রকম কিছু; হয়ত আগে যা ছিল এখন তার থেকে খানিক বদলেছে, কালের হাওয়া অনুসারে হয়ত সেটা ডিগবাজী খেয়েছে, কিন্তু কিছু একটা আছে। তোমারও রুচি আছে, ইচ্ছে আছে, কোন বিষয়ে বিশেষ মতামত আছে। আমারও যে থাকবে সেটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু দু'জনের এইসব ইচ্ছে-অনিচ্ছে, মতামত নিশ্চয়ই কোন না কোন

জায়গায় এসে মিল খুঁজে পাবে, যদি তা' না পায় তাহলে ভালবাসার ধর্ম রক্ষা করা যায় কি করে? ভালবাসার দম বন্ধ হ'য়ে আসেনা তাতে? আমি কিছুদিন ধরেই টের পাচ্ছি যে, একদিন আমাদের মধ্যে ভালবাসার ঐশ্বরিক স্পর্শটুকু ঘুচে গিয়ে হতভাগ্য মানুষের দীনতাটুকুই প্রকট করবে। তুমি তোমার মনের ভেতরে ভেতরে শক্তি খোঁজ, আমি খুঁজি বাইরে বাইরে। (এখানে মীনাক্ষি একটু বিষাদের হাসি হাসল) মিলটা হবে কোথা থেকে। না, শোভন আমরা সে দুর্ঘটনায় পড়বনা। আমরা তা'কে এড়াব। আমরা ভালবাসাকে মাথায় ঠেকিয়ে উঁচু জায়গায় তুলে রেখে দেব, পবিত্র বেদীতে। তা'কে প্রতি দিনের ব্যবহারের মালিন্যে পেড়ে আনব না।'

মীনাক্ষি থামল। একটা সোফায় এলিয়ে পড়ল অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ভংগীতে। তা'র ডান হাতটা কপালকে স্পর্শ ক'রে রইল। মুখটা একটু ফাঁক। বিস্ফারিত চোখ দু'টো ছুঁয়েই রইল আমার মুখ।

আমি বললাম, 'তাহলে, তাহলে কি তুমি বলতে চাইছ মানুষ একালে ভালবাসবে না, পারবে না ভালবাসতে? তুমি ভালবাসার অ্যাবসেন্স-তত্ত্ব প্রচার করতে চাইছ?'

'অন্তশত জানিনা, তবে না পারাটাই স্বাভাবিক হবে যুগের পক্ষে। এখনকার সব কিছুর মতোই ভালবাসাটা হাল্কা হ'য়ে গেছে, ওজন কমে গেছে। ভালবাসার ধৈর্য আমরা হারিয়েছি। নারী-পুরুষের ব্যক্তিসত্তার সংঘর্ষ আজকাল এত প্রবল হয়েছে যে, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আগেকার কালটাই ছিল ভাল। যখন মেয়েরা রাস্তায় বেরোয় নি এমন ক'রে, যখন পুরুষরা দ্বীপের মতো আলাদা আলাদা হ'য়ে থাকে নি। যখন জীবনটা ভীড়, ব্যস্ততা আর হট্টগোলের স্তূপে চাপা পড়ে যায়নি। তখন নারী পুরুষদের মধ্যে আশ্চর্য একটা আনুগত্য ছিল, বিশ্বাস ছিল এবং ভালবাসা ছিল। এখনকার মতো ভালবাসাটা তখন ছুটন্ত ট্যাক্সির কোণে, গড়ের মাঠের অন্ধকার ঝুপসীতে, কিংবা উঁচু মজলিশের বেহায়াপনায় প্রদর্শিত হতো না; ঘরের শান্তিতে, হয়তো বা অশান্তিতেও নিরুচ্চার থাকত!'

'কিন্তু তুমি যখন এত জান, আমরা যখন এত বুঝি তখন আমাদের একজনের কাছ থেকে আরেকজনের চলে যাবার দরকার হচ্ছে কেন? আমরা তো' সব এড়িয়েও ভালবাসাকে টি'কিয়ে রাখতে পারি?'

মীনাক্ষি হাসল। মাথাটা নোয়ালো একটু। ডান পা'টা বাঁ পায়ের ওপর স্থানান্তরিত করল। তারপর মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে। ওর চোখটা চক্‌চক্ করছে। মুখের হাসিটাকে অটুট রেখেই ও বলল, 'না পারি না। ওটাই মজা। ওটাই এ যুগের অভিশাপ। সব জেনে-শুনেও আমরা এখন অন্যায়-অপরাধের মাত্রা বাড়িয়েই চলেছি। দুর্ঘটনাকে এড়াতে পারছি না। হয়ত আগেকার কালের চেয়ে আমরা এখন বেশী জানি বলেই, বেশী জ্ঞানী বলেই দুর্ঘটনা থেকে নিস্তার পাচ্ছি না, নিজেদের জালে নিজেরাই জড়িয়ে পড়ছি। তাই, সব জেনে শুনেও তোমার আমার মধ্যে একদিন না একদিন সংঘর্ষ হতে বাধ্য। কারণ, আমি এনলাইটেণ্ড। আমার প্রাইড, ভ্যানিটি স্বাধীনতার আকাঙ্খা—এসব কিছুই আমি একচুল ত্যাগ করতে পারব না। তুমিও পারবে না। সমানে সমানে লড়াই হয়, সমানে সমানে কি ভালবাসা হয় শোভন? তুমি একদিন আমায় বলেছিলে না যে, আজও আমাদের চাহিদাগুলো পুরনো রীতিকে আশ্রয় ক'রে আছে। কথাটা ভুল। এগুলো নতুন রীতি। কারো কাছে, কোন কিছুতেই নতি স্বীকার না-করা, উদ্‌ভ্রান্ত উদ্যম ও আশায় ছুটে চলা এখনকার নিয়ম। আমার অক্ষমতা তুমি ক্ষমা কোর। তোমাকে সত্যি ভালবেসেছি ব'লে তোমার মন্দ আমি দেখতে চাইনা। তাই আমার সরে যাওয়াই মঙ্গল। আর কি জান, তোমাকে ভালবাসি ঠিক, কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই তার চেয়ে ভালবাসি নিজেকে। এখনকার মানুষ নিজেকে বড় বেশী ভালবাসে। নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে খুব বেশী প্রশ্রয় দেয়।'

মীনাক্ষি চুপ করল। বেলা বেড়েছে। পূবের রোদটা জানলার পর্দা টপ্‌কে ঘরের ভেতর ঢুকেছে। মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে একটি প্রণিপাতের মতো। সেই রোদের ক্ষীণ আভায় মীনাক্ষির মুখটাকেও

লাল্‌চে দেখাচ্ছে। কিংবা কথা বলার উত্তেজনায় লাল্‌চে দেখাচ্ছে কিনা কে জানে!

আমি আর কথা বলতে পারছিলাম না। আমার সব কথা যেন ফুরিয়ে আসছিল, মনের ভেতর মীনাক্ষি সম্বন্ধে আস্তে আস্তে একটা দূরত্ব বোধ জাগ্রত হচ্ছিল। একটা আশ্চর্য সংকোচ নিরুদ্যম ক'রে তুলছিল আমাকে। আমাকে কথা খুঁজতে হচ্ছিল আর ভেতরে ভেতরে খুব একটা অসহায় অস্থিরতা আমার বুকের প্রত্যন্ত প্রদেশকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে পায়চারী ক'রে বেড়াচ্ছিল যেন।

আমি বিহ্বল দৃষ্টিতে ঘরময় তাকাতে লাগলাম। প্রত্যেকটি জিনিসে অহেতুক মনোযোগের দীর্ঘতায় আমি সময় ব্যয় করতে চাইলাম। উঁচু মেহগনী খাট। সবুজ চাদর। বাঁ দিকের টিপয়ের ওপর ঢাকা-দেওয়া জলের গ্লাস। বিছানার ওপর বেড স্যুইচ। শিয়রে ঝালর দেওয়া বড় টেব্‌ল ল্যাম্প। জানলার কাছে দেওয়ালের গা-ঘেঁষে একটি টুলের ওপর রাখা এ্যাকোআরিয়াম, তার ভেতরে লাল-নীল-সবুজ আলো বসানো, মাছগুলোকে তাতে আরো অবাক ঠেকে। ঠিক তার উল্টো দিকে বড় বুকসেল্‌ফ। তাতে ইংরাজি, বাংলা অনেক বই। তার পাশেই রেডিওগ্রাম। দেওয়ালে যামিনী রায়, নন্দলাল, গগনেন্দ্রনাথ আর রবি বর্মার আঁকা একখানা ক'রে ছবি। আর এসবেরই মাঝে মানানসই ক'রে সাজানো জাপানী খেলনা, বাঁকুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া, বাঁশের তৈরী সুদৃশ্য চীনে হাত-পাখা। ওপাশে, দরজার দিকটায় কয়েকটা সোফা। তার একটিতে বসে আছে মীনাক্ষি। মীনাক্ষির ঠিক বাঁপাশে ড্রেসিং টেব্‌ল। তার গায়ে আলমারী। আলমারীর পাল্লা খোলা। হ্যাঙ্গারে টাঙ্গানো মীনাক্ষির রং বেরংয়ের শাড়ী। সবচেয়ে কোণে অপেক্ষাকৃত বিবর্ণ ও মলিন একটি টেবিলে ইলেকট্রিক ইস্ত্রি।

আমি আমার চোখের পরিক্রমা সারলাম। দৃষ্টিকে গুটিয়ে এনে মীনাক্ষির ওপর স্থাপিত করতে গিয়েই বুঝলাম ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার চোখ আবার মৃত্তিকাশ্রয়ী হলো। এই

নীরব পরিস্থিতিটুকু আমার অসহ্য ঠেকছিল। আমার অনেক যত্ন ও চেষ্টা সত্ত্বেও মীনাক্ষিকে আমি ধ'রে রাখতে পারছি না, এই বেদনাটুকুকে ভাল ক'রে উপলব্ধি করার জন্যে আমি একলা থাকার প্রয়োজন অনুভব করছিলাম। আমি মীনাক্ষির সুমুখ থেকে চলে যেতে চাইছিলাম। আমি জানতাম আমাদের অপহৃত সম্পর্কটা আর কোন দিন ফিরে আসবে না। কোন অজুহাতেই না। হঠাৎ একদিন বিনা ভূমিকায় যে-পরিচয়টা সুরু হয়েছিল, আজ পাঁচ বছর পরে সেটা হঠাৎ শেষ হ'য়ে যাচ্ছে—হ্যাঁ, বিনা ভূমিকাতেই বলতে পারি। কারণ শেষ ক'রে দেখবার দায়িত্বটা আমার ছিলনা। মীনাক্ষিই বুঝেছে এবার শেষ ক'রে দেওয়া দরকার। শেষ করার স্বপক্ষে ও যেসব কথা বলেছে আমাকে, তাতে হয়ত যুক্তি ছিল কিন্তু তাতে হৃদয় ছিলনা। মীনাক্ষি আমার হৃদয়কে কোনদিন তেমন ক'রে দেখেনি বোধ হয়। এই কথাটা মনে হবার সংগে সংগেই আমি ভাবলাম কি নির্বোধ সান্ত্বনায় আমরা চোখ বুজে থাকি, কত জীর্ণ আয়োজনে এবং কত কম পুঁজিতে আমাদের সম্পর্কের কারবার গড়ে ওঠে, আশ্চর্য !

আমি মীনাক্ষিকে বললাম, 'এবার আমি চলি।'

মীনাক্ষি তৎক্ষণাৎ আমার কথার উত্তর দিলনা। মাথা নিচু ক'রে একটু বসে রইল। তারপর চোখটা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাবে!'

ওর কথাটা আমার কানকে তেমন স্পষ্টতায় স্পর্শ করল না। আমি তখন ওর চোখের দিকে তাকিয়েছি। গভীর আগ্রহে। ওর চোখের শিরাগুলো কি একটু বেশী লাল-লাল দেখাচ্ছে ? দৃষ্টিটা একটু বেশী বিষণ্ণ আর অসহায় ? না আমাকেই তেমন কিছু দেখাচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না, তাই ওর চোখে আমার চেহারা খুঁজছি ! আমি নিজেকে সামলালাম। সব দুর্বলতার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সজাগ হলাম।

বললাম, 'হ্যাঁ। এবার তো যাওয়াই দরকার। কলকাতা ফেরবার আয়োজন করতে হবে তো!'

'বস। একটা গল্প শুনে যাও।'

'গল্প! কিসের গল্প?'

'ভালবাসার গল্প। একটি আশ্চর্য ভালবাসার গল্প।' মীনাক্ষি হাসল। আমি অবাক হলাম। কিন্তু উঠে যেতে পারলাম না। মীনাক্ষি আবার নিজের চারপাশে যেন রহস্যকে বিস্তৃত করছে।

'গল্পের কৌতূহল বজায় রাখবার জন্যে পাত্র-পাত্রীদের আসল নাম, পরিচয় দেবনা। ধর, ধর একটি মেয়ে, নাম ভাস্বতী! আর তার বাবা পরিমল চৌধুরী। পরিমল চৌধুরী উঁচু চাকরী করেন। মেয়েকে তিনি বহু যত্নে মানুষ করেছেন। ভাস্বতী তা'র মা'কে মনে করতে পারে না, কখনোই না। খুব অবেলায় তিনি পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছিলেন।' মীনাক্ষি থামল। অল্প হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'ইন্টারেস্ট্ পাচ্ছ?' আমি জবাব দিলাম না। চুপ ক'রে রইলাম।

মীনাক্ষি তা'র গল্প আরম্ভ করল।

বেয়ারা এসে কফি, এগ্-পোচ আর ভেজিটেবল স্যাণ্ডউইচ দিয়ে গেল। মীনাক্ষি কফিতে দুধ, চিনি মেশাতে লাগল। তারপর আমার দিকে বাড়িয়ে দিল একটা কাপ। খাবারের ট্রে-টা ঠেলে দিল আমার কাছাকাছি।

পরিমল চৌধুরীর পূর্ব-পুরুষরা কলকাতার আদি বাসিন্দা। পরিমল চৌধুরীর যিনি প্রপিতামহ ছিলেন তিনি নন্দকুমার, হেষ্টিংসদের কাছে যাতায়াত করতেন। তাঁদের দৌলতেই তাঁর ভাগ্য ফেরে। বেশ কিছু বৈভব তিনি তৈরী ক'রে যেতে পেরেছিলেন। অত্যন্ত দৃঢ় চরিত্রের মানুষ ছিলেন তিনি। ধর্মে মতি ছিল, স্বাজাত্যবোধ ছিল।

কিন্তু তাঁর ছেলে জয়গোপাল চৌধুরী বাবার স্বভাব এক কণাও পা'ন নি। তিনি বসে বসে সঞ্চিত সম্পদ ধ্বংস করতে লাগলেন। দু'টো বিয়ে করলেন। তবু বাইরের মেয়েদের প্রতি টান গেল না তাঁর। রোজ সন্ধ্যা হলেই ঘোড়ার গাড়ী হাঁকিয়ে, ইয়ার-বন্ধু নিয়ে জানবাজারে বাঈজী বাড়ী যেতেন, গরাণহাটায় বাঁধা একটি মেয়েছেলে ছিল, সেখানে যেতেন। ঘুম থেকে উঠেই মদ খেতেন, ঘুমোতে যেতেন মদ খেয়ে। শোনা যায় মাঝে মাঝে তিনি মদ দিয়ে কুলকুচো

করতেন, আঁচাতেন। দুই বউয়ের মধ্যে বড় বউয়ের কোন ছেলেপুলে হয়নি। বিয়ে করার পর থেকে রাত্তিরে তিনি বড় বউয়ের ঘরে ঢোকেনই নি বলতে গেলে। তবু বড় বউয়ের কাছ থেকে কোনদিন এতটুকু কম সেবা-যত্ন পান নি তিনি। ছোট বউকে বিয়ে করতে যাবার আগে তিনি বড় বউকে বলেছিলেন, 'আমি একটি মেয়ে দেখেছি আজ তা'কে বিয়ে করতে যাচ্ছি,—তোমার কোন আপত্তি নেই তো?' বড় বউ কোন কথা না-বলে হেসে স্বামীকে সাজিয়ে দিতে গিয়েছিলেন। তাই দেখে স্ত্রীর প্রতি জয়গোপালের সুপ্ত ভালবাসা হঠাৎ স্ফীত হ'য়ে ওঠে। তিনি বলে বসেন, 'আমি আর বিয়ে করতে যাব না। এবার থেকে আমি বড় বউকেই ভালবাসব।' বলেই তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করতে যান। কিছুতেই তাঁকে সামলানো যায় না। বড় বউই শেষ পর্যন্ত অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে বিয়ে করতে পাঠান স্বামীকে।

ছোট বউয়ের একটি মাত্র ছেলে হয়েছিল; সত্যগোপাল। সত্য-গোপাল ছেলেবেলা থেকেই বাড়ীর এই জঘন্য পরিবেশকে ঘৃণা করতেন। বাড়ীর অবস্থাও তখন খুব খারাপ। জয়গোপাল উড়িয়ে-পুড়িয়ে বিশেষ কিছুই আর রাখেন নি। সত্যগোপাল তাঁর বড় মা'কে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বেশীর ভাগ সময় তাঁর কাছেই থাকতেন, কিংবা তাঁর বাপের বাড়ী। পারতপক্ষে বাপের মুখ দর্শনও করতেন না। লোকে বলত সত্যগোপালের চরিত্র তাঁর পিতামহের চেয়েও শক্ত ছিল। অন্যায় তিনি নিজে করতেন না, কোন অন্যায়ের ক্ষমাও ছিল না তাঁর কাছে। শৈশব থেকেই প্রবীণের মতো গাম্ভীর্য পেয়েছিলেন। বয়স বাড়ার সংগে সংগে সেটা বেড়ে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, কেউ চট্ ক'রে তাঁর মুখোমুখী হ'তে ভয় পেত। নিজের মা-ও ছেলেকে কোন কথা সহজে সাহস ক'রে বলতে পারতেন না। বৃদ্ধ বয়সে বাপ একটু ছেলে-ছেলে করতেন বটে কিন্তু সত্যগোপাল ওসব ভ্রূক্ষেপও করতেন না। বাপের কোনরকম অসংযম আচরণের খবর পেলেই তিনি এমন চোখ ক'রে তাকাতেন যে, অত দাপটের জয়গোপাল পর্যন্ত ভয়ে কুঁকড়ে যেতেন।

সত্যগোপালই বাড়ীর হাওয়া পাল্টে দিলেন। তিনি পুরানো বাড়ী বিক্রী ক'রে দিয়ে ছোট্ট একখানি বাড়ী করলেন। সংসারে নিয়ম-শৃঙ্খলা রাখার ব্যবস্থা করলেন। নিজে লেখাপড়া শিখলেন, ভাল ক'রে আই, সি, এস পাস করলেন। কিন্তু তখনকার বহু আই. সি. এস-দের মতো ইংরেজদের জুতোর শুকতলা হয়ে রইলেন না। নাম, খেতাব এসবে তাঁর বিশেষ রুচি ছিল না। তিনি অল্প বয়স থেকেই দেশসেবা করতেন, দেশকে ভালবাসতেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। ১৮৭৪ সালে নদীয়ায় যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় তখন তিনি আপনা থেকেই এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। দেব-দেবীতে ভক্তি ছিল তাঁর কিন্তু তাতে অধিক ভাবালুতা ছিল না। একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে হয়েছিল তাঁর। ছেলে পরিমল এবং মেয়ে সুপ্রভাকে সত্যগোপাল নিজের আদর্শে মানুষ করতে চেয়েছিলেন। তেমনিভাবেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই নিয়মানুবর্তিতা শেখা, সততা শেখা, বিবেকানন্দ পড়া, রাম-মোহন পড়া—এসব ভাল অভ্যেস তিনি করিয়েছিলেন। পরিমলের মা ছিলেন অত্যন্ত ভালমানুষ এবং নিষ্ঠাবতী। স্বামীর এই শিক্ষার উৎসাহের সংগে পাল্লা দিতে গিয়ে তিনি মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে পড়লেও এর উপকারিতা, গুণাগুণ বুঝতেন। জানবার এবং শেখবার আগ্রহ তাঁরও কম ছিল না। স্ত্রীকে সত্যগোপাল রবীন্দ্রনাথের কাব্য, প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরচনা পড়ে শোনাতেন, বুঝিয়ে দিতেন। সিলভ্যাঁ লেভীর দর্শনের ব্যাখ্যাও করতেন। ছেলে-মেয়েরা এই পরিবেশে, আশানুরূপ শিক্ষা ও সভ্যতায় মানুষ হয়েছিল। বাপ-মায়ের মতো তাদের স্বভাবেও কোথাও এতটুকু ফাঁক ছিল না, ফাঁকি ছিল না। কিন্তু পরিমল তাঁর চরিত্রের একটি মাত্র দুর্বলতা দেখিয়ে ফেললেন একবার। আর, সেই দুর্বলতার জন্যেই তাঁকে সারাজীবন অসহ্য কষ্ট বয়ে বয়ে বেড়াতে হলো।

ছাত্রাবস্থায় তাঁর একবার ঝোঁক হয়েছিল, তিনি ব্রাহ্ম হবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলোয় নি। বাবাকে তিনি অত্যন্ত ভয় করতেন

এবং মা'কে সমীহ। ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করবার সময় একটি মেয়ের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। সেটি পৌঁছয় গিয়ে ভালবাসায়। অদ্ভুত সম্পূর্ণ এক ভালবাসা। অদ্ভুত পবিত্র এবং বিশ্বস্ত। কিন্তু ব্রাহ্ম হবার কথা পরিমল যেমন সাহস ক'রে বাবাকে বলতে পারেন নি, তেমনি তাঁর ভালবাসাটার কথাও জানাতে পারলেন না। এটা তাঁর কাপুরুষতা ছিল না, ভীরুতাও নয়। কি জানি কেন, হয়ত বা শিক্ষার অভ্যাসে, এক বিশেষ আদর্শে প্রতিপালিত হওয়ার জন্যে তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে পবিত্র কথাটিই তাঁর বাবা-মা'কে জানাতে পারেন নি।

তারপর পরিমল বিলেত চলে যান্। মেয়েটিকে তিনি ব'লে গিয়েছিলেন ফিরে এসে তাঁদের সম্বন্ধটাকে পাকা করবেন। অবশ্যই করবেন। লাবণ্য কিন্তু,—হ্যাঁ, মেয়েটির নাম ছিল লাবণ্য, এ নিয়ে কোনদিন কিছু বলেন নি পরিমলকে। তাঁর দিক থেকে কোন তাড়া ছিল না, প্রশ্ন ছিল না, কৌতূহল ছিল না। তিনি ভালবাসতে পেরেই খুশী, ভরসা করতে পেরেই খুশী ছিলেন।

কিন্তু পরিমল পারেন নি; বিলেত থেকে ফিরে এসেও কথাটা তুলতে পারেন নি। যখনই বলতে গেছেন তখনই বিপুল সংকোচ এসে তাঁকে ঘিরে ধরেছে। শুধু কয়েকবার বিয়ের চেষ্টাকে তিনি বহু কষ্টে প্রতিরোধ করেছিলেন।

সত্যগোপালের চেহারা ছিল বিরাট। শালপ্রাংশু বলা যায়। আর অত বিরাট শরীর ব'লে প্রথম দর্শনে তাঁর চেহারার ছাঁচটা সামঞ্জস্যহীন মনে হতো। হাত দু'টো খুব লম্বা এবং খুব শক্ত। ঢালু কাঁধের পাশ দিয়ে মোটা, গোল শিকড়ের মতো ঝুলে থাকত কিন্তু দুলত না। বড় বড় তীক্ষ্ণ চোখ, চওড়া কপাল আর গলার স্বর অস্বাভাবিক ভারী, মেঘমন্দ্র।

তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন, কেন, বিয়ে করতে চাও না কেন? পরিমল তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন, ভাল ক'রে জবাব দিতে পারেন নি। কোনরকমে শক্তিহীন কিছু অজুহাত তৈরি ক'রে পালিয়ে আসতেন বাবার কাছ থেকে।

লাবণ্য আর পরিমল বিয়ে না ক'রেও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করেছিলেন। লাবণ্যের ভয় করে নি। লোকের নিন্দা-মন্দকে কাণে তোলেন নি। তিনি জানতেন ভালবাসা খাঁটি হ'লে লোকের মতামতের অপেক্ষা করে না, কোন ষড়যন্ত্রেই তাদের হীনতা সেই মহৎ অনুভবকে ক্লিন্ন করতে পারে না। কিন্তু ভাস্বতীর পৃথিবীবাসের সম্ভাবনা যেদিন টের পাওয়া গেল, সেদিন পরিমল খুব ব্যস্ত-বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আর নয়, এবার একটা ব্যবস্থা করতে না পারলে তোমাকে চরম অসম্মান করা হবে। নিজের কাছেও আমি মহা অপরাধী হ'য়ে যাব। আর যে-আসছে সে হাস্যাস্পদ হবে জগতের কাছে।

লাবণ্য তখন থেকেই শয্যাশায়ী। তিনি বলেছিলেন, থাক্ না, এতদিন যখন কিছু না-ক'রেই চলে গেল তখন আর এসময় হঠাৎ হৈ-চৈ ক'রে, লোককে উদ্ব্যস্ত ক'রে লাভ কী! বিয়ে করাটা তো মনের এক সংস্কার ছাড়া কিছু নয়, একটা প্রথাকে মেনে চলা মাত্র। আমরাও কি তা'কে কাটাতে পারব না? আমাদের সম্পর্কে কি ততটা জোর নেই যাতে আমরা সেই নিয়মের দাস হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারি? এত অসহায় এবং দুর্বল আমাদের ভালবাসা যে কয়েকটি স্বাক্ষরের জন্যে তা'কে অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে? আর, আমার সন্তানের কাছে তুমি যদি আমাকে সম্মান না দাও, আমার ঠিক ঠিক পরিচয় দিতে ভোল তাহলে জগতের সব লোক, সব আদালত এবং বহু সই-সাবুদেও কি তার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারবে?

পরিমল আর কিছু বলেন নি বটে কিন্তু খুবই আত্মদহন অনুভব করতেন। অত্যন্ত নীতিপরায়ণ ও শৃঙ্খলাপরায়ণ বাবা-মা'র কাছে থেকে থেকে তাঁর স্বভাবটা হয়েছিল খুঁতখুঁতে, ন্যায়-অন্যায় বোধটা ছিল প্রবল। তাই জীবনে তাঁকে অনেকেই ভুল বোঝার সুযোগ পেয়েছে। তিনি নিজেও সকলের কাছে স্বস্তি পান নি।

ভাস্বতী জন্মাবার পর লাবণ্য বেশীদিন বাঁচেন নি। তাঁর একলামসিআ হয়েছিল। বেশ কষ্ট পেয়েই মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু

পরিমল তাঁর কর্তব্য ভোলেন নি। মেয়েকে তিনি অত্যন্ত যত্নে এবং আদরে মানুষ করেছিলেন। একটু উপযুক্ত হ'তেই তা'র মা'র কথা বলেছিলেন। তাঁদের অদ্ভুত সম্পর্কের কথাটাও খুলে জানাতে ভোলেন নি। লাবণ্য যে কত উদার ছিলেন, তাঁর ভালবাসায় যে কতখানি বিশ্বাস ছিল মেয়েকে সব বলেছিলেন তিনি। বলতে বলতে নিজেই অভিভূত হয়েছেন, আশ্চর্য উৎসাহে মেয়ের মনে মা'র সম্বন্ধে নেশা ধরাতেন তিনি, রূপকথার মতো। ভাস্বতীকে প্রায়ই বলতেন, মা'র মতো হও, মা'র মতো হও। আমার মতো নয়! আমার মধ্যে তাঁর অনেক গুণই নেই। হ্যাঁ, তিনি আমার চেয়ে বড় ছিলেন। অনেক বড়।

বলতে বলতে তাঁর গলা ধ'রে যেত, অমন যে শক্ত মানুষ তাঁর চোখও লাল হ'য়ে উঠত।

ভাস্বতী এখন বড় হয়েছে। সে একেবারেই একালের মেয়ে। তা'র মা'র মতো সে হ'তে পারে নি, চেষ্টা করেও না। মা'র মতো অত ভরসা ক'রে ভালবাসার শক্তিও সে পায় নি। তাঁর পুঁজি খুবই অল্প। সে নিঃস্ব। একান্তভাবেই হৃদয়ের নিঃস্বতায় ভুগছে সে। তাই সে চায় মানুষ যেন তা'কে ক্ষমা করে, তা'র অবস্থা বুঝে দয়া করে তা'কে।

মীনাক্ষি তা'র গল্প থামাবার পর একটা ঝিমঝিমে শব্দ ঘরের ভেতর ঘুরে ঘুরে আমাদের ক্লান্ত করতে লাগল। কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারি নি। তারপর মীনাক্ষি ঘাড় তুলে আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগল, গল্প?'

আমি বললাম, 'তুমি একে আশ্চর্য ভালবাসার গল্প বলছিলে কেন? আশ্চর্য তো নয় খুবই স্বাভাবিক। এই-ই হওয়া উচিত। লাবণ্য এবং পরিমল সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। কিন্তু তাঁদের মেয়েকে আমার একটা কথা বলবার আছে।'

মীনাক্ষি আমার দিকে তাকাল। তা'র চোখে জিজ্ঞাসা।

আমি বললাম, 'ভাস্বতী নিজেকে জানে না। তাই সে অকারণ

ভয় পাচ্ছে। ভালবাসার শক্তি তা'রও কম নেই। সে চেষ্টা করলেই সুখী হ'তে পারবে।'

মীনাক্ষি কোন কথা বলল না কিন্তু মাথা নিচু ক'রে 'না'র ভংগীতে ঘাড়টা নাড়ল কয়েকবার।

আমি কয়েক মিনিট স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলাম তারপর কঠিন নীরবতাটা যখন ভার-ভার ঠেকতে লাগল তখন বললাম, 'চলি!'

মীনাক্ষি বলল, 'আমাকে তুমি ক্ষমা কোর।'

আমি হাসতে চেষ্টা করলাম।

'যদি কোনদিন জীবনের প্রয়োজনে তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়াই, তাড়িয়ে দিও না।'

আমি কোন জবাব দিলাম না।

'আমার জন্মের ব্যাপারেই কত গলদ আছে, দেখলে তো?'

আমি বললাম, 'ওটা আমার না জানলেও চলত। তাতে তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণার কিছু অদল-বদল হতো না। তবে জেনে ভাল হলো, তোমার বাবা, বিশেষ ক'রে মা-কে শ্রদ্ধা করতে শিখলাম।'

'আমি নিরুপায়।'

'তুমি ইচ্ছে ক'রেই করলে মীনাক্ষি।'

'আমি একটা ভবিষ্য-দুর্ঘটনা এড়াতে চাইলাম।'

'না, তুমি নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাইলে।'

আমি চলে এলাম। আর কোনদিন ফিরে যাব না জেনেই চলে এলাম মীনাক্ষিদের বাড়ী ছেড়ে। জীবনের আরেকটি মহৎ উপকরণ এমনি ক'রেই শেষ হ'য়ে গেল। আশ্চর্য, মহৎ উপকরণেরা কেন বেশী দিন থাকে না, বহু যত্নের আয়োজন কেন অকস্মাৎ ফুরিয়ে যায়,—আমি সেটা বারংবার ভাবতে চেষ্টা করেছি আর ছেলেবেলার কথা মনে পড়েছে। ছেলেবেলায় দুর্গাপূজোর ভাসানের পর বরাবর আমার মনটা ভীষণ খারাপ হ'য়ে যেত। কয়েকদিনের চেষ্টা, আলো, হাসি, গান, বাজনা, কোলাহলের পর যখন সন্ধ্যাবেলায় প্রতিমা বিসর্জন দিতে চলে যেত সবাই তখন খালি মণ্ডপটার দিকে তাকিয়ে কান্না পেত

আমার। মণ্ডপ অন্ধকার। বেদীটা খালি। বেদীটা ভেঙে পড়ছে। শুক্‌নো ফুল, বেলপাতা গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। হয়ত একটা ঘট উল্টে পড়ে আছে। হয়ত একটা কুকুর সুযোগ খুঁজে ফিরছে। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বুকটা আমার ভারী হ'য়ে যেত। বাড়ীতে ঢুকে বারবার অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়তাম। দূর থেকে ঢাকের বাজনা ভেসে আসত ; রাত্তিরের অন্ধকারে, হাওয়ায় হাওয়ায়। আমার বুকটা ঢিবঢিব করত। একটা অস্বস্তি আঁচড়ে আঁচড়ে বেড়াত।

কলকাতায় ফিরে আমি অকেজো হ'য়ে গেলাম। কোন কিছুতেই মন বসাতে পারি না। জোর পাই না। একলা থাকতে ভালবাসি।

এই সময় ললিতা বউয়ের কথা মনে হ'তে লাগল খুব, আর বাবার কথা। মীনাক্ষিকে একদিন আমি এঁদের মতো বিশ্বাস করেছিলাম, ভরসা করেছিলাম। সে বিশ্বাস আর ভরসা আমার রইল না। তা'কে আমি দোষ দিলাম না কিন্তু ব্যর্থতার গ্লানি, ভুল করার ক্লান্তি আমাকে অহরহ পীড়িত করতে লাগল।

সরস্বতী আমাকে একটি কথাও জিজ্ঞেস করে নি। সে মুখ দেখেই বুঝেছিল কোথায় আমার বিপদ হয়েছে। মীনাক্ষির সম্বন্ধে সে কোনদিনই গোলমাল করতে ভালবাসে নি। আমাদের সম্পর্কটাতে তা'র বিরাগ ছিল না কিন্তু আগ্রহও ছিল না তেমন বেশী। তবে মীনাক্ষির সংগে তা'র ব্যবহারে কখনো এতটুকু অসন্তোষ লক্ষ্য করি নি।

দিল্লী থেকে হাল ভাঙা পাল ছেঁড়া ব্যথা নিয়ে ফেরবার পর সরস্বতী যেন বেশী ক'রে আমার যত্ন নিতে লাগল। আমার খাওয়া-দাওয়া থেকে সুরু ক'রে হিম প'ড়ে ঠাণ্ডা লাগা পর্যন্ত প্রায় সব বিষয়ে ওর খেয়াল ও তত্ত্বাবধানের কড়া পাহারা রইল।

মনের অবস্থাটা এসময় অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল। কাজকর্ম একেবারেই ভাল লাগছিল না। বাড়ী থেকে বেরুতাম না। মাঝে মাঝে শুধু ভবানী দত্ত লেনে গিয়ে জ্যেঠিমার খবর নিয়ে আসতাম।

জ্যেঠিমা যেন মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতেন। আমার মনে হতো।

একলা ঘরে খাটে হেলান দিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকতেন। হাত দু'টি প্রার্থনার ভংগীতে জড়ো ক'রে কোলের ওপর নামানো। শূন্য দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত। কেউ গেলে মুখের ভাব বদলাতে সময় নিত। তারপর ঠাহর করতে পেরে বলতেন, 'কে, গৌর এলি! আয়, বড় রোগা হ'য়ে গেছিস তুই।' পরমুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝতে পারতেন। তখন চোখ দিয়ে জল নেমে আসত। তাড়াতাড়ি আঁচল চাপা দিয়ে বলতেন, 'এমন ভুল হয়েছে আজকাল! সব গুলিয়ে যায়।' তারপর নিজেই বলতেন একটু হেসে, কৈফিয়তের সুরে, 'বয়স হয়েছে তো! তবু পোড়া প্রাণটা যে কেন এখনো বেরোয় না তাও তো জানি না।'

আমি আগেই বেচু চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট-এর বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছিলাম। ওখানকার দিনে-রাতের গোলমাল আমার সহ্য হতো না। সব সময় ট্র্যাম-বাস-এর ছুটোছুটি, গোয়ালা, কালোয়ারদের হাঁকাহাঁকি, উঠ্‌তি বয়সের ছেলেদের কথায় কথায় সোডার বোতল ফাটানো, মুখ-খারাপ, হাতাহাতি স'য়ে বাস করা শক্ত হচ্ছিল আমার পক্ষে।

আমি চলে এসেছিলাম নোনাতলার কাছাকাছি। জায়গাটা তবু শান্ত। গোলমাল কম হয়। মানুষের ভীড়ও বোধহয় একটু কম।

আমি তিনতলায় থাকতাম। প্রচুর আলো, বাতাস আসত। একটা বড় ছাদ ছিল, সেটা আমিই ব্যবহার করতাম। ছাদে টব দিয়ে দিয়ে ছোটখাট একটি ফুলের বাগান ক'রেছিলাম। আমি নিজে তার পরিচর্যা করতাম, অনেক সময় সরস্বতী করত। কখনো কখনো অন্য ছেলেমেয়েরা করত, যারা গান শিখতে আসত তাদের কেউ কেউ। শ্যামবাজারের দিকেও একটা গান শেখবার ব্যবস্থা রেখেছিলাম। সেখানে হপ্তায় তিনদিন ক'রে যেতাম। আর যারা একটু বেশী টাকা দিত তা'রা আমার বাড়ীতে আসত।

কিন্তু দিল্লী থেকে ফেরবার পর কিছুই আর করতে পারলাম না। দিনের পর দিন লোকজন এসে ফিরে যায়। আমি নিজের শূন্যতাকে বাড়তে দিচ্ছিলাম। একটা ভীষণ ক্ষমতায় আমার মধ্যে বেড়ে চলেছিল

সেই শূন্যতার পরাক্রান্ত বোধটা। কাজ করছিল, অদ্ভুত কৌশলে কাজ করছিল। আমি টের পাচ্ছিলাম, আমার দুর্বলতার সুযোগে সেটা দেহ পাচ্ছিল, আকার পাচ্ছিল, ফুলছিল, ফুঁসছিল, অন্ধকারছিচ্ছিল।

বিকেলে অফিস-ফেরতা সরস্বতী আসত। সন্ধ্যে উত্‌রে গেলেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকত। আমার কি দরকার না দরকার তার সব তদারক করত, চাকরকে আগামী চব্বিশ ঘণ্টার নির্দেশ দিয়ে যেত! ট্রুপের হিসেবপত্তর থাকলে সেরে রাখত সেগুলো, তারপর আমি ওকে বাস-এ তুলে দিয়ে আসতাম। প্রায় নিয়ম হ'য়ে গিয়েছিল এটা।

গ্যাস-এর আলোর ভেতর দিয়ে হেঁটে আমরা দু'জনে গলি ছেড়ে বড় রাস্তায় আসতাম। অনেকদিনই আমাদের মুখে কথা থাকত না। শুধু আমার চটি ঘসটানোর শব্দ এবং সরস্বতীর হিল্‌তোলা জুতোর হাতুড়ি দিয়ে কাঠ-ঠোকার মতো আওয়াজ গলিপথটাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখত।

সরস্বতীর কথা বলতে পারব না, কিন্তু আমার মনে বিষণ্ণতার সংগে সংগে সহোদরার মতো একটি অজানা উদ্‌বেগ প্রতিপালিত হতো ওই সময়টুকুতে। যদি সরস্বতী হঠাৎ আমার ব্যক্তিগত আলোচনায় নামে। যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে, কেন, কেন এমন হলো, আর কেনইবা তুমি নিজেকে এইভাবে তিলে তিলে পরিশ্রান্ত করছ!

আমি জানি এসবের কোন জবাবই দিতে পারব না, দেওয়ার ধৈর্য আমার থাকবে না। তাতে আমি আরো ক্লান্ত হব। তাই, সরস্বতীকে আমি ভয় পাচ্ছিলাম।

কিন্তু সরস্বতী একদিন সত্যি সাত্যই আমায় জিজ্ঞেস করল।

সিঁড়ি দিয়ে আমার আগে আগে নাবল সরস্বতী। ওর সকালে-ভাঙা মটমটে সাদার ওপর সুন্দর ফুল-তোলা শাড়ীর আঁচলের প্রান্ত-দেশটা সিঁড়ির ধুলোয় গড়িয়ে গড়িয়ে ওর দেহকে অনুসরণ করছিল।

আমি নিচু হ'য়ে সেটা তুলে নিলাম। সরস্বতী থেমে আমার হাত থেকে নিয়ে সেটা নিরাপদে গুছিয়ে রাখল। নেবার সময় আমার সংগে চোখাচুখি হলো বটে কিন্তু আমি ওর চোখ থেকে কিছুই পড়তে পারলাম না। কোন জিজ্ঞাসা, কোন প্রত্যাশা—কিছুই না।

সরস্বতী ইদানীং খুব গম্ভীর হ'য়ে গিয়েছিল এবং অদ্ভুত একটা ব্যক্তিত্ব রচনা করতে পেরেছিল। সুন্দর হয়েছিল দেখতে। কিন্তু সে সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত হতো না, স্তিমিত হ'য়ে থাকত বিকেলবেলার রোদ্দুরের মতো। বিকেলবেলার রোদ্দুরে যেমন দুর্নিবার প্রলোভন থাকে না, আকর্ষণ থাকে না অথচ একটা আশ্চর্য অবসাদ থাকে এবং যে-অবসাদের কাছে বার বার আত্মসমর্পণ না করেও উপায় থাকে না তেমনি একটা ক্লান্তিকর সৌন্দর্য ওর শরীরকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল, আমার মনে হয়।

আমরা রাস্তায় পা দিলাম। চাঁদের আলোটা শীর্ণ। আকাশের বিস্তীর্ণ পটে তারাগুলো নেহাৎই শ্বেত বিন্দু। আকাশের প্রসাধনকে সম্পূর্ণ করবার জন্মেই যেন অসংখ্য হ'য়ে ছড়িয়ে আছে। গ্যাসের বাতিগুলো নিজেদের চারপাশেই একটা নীলাভ দ্যুতি উন্মুক্ত করেছে, রাস্তার অন্ধকারকে দূর করে নি।

আমরা একটা ডাষ্টবিনের পাশ দিয়ে, একটা ঠেলাগাড়ীর কাছ দিয়ে হেঁটে গলির মুখটায় পৌঁছে গেলাম। গলির মুখে একটা পানের দোকান। তা'তে জোরাল আলো। একটা রোগা, ময়লা গোছের মানুষ গেঞ্জী প'রে, কোলের উপর কুলো রেখে, মুখ নিচু ক'রে নিবিষ্ট মনে বিড়ি পাকাচ্ছে। বাইরের দিকে তা'র কোন হুঁশ নেই। আঙ্গুলগুলো ক্ষিপ্রবেগে বিড়ি আর সূতোয় চালিত হচ্ছে। আমি ওর দোকানের সামনে থামলাম। আমি এক প্যাকেট সিগারেট চাইলাম। সরস্বতী আমার একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিল। আমার 'এক প্যাকেট সিগারেট' চাওয়ার কথাটা শুনে পায়ে পায়ে দোকানের কাছে এগিয়ে এল সে। বলল, 'এক প্যাকেট নয়, পাঁচটা।'

আমি সরস্বতীর মুখের দিকে তাকালাম। দোকানীটি আমার এবং সরস্বতীর মুখে চোখ বোলালো। দৃষ্টিটি তা'র কিছু অপ্রসন্ন। আমি বুঝলাম, ওটাই ওর স্বাভাবিক দৃষ্টি। এক একজনের চেহারায় সেটাই বৈশিষ্ট্য দেয়। অপ্রসন্নতাটা।

আমি সরস্বতীকে আড়াল ক'রে সিগারেট ধরাতে গিয়ে দু'টো

দেশলাইয়ের কাঠি নষ্ট করলাম। আমার হাত ঘামছিল এবং কেঁপে কেঁপে যাচ্ছিল!

সরস্বতী, তা'র হাতের কাছ থেকে আঁচলটা সরিয়ে আমার মুখের সাম্‌নে মেলে একটা সাময়িক অবরোধ সৃষ্টি করল। ধরল এবার সিগারেটটা। আমি জোরে জোরে পর পর দু'টো টান দিয়ে আগুনটাকে একটু হিংস্র ক'রে নিলাম। নাক, মুখ, গলা দিয়ে গল গল ক'রে খানিকটা ধোঁয়া বেরিয়ে এল।

সরস্বতী বলল, 'অমন ক'রে টেন না, বুকে লাগবে'। আমি কোন কথা বললাম না। মাথা নিচু করে হাঁটতে থাকলাম।

পাশ দিয়ে একটা ট্র্যাম চলে গেল হেলতে, দুলতে এবং আর্তনাদ করতে করতে। ট্র্যামটা অদৃশ্য হতেই ওপাশের ফুটপাথে মাংসর দোকানটা আমার নজরে পড়ল। একটি কাঁচের ঢাকার আড়ালে ছাল-ছাড়ানো খাসী ঝুলছে। মারবার, ছাল-ছাড়াবার, এবং মুণ্ড কেটে নেবার পর অবশ্য খাসী না কি তা' আলাদা ক'রে বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু আমরা জানি, এবং মৃত ও চর্ম-উৎপাটিত খাসীকে কেমন দেখায় সে-বোধ আমাদের আছে, তাই আমি ওটাকে খাসী বলেই চিনতে পারলাম। ফতুয়া-পরা একটা লোক থাই পর্যন্ত কাপড় গুটিয়ে উবু হ'য়ে বসে আছে। তা'কে দেখাচ্ছে একটা অশ্লীল জন্তুর মতো।

এপাশের ফুটপাথে, আমার সামনে দিয়ে একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবক-যুবতী ঘন হ'য়ে হেঁটে চলে গেল। ওরা এখন প্রেম করছে। কিন্তু ওরা জানে না প্রেমের রঙীন নেশাটা সরে গেলে ওদের ওইরকম অবস্থা হবে, ওপাশের ওই ছাল-ছাড়ানো খাসীটার মতো। ওরা মরে যাবে। মানুষের সুন্দর বৃত্তিগুলো মরে গেলে মানুষ আর বাঁচে না। আমার মনে হলো।

কিছুদিন ধ'রে নিজেকেও আমার মৃত মনে হচ্ছে। যদিও আমি সেটা কাউকে জানতে দিই না। কৌশলে গোপন ক'রে রাখি। শুধু সরস্বতীকে আমার ভয়। ও যদি জেনে ফেলে কিংবা সন্দেহ করে, তাহলে আমার লজ্জা বাড়বে।

নির্দিষ্ট বাস-ষ্টপেজটা ছাড়িয়েও যখন সরস্বতী থামল না তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি, তুমি এখান থেকে উঠবে না ?'

'আরেকটু আগে থেকে উঠব, চল না।'

আমরা কবরখানার পাশ দিয়ে পার্ক ষ্ট্রীটের দিকে হাঁটতে থাকলাম। ওপাশে লোহা-লক্কড় আর কাঁসা-পেতলের থালা-বাসনের দোকানে আলো জেলে দোকানদাররা বসে বসে ক্রেতাবিহীন সময় যাপন করছে। আর, ওপাশে কবরখানার তমসায় সারি সারি মানুষ শায়িত হ'য়ে আছে। বহুকাল ধ'রে। মৃত্যুর কাছে বিক্রী হ'য়ে গেছে তা'রা। মৃত্যু তাদের বরাবরের জন্যে কিনে নিয়েছে।

আমি বারবার ওদিক-পানে তাকাতে লাগলাম। ঠিক সেই সময় সরস্বতী আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তোমার মতলব কী বলতো ? এরকম ক'রে আর কতদিন চলবে।'

আমি মুখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে বুঝতে না-পারার ভাণ করলাম। ও বলল, 'এবার কাজকর্ম কর। নইলে সব যে যাবে। আর তুমিও একটি কঠিন অসুখ বাধাবে।'

আমি অস্ফুট স্বরে বললাম 'না, অসুখ আর কি !'

'না অন্য কোন পরিকল্পনা আছে, খুলে বল না ?' সরস্বতী একটু হেসে কথাটাকে ঠাট্টার রূপ দিতে চাইল।

কিন্তু আমি ওর দিকে পরিপূর্ণভাবে তাকালাম। জিজ্ঞাসার আগ্রহে। আমার মুখে বিস্ময় ফুটল। সে বিস্ময়টুকু আন্তরিক। তা'তে কপটতা ছিল না। অন্য কোন পরিকল্পনা অর্থে কি বলতে চাইছে সরস্বতী ! কিসের ইংগিত দিচ্ছে ?

আমি বললাম, 'কি বলতে চাইছ তুমি ?'

'নিজেকে নাশ করার মতলব ভাঁজছ না কি জানতে চাইছি' সেইরকম হেসেই কথাটি বলল সরস্বতী। তারপর আমার কোন জবাবের অপেক্ষা না করেই আবার বলল, 'আচ্ছা, তুমি তো এরকম ছিলে না, এত ভাবপ্রবণ। নিজের দুঃখ-কষ্টকে তুমি তো এত প্রশ্রয় দিতে না ?'

আমি এ কথার উত্তর দিলাম না। এর উত্তর আমার নিজেরও জানা নেই। অথচ এটাও ঠিক বারংবার ধাক্কা খেয়ে আমি এখনো ধাক্কার যন্ত্রণায় কাতর হবার দুর্বলতা এড়াতে পারলাম না। পারা আমার উচিত ছিল।

গৌর হলে বলত, শোভন, এইখানে তোর সংগে আমার তফাৎ। ওই যন্ত্রণার অনুভূতিটুকুও সত্যি আবার যন্ত্রণাকে এড়ানো উচিত এ বোধটুকুও মিথ্যে নয়। এরই নাম জীবন। দিন-রাতের পার্থক্য যেমন প্রকৃতির নিয়ম, তেমনি ন্যায়, অন্যায়, ভাল, মন্দ, দুঃখ, আনন্দ— এগুলোও জীবনের নিয়ম। এর কোনটাতেই লজ্জা নেই। এর কোনটার সংগেই তোর আত্মীয়তাকে অস্বীকার করতে পারিস না তুই!

হঠাৎ গৌরের কথা মনে হ'তে লাগল খুব। অনেকদিন তা'কে দেখি নি। খুব দেখতে ইচ্ছে করল। সরস্বতীকে জিজ্ঞেস করলাম। গৌরের খবরাখবর। সরস্বতী বলল, ভালই আছে।

আমি সরস্বতীকে বাস-এ তুলে দিয়ে ফিরে এলাম। সেই পথ দিয়ে। কিন্তু সেই মন নিয়ে নয়। সরস্বতী যে ইংগিত করেছিল সেটা আমার মনে এতদিন কোন স্পষ্ট শরীর পায়নি। হয়ত সেটা নির্জীব স্বপ্নের মতো শয়ান ছিল, এখন একটু উৎসাহ পেয়ে নিজেকে মেলতে আরম্ভ করল।

আমি বাড়ীতে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে সোজা ছাদে চলে এলাম। সিগারেট ধরিয়ে অস্থির বেগে পায়চারী করতে আরম্ভ করলাম। একটু পরে সিগারেটের অনেকখানি অদগ্ধ রেখে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। চারদিক তাকিয়ে চলে গেলাম ছাদের কিনারায়।

নিজের আচরণকে আমার অভিসন্ধিমূলক এবং রহস্যময় মনে হচ্ছিল। ফলে সামান্য একটু উত্তেজনা চিন্‌চিন্ করতে থাকল বুকের ভেতর। আমি আল্‌সে ধ'রে ঝুঁকে নিচের রাস্তা দেখলাম। গভীর অভিনিবেশে পরীক্ষা করলাম উচ্চতা। তারপর পৈঠা থেকে নাবতেই সামনের নারকেল গাছটার ছড়ানো মাথা আমার নজরে এল আর প্রায় সংগে সংগেই চাকরটা নেমে এসে বলল, 'নিচে এক বাবু এয়েছেন।'

সেদিন রাত্তিরে আমি ভাল ক'রে ঘুমোতে পারলাম না। ঘুমটা কিরকম আধখ্যাঁচড়া হ'য়ে রইল আর তার সংগে বিশ্রী বিশ্রী স্বপ্ন আমার স্নায়ুকে শ্রান্ত ক'রে ফেলতে লাগল।

আমি দেখলাম, আমি একা কবরখানার ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু সেটাকে তখন আর কবরখানা ব'লে চেনা যাচ্ছে না। ছাতনার বাড়ীর পেছন দিককার সব্জীক্ষেতের মতো হ'য়ে গেছে। হঠাৎ সেই নির্জন এবং ফাঁকা ভূমিখণ্ড থেকে সারি সারি কবর মাথা তুলে দাঁড়াল। তারপর কবরের পাথরগুলো ভেদ ক'রে একে একে অনেক প্রাচীন, গলিত মনুষ্যমূর্তি উঠে আমার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। তাদের চোখ, মুখ, কাণ সবই আছে কিন্তু সবই যেন আশ্চর্যভাবে নিস্প্রাণ, গায়ের রং বদ্‌লে কৃষ্ণবর্ণ হয়েছে আর পচ ধরতে আরম্ভ করেছে চামড়ায়। গোটা শরীর দিয়ে রস কাটছে। ওদের গায়ের দুর্গন্ধ বহুদূরের বাতাসকে পর্যন্ত ঘৃণ্য ক'রে তুলেছে।

আমি ছুটে পালিয়ে যেতে চাইলাম। ওদের কাছ থেকে দূরে। কিন্তু ওরা, সংখ্যায় অগণিত হ'য়ে আমার দৃষ্টিবহির্ভূত কোন অজানা রহস্য-লোকের দিগন্তব্যাপ্ত কুয়াসার অবগুণ্ঠন সরিয়ে চারদিক পরিবৃত ক'রে আমার অভিমুখে ধাবিত হ'য়ে আসতে থাকল। আমি, অসহায় প্রাণীর মতো আমার অন্তহীন ভীতির কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে ওদের প্রত্যেকটি অগ্রসরকে লক্ষ্য করতে থাকলাম। ওরা আসছে আর ওদের পায়ের তালে তালে দামামা বাজছে। যত কাছে আসে ওরা দামামার শব্দটি যেন তত প্রচণ্ড হ'য়ে আমার কাণের ভেতরে এক বিরাট সংগ্রাম বাধিয়ে দেয়।

আমি ওদের খুব কাছ থেকে দেখতে পাই। মিশমিশে কালো গায়ের রঙ। চামড়া ফাটা ফাটা। ভেতরে ভেতরে পচেছে তাই রস গড়াচ্ছে। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। চোখের দৃষ্টি স্থির, পলক পড়ে না। উলঙ্গ, সারা দেহ উলঙ্গ। দু'হাত উত্তোলিত এবং দু' পা সর্বত্রগামী।

তারপর ওরা আমাকে আলিঙ্গন করল। আমি চিৎকার করলাম। আমার দেহটা ছাদের আল্‌সে টপ্‌কে নিচে পড়ে গেল। অনেক নিচে,

রাস্তায় নয়—কোন অতল খাদের অন্ধকারে। পড়ার সংগে সংগে একটা শব্দ হলো, একটা ধাতব শব্দ। ঠুং।

সেই রাত্তিরের পর থেকে আমি ক্রমাগত নিজের সংগে লড়াই করেছি। মনের দুরন্ত অস্থিরতাকে বাগ মানাতে পারি নি। এক দুর্বার আকর্ষণে বহুবার ছাদের ধারে গেছি। আল্‌সে ধ'রে ঝুঁকে পড়েছি। খুব মমতার সংগে নিচ-পানে তাকিয়ে নিজেকে নাশ করবার সম্ভাবনাতে প্রলুব্ধ হয়েছি। প্রস্তুত করেছি নিজেকে।

কিন্তু আমি জানতাম না সরস্বতী তারপর থেকেই আমার চারধারে কড়া পাহারা বসিয়েছিল। চাকরকে ব'লে রেখেছিল। আমার প্রত্যেকটি গতিবিধিতে লক্ষ্য রাখতে। নিজেও ভীষণ দৃষ্টি দিয়ে আমার প্রতিটি কার্যকলাপ, প্রতিটি ভাব-ভংগী, অভিব্যক্তি নজর করছিল।

আমাকে একদিন বলল, 'ছিঃ, শোভনদা, তুমিও যে এত দুর্বল এবং কাপুরুষ তা' ভাবি নি। একটা বিচ্ছেদকে সহ্য করতে না-পেরে তুমিও মরে শান্তি পেতে চাও? তুমি না এসব জিনিসকে অন্তর থেকে ঘৃণা করতে? তাহলে সে সবই তোমার মিথ্যে আস্ফালন ছিল বল? নিজের সংকট আসতেই এখন আর পাঁচটা অত্যন্ত সাধারণ মানুষের মতো দুর্বলতা দেখাচ্ছ! ছোড়দাকে তুমিই তো' বলতে, বোঝাতে! কোথায় গেল তোমার সেসব যুক্তি, নীতি, ঔচিত্য বোধ?'

আমি অপরাধীর মতো চুপ ক'রে রইলাম। কোন জবাব দিলাম না। আমি বলতে পারলাম না, সব জানা সত্ত্বেও নিজেকে আমি রোধ করতে পারি নি। আমার প্রতিপক্ষ আমার চেয়েও সবল ছিল। আমার সব জোরকে অপহরণ ক'রে সে ওই একটি মাত্র সম্ভাবনার দিকেই বারবার অঙ্গুলি নির্দেশ করছিল।

সরস্বতীর এই ভর্ৎসনায় আমি যেন সংবিৎ ফিরে পেলাম। আমার চৈতন্যের ওপর কেটে ব'সে গেল কথাগুলো। এ ক'দিনে আমার মনের ভেতরে এক বিরাট ওলোট-পালোট চলছিল; পরিবর্তন। আমার মনের সব আলোর যেন হঠাৎ বয়স বেড়ে গিয়েছিল, ধূসর হয়েছিল। ক'দিন ধরে ফুলদানিতে জল পাল্টানো না-হলে সেটা যেমন ঘোলাটে

হয় আর তা'তে পুরু ক'রে সর পড়ে, ঠিক তেমনি। আমি মনের সেই বৃদ্ধ আলোকে এবং ভারী ও ঘোলাটে আবহাওয়ায় আমার সব কিছু লক্ষ্য করছিলাম। তাই বিষণ্ণতা আমাকে রেহাই দেয় নি। আমার সমস্ত সত্তা ব্যেপে তার আশ্চর্য বুনুনী চলেছিল। আর তাই, মৃত্যুর সম্ভাবিত সংসর্গে আমি তৃপ্তি বোধ করেছিলাম।

আমি নিজেকে আবার অন্যভাবে চালনা করতে চাইলাম। হঠাৎ মনে হলো কিছুদিন ধ'রে নিজের ভাবাবেগকে আমি বড় বেশী প্রশ্রয় দিয়েছি। সেটা ছেলেমানুষিরই নামান্তর। আমার শক্ত হওয়া প্রয়োজন। সরস্বতী কিছু অন্যায় বলে নি। সে আমার চোখ খুলে দিয়েছে।

হঠাৎ গৌরের জন্যে মন কেমন করতে লাগল আমার। মনে হলো ওর কাছে গেলে আমি স্বস্তি পাব। ও নিশ্চয়ই আমাকে কোন সুস্থ পরামর্শ দিতে পারবে। যাতে ক'রে এই অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হ'তে পারব আমি।

পরের দিন সকালবেলাই চলে গেলাম গৌরের বাড়ী। গৌর তখনো বেলেঘাটাতেই ছিল। আমি ট্যাক্সিটা একটু আগেই ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম ওর বাসা পর্যন্ত।

গৌরের বৌ তখন রাস্তার টিউবওয়েলে জল ভরতে এসেছিল। আমি ওকে দেখে চিনতে পারি নি। ও কিন্তু আমাকে দেখেই ঘোমটা টেনে দিল চট্ ক'রে। আমি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ও আমাকে ডেকে বলল, 'আপনি তো' শোভনবাবু?'

আমি থামলাম।

'আমি লক্ষ্মী, আপনাদের সনাতন ড্রাইভারের মেয়ে।'

আমি চিনতে চেষ্টা করলাম। সেই কবে দেখেছি, এখন কত বদ্‌লে গেছে মেয়েটা। কত গিন্নীবান্নী চেহারা হয়েছে! রোগা হয়েছে একটু, গায়ের রংটা মরা সোণার মতো, চোখ দু'টো খুব জ্বলজ্বলে। দু'টি শীর্ণ হাতে একগাছি ক'রে সরু চুড়ি। সোনার কি গিল্টির বোঝবার উপায় নেই। গলা খালি, কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরনো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'গৌর আছে বাড়ীতে?'

'হ্যাঁ আছেন।'

'তোমাদের খবর সব ভালো তো?'

'এই আর কি! মা ভালো আছেন?'

'হ্যাঁ বেঁচে আছেন।'

আমি লক্ষ্মীর পিছু পিছু গেলাম। ছোট্ট একটা কাঁচা নর্দমা সাবধানে ডিঙোলাম। কয়েকটা ছেলে খালি গায়ে পথের মাঝেই একটা পিল্ খুঁড়ে মার্বেল খেলছে। আমার পায়ের ধাক্কায় তা'দের একটি গুলি সরে গেল। আমি অপ্রস্তুত হলাম। ছেলেদের চেঁচামেচি সুরু হলো। 'এইখানে ছিল, না, না, এইখানে ছিল। লোকটা সট্ মেরে সরিয়ে দিয়েছে। তুই জোচ্চুরি করছিস্। বানচোত্।'

আমি ফিরে তাকালাম ছেলেগুলোর দিকে। এগিয়ে এসে যেখানে গুলিটা ছিল মোটামুটি সে জায়গায় বসিয়ে দিলাম। তারপর ধমক দিয়ে বললাম, 'মুখখারাপ করছ কেন, য়্যাঁ? ফের যদি ওরকম মুখখারাপ করবে তো' থাবড়ে তোমাদের গাল লাল ক'রে দেব।'

খুব গম্ভীর গলায় এবং রুষ্ট ভংগীতে বললাম কথাগুলো। ছেলেগুলো এক অপরিচিত লোকের কাছে এমন আচম্‌কা বকুনি খেয়ে ভীত হলো। হঠাৎ তা'দের সব কলরব থেমে গেল। আমি লক্ষ্মীর দিকে চেয়ে হাসলাম। লক্ষ্মীও আমার আচরণে অবাক হয়েছিল। কিন্তু বিস্মিত ভাবটুকু অদৃশ্য হ'তে না হ'তেই সে-ও হাসল আমার দিকে তাকিয়ে।

দু'খানি মাত্র ঘর। ওপরটায় টিন ফেলা। সামনে একটু দাওয়া।

গৌর একটা পিঁড়ি পেতে ব'সে খবরের কাগজ পড়ছিল। গৌর ব'লে আমি অবশ্য চিনতে পারি নি। চোখে চশ্‌মা হয়েছে। মুখে একগাল দাড়ি। একটি ছাই-রঙের লুঙ্গি পরা, গায়ে গেঞ্জী।

'এই যে কে এসেছেন, দেখ।' লক্ষ্মী বলতেই খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে তাকাল গৌর। ঠোঁট দু'টো ফাঁক হ'য়ে মুখের মাঝে ছোট্ট একটা গর্ত্ত হ'লো, বিস্মিত চোখ নিবদ্ধ হ'লো আমার মুখে।

আমার মনে হলো গৌরের মুখটা লম্বা হ'য়ে গেছে। ঘোড়ার মতো।

রঙটা আরো জ্বলে গেছে যেন। দেখতে আগেকার চেয়ে আরো খারাপ হয়েছে। বয়সের চেয়ে বেশী বুড়ো মনে হয়। হঠাৎ গৌরের জন্যে কষ্ট হ'তে লাগল আমার।

'আরে শোভন যে, আয় আয়।' নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল গৌর। হাত ধ'রে ওর পিঁড়িটাতেই বসিয়ে দিতে দিতে বলল্ 'বোস্।'

লক্ষ্মী ঘর থেকে একটা মোড়া বা'র ক'রে আনল। ভেঙে গিয়ে মোড়াটার একপাশ হেলে পড়েছে। গৌর সেটাতে ব'সে বলল, 'তারপর কি খবরাখবর বল্?'

আমি বললাম, 'তোর দোকান কিরকম চলছে?'

'টুক্‌টাক্ চলছে আর কি! কোন রকমে জীবন নির্বাহ হচ্ছে। তোর তো' এখন খুব বোলবোলাও।'

আমি চুপ ক'রে রইলাম। অন্য দিকে চেয়ে। আকাশে একটা সাদা মেঘ ভাসছে। ওপাশে একটি বউ উনুনে আঁচ দিয়ে এদিক পানে বা'র ক'রে দিয়ে গেল। ধোঁয়া আসছে।

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, 'জানি না। তবে ঘোর অশান্তিতে আছি। তোর কাছে এসেছি কিছু স্বস্তি পেতে।'

'আমার কাছে স্বস্তি!' ব'লেই খক্ খক্ ক'রে হাসল গৌর। কাশির মতোই শোনাল সেটা।

এই সময় লক্ষ্মী ঘরের ভেতর থেকে একটি বছর চারেকের ছেলেকে হাত ধ'রে নিয়ে এল। চোখে কাজল দেওয়া, চুল আঁচড়ানো। হাফ প্যান্ট আর বুশ সার্ট পরা। বুঝলাম লক্ষ্মী ওর প্রসাধনে ব্যস্ত ছিল এতক্ষণ। আমার জন্যেই বিশেষ ক'রে সাজিয়ে নিয়ে এল

'এই যে আমাদের পুত্ররত্ন।' লক্ষ্মী বলল হেসে। কিন্তু বলার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন গৌরব বোধ পরিস্ফুট রইল।

আমি ওকে কোলে তুলে নিলাম। আদর করলাম খুব। ছেলেটার মুখ মা'র মতোই হয়েছে কিন্তু চোখ আর রঙটা পেয়েছে গৌরের।

'তোর জন্যে যে আজ কিছুই আনতে পারলাম না বাবা।' ছেলেটা

আমার সেকথায় কোনই ভ্রূক্ষেপ করলনা। আমার কোলে বসে ভালো ক'রে দেখতে লাগল আমাকে। তারপর, আমার পকেটে কলম ছিল, সেটায় হাত দিতে থাকল। ব্যাগ ধ'রে টানাটানি করল।

আমি ব্যাগটা বা'র ক'রে কয়েকটা খুচ্‌রো টাকা রেখে বাকী সবটাই ব্যাগসুদ্ধ ওর হাতে দিয়ে বললাম. 'নে, এটা তোর।'

হঠাৎ গৌর একটু অস্বাভাবিকভাবেই চীৎকার ক'রে উঠল, 'না. না এসব কি শোভন! এসব আমি পছন্দ করি না।'

আমি গৌরের দিকে তাকালাম। ওর লম্বা, দাড়িভর্তি মুখটায় স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ। কপালের ওপর চামড়ার ভাঁজ, ক্রোধের ঝাঁজ।

আমি কোন কথা না-ব'লে শুধু আন্তরিকভাবে দুঃখিত হলাম। ব্যাগটা আবার ফিরিয়ে নিয়ে পকেটে রাখলাম। তারপর বিবর্ণ হেসে জিজ্ঞেস করলাম লক্ষ্মীকে, 'কি নাম রেখেছ ওর?'

'গৌতম, গৌতম চক্রবর্তী।'

ছেলেকে সরিয়ে নিয়ে গেল লক্ষ্মী।

গৌর বলল, 'কিছু মনে করিস না। আমি ওকে কখনো টাকা-পয়সার লালসা দেখাতে চাইনা। ও যা' এখন থেকেই ও তা' জানুক। এখন আদর, আরাম পেয়ে পরে হঠাৎ জানবে ওর কিচ্ছু নেই, সেটা বড় খারাপ। তার চেয়ে ও বুঝুক ওর বাবা গরীব। আমাদের ঘটনা কারুর জীবনে পুনরাবৃত্তি না-হওয়াই বাঞ্ছনীয়।'

আমি গৌরকে বললাম না, এটা লালসা দেখানো নয়। ভালবাসার দান। ওর ছেলেকে কিছু দেবার অধিকার আমার আছে। সেটা অমন রূঢ় ভাবে ফিরিয়ে দিয়ে সে আমাকে আঘাত করেছে।

লক্ষ্মী আমাদের দু'জনের জন্যে চা আর হালুয়া নিয়ে এল। আমি বাটিটা তুলে নিলাম।

গৌর জিজ্ঞেস করল, 'তোর অশান্তির কথা বলছিলি, কি হয়েছে?'

আমি বললাম, 'না থাক্। তেমন কিছু না—'

'বল্‌না, বল্ না, ভালই লাগবে।'

আমি আস্তে আস্তে সব বললাম ওকে। মীনাক্ষির সরে যাওয়া। সরে যাওয়ার স্বপক্ষে ওর যুক্তি। আমার মনের অবস্থা। সব। শুধু আত্মহত্যা করার ইচ্ছেটুকুর কথা বললাম না। বলতে গিয়ে জিবে আট্‌কে গেল। লজ্জা হলো ভীষণ।

গৌর সব শুনে বলল, 'আমার কাছে এসেছিস তুই সমাধান খুঁজতে! আমি তোকে কি বলতে পারি, বল্। তুই যথেষ্ট জ্ঞানী, বুদ্ধিমান। আমাকেই তুই কত সময় রাস্তা বাত্‌লে দিয়েছিস্।'

গৌরকে যেন আগেকার মতো মনে হলো আমার। ওর গলায় বহুদিন পরে সেই আন্তরিকতাটুকু খুঁজে পেলাম।

গৌর চোখটাকে নিবিড় করল, নিবিড় এবং নিভৃত। পশুপতি বোস লেনের বাড়ীতে থাকবার সময় যেমন দেখতাম কখনো কখনো। কোন গুরুতর আলোচনার মুহূর্তে। আমার মনে হলো, বহু আবর্জনার স্তূপ সরিয়ে আমি যেন আমার কোন হারানো এবং প্রয়োজনীয় একটি জিনিসকে আবার খুঁজে পেয়েছি।

গৌর বলতে লাগল, বলতে লাগল নয়—তা'র কথাগুলো যেন পড়তে লাগল ঝরণার মতো। কিন্তু অনেকক্ষণ ধ'রে সেই জলপাত শুনলে তার শব্দটা যেমন একান্বয়তায় শ্রান্ত এবং অবসন্ন শোনায়, গৌরের কথাগুলোও তেমনি একটি কোমল স্বরমাত্রায় বাঁধা রইল।

'তাছাড়া, এ অভিজ্ঞতা তোমার একান্তই ব্যক্তিগত। আমি কিছু তোমাকে বাছা বাছা কথা বললাম না-হয়। তোমার মনের শান্তি-রক্ষায়। কিন্তু তা'তেই যে তোমার সব সমস্যার সমাধান হবে, তোমার এতদিনকার জমাট অনুভূতিটা হঠাৎ গলে গিয়ে, তোমাকে সব ভুলিয়ে দিয়ে চটপট কাজে লাগিয়ে দেবে তা তো' আর হয়না। তুমিও অমনি 'যাক্‌গে যা হ'য়ে গেছে, হ'য়ে গেছে' ব'লে হাত সাফ ক'রে পুনরুদ্যমে জীবন-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাও আশা করতে পারিনা। সুতরাং ওসব পরামর্শ দিতে যাওয়া বৃথা, ধৃষ্টতা ছাড়া কিছু নয়। দেখ, বোধ এবং অনুভবটা মানুষের নিজের জিনিস। তা'তে কোন অংশীদার থাকেনা। মানুষে মানুষে বোধের সূক্ষ্ম তফাৎ, স্তরভেদ

থাকবেই। অমৃতলালের 'ব্যাপিকা বিদায়' দেখে কিংবা গিরিশ ঘোষের 'প্রফুল্ল' দেখে তুমিও হাস, আমিও হাসি, তুমিও কাঁদ আমিও কাঁদি। কিন্তু সেই হাসি এবং কান্নার বোধে কোথাও না কোথাও, অন্তত এক-চুলও তফাৎ থাকবে তোমাতে আমাতে। ধর, তুমি আর আমি একই পিতার সন্তান। বাবা মারা গেলে দুঃখ, বেদনা তোমাতেও পৌঁছবে, আমাতেও পৌঁছবে। আমরা দু'জনেই হয়ত একই অনুভূতিতে কাঁদব, কষ্ট পাব। কিন্তু তবু, আমরা জানব না এমন কোন অদৃশ্য এবং অস্পষ্ট অনুভূতির প্রভেদ আমাদের মধ্যে থেকে যাবে। সহানুভূতি কথাটা সারাংশ হিসেবে ব্যবহার হয় সাধারণত। মূল ভাবটুকু তা'তে প্রকাশ পায়, কিন্তু সবটুকু তা'তে ধরা পড়ে না। তাই, তোমার এই অবস্থায় আমি সহানুভূতি জানিয়ে কিছু সান্ত্বনার কথা উচ্চারণ করতে পারি কিন্তু তবু তোমার সবটুকু বোধকে, বেদনাকে আমি নিঃশেষে নিজের ক'রে নিতে পারিনা, তোমার জন্যে তা'র অনেকখানিই পড়ে থাকে, তোমার আস্বাদনের জন্যে। সেখানে তুমি একলা, নিঃসঙ্গ।'

গৌর থামল। এক চুমুকে কাপের চা-টুকু গলায় ঢেলে দিল। তারপর গেঞ্জির হাতা দিয়ে ঠোঁটটা মুছে নিয়ে একটা গোল টিনের কোটো থেকে বিড়ি বা'র ক'রে ধরাবার দিকটা মুখে পুরে দু'বার ফুঁ দিয়ে আবার উল্টো ক'রে চ্যাপটা দিকটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল, তারপর খস্‌খস্ ক'রে দেশলাইয়ের গায়ে কয়েকবার কাঠি ঘষে, সেই কাঠিটা ফেলে দিয়ে নতুন একটা কাঠিতে ধরাল বিড়িটা এবং পরপর দু'বার টেনে ধোঁয়া বা'র করল মুখ থেকে আর সংগে সংগে ওর ছোট্ট হাঁ-টা দেখতে পেলাম আমি এবং আমার মনে হলো সেই ক্ষুদ্র গহ্বরের অন্ধকার থেকে একটা কটু গন্ধ আসছে, পরমুহূর্তে গৌর হাঁ-টা বুজিয়ে ফেলল, তারপর আবার বলতে লাগল. 'শোভন, এখন বুঝি শান্তি, স্বস্তি জিনিসটাও অনেকখানি নিজের উপর নির্ভর করে। বাইরে থেকে আমার প্রিয়জনদের দেখে মনে হতে পারে আমি ঘোর অসুখে এবং অশান্তিতে আছি। কিন্তু সত্যি বলতে কি, জীবনের এমন স্বাদ আমি কোনদিন পাইনি। বাবা বেঁচে থাকতেও নয়। অভাব অভিযোগ

সত্ত্বেও আমি খুব শান্তিতে আছি। নিজেকে আমার মাঝে মাঝে মহৎ সৈনিক মনে হয়। ভেবনা, বাহবা নেবার জন্যে কিংবা শুধুই একটা আদর্শকে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্যে এসব কথা বলছি। এটা আমার সঞ্চয়, এই ক'বছরে এটুকুই আমার পাওয়া। তাই, তোমাকে আমার কেবল এটুকু বলা রইল, এরই মধ্যে তুমি শান্তি, স্বস্তি পেতে চেষ্টা কর। ভেঙে পড়ো না, খোঁজ, চেষ্টা কর। তুমিই একদিন আমায় বলেছিলে, 'ইন এ ডিফারেন্ট ফর্ম, বিয়ণ্ড এনী মিনিং উই ক্যান এ্যাজাইন টু হ্যাপিনেস—' আমিও তোমাকে আজ সেই কথাই বলছি, হ্যাঁ, অন্য কোনভাবে, অন্য কোন পন্থায় সুখী হ'তে চেষ্টা কর, শান্তির অন্বেষণ চালাও। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করব তোমায়— ?'

গৌর আবার থামল। আমার দিকে তাকিয়ে কোন গূঢ় প্রত্যাশায় চোখ পিট্‌পিট্‌ করতে লাগল।

'সরস্বতীকে কেমন লাগে তোমার, সরস্বতীকে ?'

'একথা কেন বলছ ?'

'আমার চিরদিনই মনে হয় সরস্বতী তোমাকে অনেকটা বোঝে! তুমি কি কোনদিন তা'র কথা ভাল ক'রে ভেবে দেখেছ ?'

'সরস্বতীর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। সে আমার জন্যে যা' করেছে, এখনো যা' করে তা' নিতান্ত আপন জনেরাও করেনা।'

'তা'কে সব বলেছ ? তা'র কাছে তুমি শান্তি চাইতে পার না ?' উৎসাহে গৌরের মুখটা আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল।

আমি অবাক হ'য়ে সেই মুখের দিকে তাকাতেই হঠাৎ ওর কথার অর্থ বোধগম্য হলো। আমি মনে মনে হাসলাম। গৌর কি আমায় ছেলেমানুষ ভেবেছে! শেষ পর্যন্ত এই সমাধান খুঁজে পেল! এই সমাধানে খুশী হবার মতো আমার বয়স ও মন কি আর আছে! আমি বুঝলাম আমার দুর্বলতা, ভেঙে-পড়া, অতিরিক্ত ভাবাবেগ, ওকে এই ধারণা দিয়েছে।

আমি আচম্‌কা উঠে পড়লাম। বললাম, 'আজ চলি। পরে

আবার কোনদিন আসব। আর হ্যাঁ, পরে যদি কোনদিন তোর ছেলের জন্যে কিছু আনি তাও কি তুই ফিরিয়ে দিবি নাকি?'

গৌর আমার দিকে ঘাড় তুলে বলল, 'না। কিন্তু তুই আমার কথার জবাব দিয়ে গেলি না?'

'ওকথার কোন জবাব হয়না। আমি নিজেও জানিনা ওকথার জবাব।'

'কিন্তু তুই এখন কি করবি? এমনি অশান্তিতে কাল কাটাবি?'

'তুই-ই তো বললি, শান্তি, স্বস্তি জিনিসটা অনেকখানি নিজের ওপর নির্ভর করে। সেই চেষ্টাই করব, নিজেকে নির্ভরযোগ্য করার চেষ্টা।' আমি হাসলাম।

গৌর উঠে দাঁড়াল, ওর ডান হাতটা আমার বাঁ কাঁধের ওপর রেখে বলল, 'তোর জন্যে উদ্‌বিগ্ন থাকব কিন্তু।'

আমি সেকথার উত্তর দিলাম না। বললাম, 'চলি। চলি লক্ষ্মী।'

লক্ষ্মী এতক্ষণ ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল আমাদের কথা। ঘোমটাটা কপালের কাছে টেনে বেরিয়ে এল সে। অল্প একটু ঘাড় কাত ক'রে বলল, 'আবার আসবেন। আর, সরস্বতীকে বলবেন যদি পারে যেন একবার আসে।'

'বলব।'

বেরিয়ে এলাম আমি। রাস্তায় বেরোতেই বয়স্ক সকালের রোদ তার তপ্ত হাত দিয়ে আমাকে সর্বাঙ্গে বেষ্টন করল। একটি দেহাতী বৃদ্ধা ঘুঁটে দিচ্ছে দেওয়ালে। একটি রিক্সাওয়ালা সওয়ারীর অপেক্ষায় ব'সে। আমাকে দেখে সে ঘণ্টা বাজাল দু'বার। রাস্তার পেচ্ছাব-খানায়, বেগুনে রঙের হাফপ্যাণ্ট-পরা, ছাঁটা-চুলের একটি লোক দাদের মলমের বিজ্ঞাপন লাগিয়ে গেল। উল্টো দিক্ দিয়ে পশ্চিমবংগ সরকারের হরিণঘাটা দুধের একটা গাড়ী এল ছুটে। আরো কয়েকজন মানুষ, ফর্সা এবং কালো রঙের, ফর্সা এবং ময়লা জামাকাপড়ের— এদিক-ওদিক দিয়ে হেঁটে গেল এবং এল।

কিন্তু আমি যেন একলাই ভেসে চললাম।

আমার চারপাশের লোকজন এবং ঘটনার সংগে আমার কোন সংযোগ রইল না। মানুষ হিসেবেও না। আমি যেন একক সত্তা। বহুদূরের কোন নাম-না-জানা দ্বীপের শ্যামল শোভায় একটিমাত্র বৃক্ষ, আপন ভারে প্রপীড়িত।

বাড়ী ফিরে অকারণ ঘরময় ঘুরলাম। চাকরকে হুকুমে হুকুমে বিপর্যস্ত করলাম। খাওয়াদাওয়া করলাম খুব ভাল ক'রে। তারপর প্রসন্ন মনে একটি দিবানিদ্রায় মেতে গেলাম। নিজেকে আমার হঠাৎ খুব বলবান এবং কর্মপটু মনে হচ্ছিল। একটু বেশীরকম উৎসাহ এবং চঞ্চলতা প্রকাশ পাচ্ছিল ব্যবহারে।

বিকেলবেলা সরস্বতী আসতেই বললাম, 'আজ সকালে গৌরের কাছে গিয়েছিলাম!'

'তাই নাকি?' খুশী হলো যেন সরস্বতী।

'তা, কি বলল তোমাকে?' আবার জিজ্ঞেস করল সে।

'বলল, বলল এবার সরস্বতীর একটা বিয়ে দিয়ে দেওয়া দরকার।' কথাটা ব'লেই মনে হলো আমি বোধহয় একটা উচ্চস্তরের কৌতুক করতে পেরেছি এবং এতদ্বারা আমার মনের মেঘ কেটে যাওয়ার খবরটুকুও সরস্বতীকে জানানো হয়েছে। কিন্তু সরস্বতী হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেল। একটা চেআরের ওপর ধপ্‌ ক'রে ব'সে ডান হাতের তর্জনীটা গালের ওপর রাখল এবং ডান পা'টা বাঁ হাঁটুতে। বলল, 'আগে নিজেদের সামলাও। তারপর ওসব ঠাট্টা-তামাশা করবার প্রচুর অবসর পাবে।'

'কেন, এতে ঠাট্টার কি হলো? এটা কি কোন সমস্যা নয়?'

'খুবই গৌণ।'

'গৌণ কিসে?'

—

'বল, গৌণ কিসে! তুমি কি বিয়ে করবে না?'

—

সরস্বতী কোন উত্তর দিল না। ওর মুখের সবটা আমি কিছুক্ষণ

স্বরেই দেখতে পাচ্ছিলাম না। অপরাধীর মতো সেটা অবনত হ'য়ে ছিল ওর কোলের দিকে।

আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তির পর ও আস্তে আস্তে মুখটা তুলল। সোজা তাকাল আমার দিকেই। আমার মনে হলো ওর চোখটা একটি স্বচ্ছ কাঁচের আধারে জলের বাষ্পের মতো গাঢ় এবং ঝাপসা দেখাচ্ছে।

আমাকে সে-দৃষ্টির সামনে বিচলিত হতে হলো। আমি কোন ছলেই এই পরিস্থিতিকে কথা ব'লে হাল্কা করতে পারলাম না। আমার মনে হলো হঠাৎ আনন্দ ক'রে খেলতে খেলতে আমি যেন একটা মূল্যবান খেল্‌নাকে ভেঙে ফেলেছি।

'কয়েকটা গান শোনাবে, গান?' বেশ কিছুক্ষণ পরে বললাম। সময় এবং অন্ধকার দু'টোই আমাদের ঘিরে বেড়ে ওঠবার পর।

'কি গান?' খুব ভারী এবং নিস্পৃহ গলায় জিজ্ঞেস করল সরস্বতী।

'গান'-এর 'গা' শব্দটায় ওর গলাটা ভেঙে গেল।

'রবীন্দ্রসংগীত। শোনাও না—।'

সরস্বতী হ্যাঁ-না কোন উত্তর দিলনা। একটু পরে চেআর ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ অভিমুখে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল, 'ছোড়দা আর কি বলল?' জিজ্ঞেস করল কিন্তু ওর গলায় সহজ ভাব ফিরে এলনা এবং তেমন আগ্রহও ফুটল না।

আমি বললাম, 'বলল, অলস ভাববিলাসকে প্রশ্রয় না-দিয়ে কাজটাজ করতে আর কি!'

'তা, তুমি কি ঠিক করলে?'

আমি হাসলাম। বললাম, 'হ্যাঁ, কর্ম-ই ধর্ম! কাজ করতে হবে বৈ কি! এবার আয়োজন ক'রে ফেললেই হয়।'

সরস্বতী পিয়ানোর সামনে বসে বহুক্ষণ ধ'রে গান শোনাল আমাকে। আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, রবীন্দ্রসংগীতে আশ্চর্য একটি

অবশ করার শক্তি আছে। মানুষ সেই পরিবেশে নিজেকে খুবই অসহায় বোধ করে, অসহায় এবং নিরুপায়।

দীর্ঘ পাঁচ মাস পরে এক সন্ধ্যায় আমি আবার লোকের মুখোমুখী হলাম। গান শোনাতে। সরস্বতীর উৎসাহেই অনুষ্ঠানটা হয়েছিল বলতে গেলে। সে-ই সব আয়োজন করল। কলকাতার একটি নামজাদা হল্ ভাড়া ক'রে নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিয়ে, টিকিট বিক্রী ক'রে হয়েছিল অনুষ্ঠানটি। সরস্বতী গণ্যমান্য অতিথিদের ডেকেছিল, ডেকেছিল কাগজওয়ালাদের। তারা এক হপ্তা আগে থেকেই সংবাদ দিয়ে, ছবি ছেপে অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব বাড়িয়ে দিল। টিকিট বিক্রী হলো খুব। সরস্বতীর আর আনন্দের সীমা রইল না। আমার আশা স্তিমিত হয়েছিল, উদ্যম অন্তর্হিত হয়েছিল—সেসব নতুন ক'রে ফিরিয়ে দিতে পেরে, আমার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে পেয়ে সরস্বতী নিজেকে যেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি মনে করছিল।

আমি চলে আসার বেশ কিছুদিন পরে মীনাক্ষি একটা চিঠি লিখেছিল দিল্লী থেকে। লিখেছিল, 'বাবা অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন আমাদের ব্যর্থতায়। আমরা যে শেষ পর্যন্ত সম্মিলিত হ'তে পারবনা, এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। তিনি অবাক হ'য়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমরা যে কন্টিন্যু করতে পারবেনা, সেটা জানতে এত সময় লাগল তোমাদের, এত ঘনিষ্ঠ হ'তে হলো? তোমাদের কিরকম ভালবাসা ছিল?' তিনি মুষড়ে পড়েছিলেন অত্যন্ত। অনেক বুঝিয়ে তাঁকে শান্ত করেছিলাম। কিন্তু হ'লে হবে কি, আঘাত সামলেই তিনি যেন নিদারুণ প্রতিহিংসায় আমার জন্যে ক্ষিপ্র বেগে পাত্র দেখতে সুরু করলেন। আচ্ছা ভাব শোভন, এই বয়সে ওসব অত্যাচার কি আর ভাল লাগে! সময় নেই অসময় নেই, হঠাৎ পার্টি, হঠাৎ ডিনার। কি ব্যাপার! না ভিলাইয়ের একটি তরুণ ইঞ্জিনিয়র আমাকে দেখতে আসবে। কখনো বললেন, এলাহাবাদের এক অবসরপ্রাপ্ত জজ-এর একমাত্র ছেলে, যে এখন ভারত সরকারের ফরেন

সার্ভিসে আছে, সে আমার সংগে চা'য়ে বসবে। যাইহোক্, সম্প্রতি সেই অত্যাচার খানিকটা কমেছে। আমিই কমিয়েছি চেঁচামেচি ক'রে। আমার ট্রুপ-এর কাজ আরম্ভ হয়েছে। হয়ত ভুল বললাম, প্রস্তুতি শেষ হয়েছে এবার আরম্ভ হলো কাজ। সহায় আমাকে সহায়তা করছে। ছেলেটা ভাল। তুমি ওকে ভুল বুঝেছিলে। তবে একটু নির্বোধ আর সেনজেটিভ। কি যেন বাংলা করেছ কথাটার আজকাল! হ্যাঁ, সুবেদী। তোমার কোন সাড়া-শব্দ না পাওয়াতে ভয় হচ্ছে। তুমি কি নিজের বিরুদ্ধে ভয়ানক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে? ওসব কোরনা। করলে নিজেই বিপাকে পড়বে। নিজেই নিজের রণক্ষেত্র তৈরী করবে। তারপর একদিন সেই অগৌরবের মৃত্যুটা পৌঁছবে এসে। শোভন, আপনার প্রতি বিশ্বাস রাখ।'

চিঠিটা পড়ে মনে মনে আমি হেসেছিলাম। বিশ্বাস! বিশ্বাস যদি মানুষ সত্যিই কাউকে করতে পারত, অন্তত দেবতাকে, তাহলে তা'রা অনেক অসহায় দুর্গতি থেকে রক্ষা পেত। দুঃখের ব্যাপার, মানুষ কাউকে বিশ্বাস করতে চায় না, দেবতাকেও না, আর চায় না ব'লেই তাদের হতাশারও শেষ নেই। মানুষ উপদেশ দিতে চায়, উপদেশ নিতে নয়। সবাই তাই, হয়ত আমিও এর ব্যতিক্রম নই।

পাঁচমাস পরে সেদিন সন্ধ্যায় আবার নতুন ক'রে ভয় এবং উত্তেজনা অনুভব করেছিলাম। প্রথম অভিজ্ঞতার মতো। হাত ঘামল, কাঁধের কাছ দিয়ে একটা কন্‌কনে ঠাণ্ডা সাপের মতো লকলক ক'রে নিচ-পানে নেমে গেল। ঢ্যাটরা পেটাবার মতো অওয়াজ দিতে লাগল আমার হৃৎপিণ্ডটা। মনে হলো যেন আমার শেষ সংবাদ জ্ঞাপন করছে।

আমি দেখলাম, প্রেক্ষাগৃহের পাতলা অন্ধকারে সারি সারি মানুষ নীরবে ছায়ার মতো বসে আছে। যেন কোন গীর্জার প্রার্থনা সভায় যোগদান করতে এসেছে তা'রা। মঞ্চটা যেন দেবতার বেদী। তা'রা সেদিক পানেই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তাকিয়ে আছে। কোন কিছু শোনার প্রত্যাশায়। মহৎ কিছু, যাতে তা'রা স্বস্তি পেতে পারে।

জীবনে যে-আতংকের অস্তিত্ব তা'রা সব সময় অনুভব করে অথচ যাকে স্বীকার না করার প্রচেষ্টায় তাদের ছুটে চলতে হয় অনবরত, ওরা যেন সেই আতংকের প্রতিবিধানের জন্যে গোপনে মিলিত হয়েছে এখানে। ওদের মুখ আশা এবং আশংকায় পাংশু। চোখের দৃষ্টি বিহ্বল।

মঞ্চের উচ্চতায় এবং আলোকিত পশ্চাৎপটে দাঁড়িয়ে আমি যেন ওইসব মানুষদের জন্যে দায়িত্ব অনুভব করলাম। আমার মনে হলো আমি যেন ওদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমার গোটা ভবিষ্যৎটা ওদের কাছে কোন অলিখিত সর্তে সমর্পণ করা আছে। কিছু বলতে হবে আমাকে, কিছু জানাতে হবে।

মনে মনে কতকগুলো শব্দ যেন আপনা থেকেই জড়াজড়ি ক'রে বাক্যের রূপে বেরিয়ে আসতে চাইল। আমি বললাম, 'শুনুন আপনারা, এখনকার পৃথিবীতে ধন, মান, জীবন, এই সব আলো, প্রেম, নির্জনতা কিছুই বেশীদিন থাকে না। বুদ্‌বুদের মতোই তা' মিলিয়ে যায়। যে-কোন জড় পদার্থের চেয়ে তার স্থায়িত্ব দীর্ঘ নয়। তাই আপনারা—' এই পর্যন্ত এসে আমি আর কথা খুঁজে পেলাম না। আমার বুকের ভেতর অনুসন্ধান চলল। আমি হতাশ বোধ করলাম। পরীক্ষা দিতে বসে উত্তর করতে না-পারার ভয়ার্ত হতাশা। তারপর আবার বললাম, 'তাই এইসব অসার জিনিসের পেছনে আপনাদের সময় ও উৎসাহ ব্যয় না-ক'রে আপনারা সৎ হোন্, হ্যাঁ, মৃত্যুর মতো সৎ এবং অমোঘ। বিশ্বাস করতে শিখুন আপনারা, দেবতাকে বিশ্বাস করতে শিখুন। জানবেন, মানুষের চিরস্থায়ী স্বস্তি ও শান্তির শেষ কথাটি তাঁর কাছেই আছে।'

কিন্তু এসব কিছুই আমি বললাম না। আমি কোনরকমে কয়েকটি গান গেয়ে বেরিয়ে এলাম। রবীন্দ্রনাথের গান। আমার ভেতরে ভেতরে হাঁপ ধরছিল এবং অদ্ভুত একটা ব্যস্ততা প্রাচীন, জীর্ণ, বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে ওঠার ধুপ্-ধাপ্ শব্দের মতো ঠেকছিল।

আমি বেরিয়েই সরস্বতীর খোঁজ করলাম। শুনলাম, সে একটু আগেই বাড়ী চলে গেছে। কেন কেউ তা' জানেনা।

আমি কোনদিকে না তাকিয়ে ছুটে রাস্তায় পড়লাম। পেছন পানে তাকালাম না। পেছনের সব দৃশ্য এবং সংলাপ আমার কাছে ঝাপ্‌সা এবং অস্ফুট হ'য়ে গেল। যেন আমার পেছনে হঠাৎ কাঁচের শার্সি টেনে দেওয়া হলো একটা।

আমি রাস্তায় নেমেই একটা ছুটন্ত ট্যাক্সির দিকে হাত তুললাম। ট্যাক্সিটা আমার কয়েক হাত দূরেই থেমে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে গদী-আঁটা আসনে নিজের কাতর শরীরটার ভার নামালাম। মনে হলো, আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে যেন একটা শব্দ উঠেছে ক্যাঁচ-কোঁচ ক'রে ; যান্ত্রিক শব্দ।

ট্যাক্সিটা ছুটে চলল। মনটা আমার তদোধিক বেগে ছুটতে লাগল কোন নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে প্রকাশ না ক'রে। আমার মনে হলো, আমার চেহারাটা দেখাচ্ছে কোন বিভ্রান্ত আগন্তুকের মতো ; সেরকম মলিন এবং সেরকম হতাশ। ভেতরে ভেতরে যেন বহু পদার্থের সংমিশ্রণ হচ্ছিল, ঢালা ওপর। রসায়নিক প্রক্রিয়ার মতো। কিন্তু সেই সব মেলা-মেশার শেষ হচ্ছিল না। ক্রমাগত ঘটেই চলছিল এবং আমার যন্ত্রণাকে একটু একটু ক'রে উস্‌কনো ছাড়া কোন চরম ফলাফল প্রকাশ করছিল না।

আমার বোধ হচ্ছিল, কেউ আমাকে এখুনি কোলে তুলে নিলে আমি যেন শান্তি পাব। মাতা, প্রেমিকা, দেবতা অথবা মৃত্যু যেই হোক্ না কেন! আমার এই পরিশ্রান্ত দেহ ও মনের ভার আমি যেন বহুকাল ধ'রে 'বয়ে বয়ে ফিরছি।

'এবার অমায় কাছে ডাক, যতক্ষণ আমার চেতনা থাকে, ততক্ষণ যেন বিচ্ছেদের ব্যথা অনুভব না করি, আর যেন কষ্ট না পাই' মনে মনে বললাম আমি। কিন্তু কাকে উদ্দেশ্য ক'রে বললাম আমি তা' জানিনা। তবে, আমি জানতাম দেবতা অথবা মৃত্যু কোনটাই সুলভ নয়। কোথায় কখন কীভাবে তাঁদের আবির্ভাব হয় মানুষ ইচ্ছে করলেই তা' জানতে পারেনা।

আমি আবার বললাম, 'আমার চৈতন্য অবলুপ্ত হয়ে যাক্'। কেননা

আমি জানতাম চৈতন্য থাকা পর্যন্ত মানুষ কখনোই শান্তি পাবেনা। আমার সাম্‌নের এই জমাট অন্ধকাররাশি, লোকজনের এই চলাচল, আলো, হাসি, গান, মীনাক্ষি, সরস্বতী, ললিতা-বউ বারেবারে আমার চিন্তার মধ্যে দহন সৃষ্টি ক'রে সরে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি চেতনা হারাব, ভুলে যাব সব। বেল্‌চা দিয়ে কয়লা তুলে ইঞ্জিনের আগুনকে যেমন গন্‌গনে ক'রে তোলা হয় তেমনি ক'রে এক একটি ভাবনা আমার মধ্যে আগুন জ্বালাবে।

'আমাকে ভুলিয়ে দাও, ভুলে যাওয়ার কঠিন শীতলতা আমার অঙ্গকে জুড়িয়ে দিক্।' ডান হাত ছড়িয়ে দিয়ে গভীর অবসাদে আমি চোখ বুজলাম। সেই পরম মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করলাম যেন।

একটু পরে জেগে উঠে পকেট থেকে সিগারেট বা'র ক'রে ধরালাম। কয়েক মিনিট ধ'রে একাগ্রচিত্তে টেনে গলা ও বুককে জ্বলিয়ে আরাম পেলাম খানিকটা। তারপর ড্রাইভারকে বললাম, 'বাঁয়া গলি।'

ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। নিচে একটিমাত্র আলো জ্বলছে। বাড়ীটা যেন ঘুমিয়েছিল জড়সড় হ'য়ে। আমার পায়ের শব্দে এবার আড়মোড়া ভেঙে উঠল।

আমি ওপরে উঠে একটি দালান এবং গৌরের বড়দার ঘর পার হ'য়ে জ্যেঠিমার ঘরের কাছে এসে থামলাম। ঘরের দরজায় একটি সবুজ রঙের পর্দা ঝুলছে, কিন্তু পর্দাটা ফাঁক করা। আমি দেখলাম, জ্যেঠিমা তেমনি বসে আছেন খাটের গায়ে হেলান দিয়ে। হাত দু'টি কোলের কাছে প্রার্থনার ভংগীতে জড়ো করা। দৃষ্টি সাম্‌নে প্রসারিত।

'কে গৌর এলি নাকি?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু তাঁর গলা অনেকবার বাজানো একটি রেকর্ডের মতো ক্লান্ত শোনাল; ক্লান্ত এবং প্রাচীন। আমি আর দাঁড়ালাম না, তড়িৎ গতিতে সেখান থেকে সরে সরস্বতীর ঘরের দিকে এগোলাম।

সরস্বতীর ঘরের চৌকাঠের কাছে এসে আমার ভয়-ভয় করতে লাগল! মনে হলো, এরপর যা যা ঘটবে তার পরিণতি সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা, কোন কিছুতেই হাত থাকবে না আমার। আমি হয়ত পুরনো পালা শেষ ক'রে আবার নতুন পালায় অংশ নিতে মঞ্চে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। হয়ত দুঃখকে নতুন বেশে চয়ন করতে চলেছি।

আমি ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলাম। ঘরের অনেকখানি অংশই অন্ধকারে হারিয়ে রয়েছে। শুধু টেব্‌ল ল্যাম্পের আলোয় সরস্বতীর মাথার দিকটা উদ্ভাসিত। সরস্বতী উপুড় হ'য়ে শুয়ে আছে। তা'র মুখটা দেখা যাচ্ছে না। শরীরটা তেরছা ভাবে খাটের কোনাকুনি ছড়িয়ে আছে। একটা পা খাটের সীমানা ছেড়ে বেরিয়ে অসহায় ভাবে ঝুলে পড়েছে।

ঘরের সেই ম্লান আলো এবং কোমল অন্ধকারে সরস্বতীর ছড়ানো শরীরটা একটি করুণ আত্মসমর্পণের মতো প্রতিফলিত ছিল। দক্ষ শিল্পীর আঁকা ছবির মতো। যেন কোন নারী মুক্তি চাইছে, মুক্তি চাইছে তা'র বন্দীদশা থেকে এবং তাই সে আত্মসমর্পণ করেছে তা'র অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রভুর কাছে। তা'র সমস্ত শরীরকে ঘিরে প্রতিটি আলো ও ছায়ার খেলা এবং তার মধ্যবর্তী স্তর যেন এক আশ্চর্য প্রহেলিকা রচনা করেছে। আরো করুণ করেছে দৃশ্যটাকে।

সময়টা স্তব্ধ হ'য়ে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম নিশ্চল হ'য়ে। আমার কপালে ঘাম জমল। আমার মাথার ভেতরে কারা যেন অত্যন্ত ধীরে, নাম না-জানা যন্ত্রে সুর তুলতে লাগল। আমার মনে হলো, এক এক ক'রে অত্যন্ত লঘুপায়ে অনেক লোক যেন আমাকে ঘিরে, নীরব হ'য়ে দাঁড়াল।

আমিও আত্মসমর্পণ করতে চাইলাম। আমার প্রভুর কাছে। কিন্তু কে আমার প্রভু। যে আমায় বন্ধ ক'রে আর বেদনার পরীক্ষা সহ্য করতে বলবে না! আমাকে একটি স্থায়ী স্বস্তির আশ্রয় দেবে, আশ্বাস দেবে। জীবন এবং জগৎ যদি মানুষকে সেই নিরাপত্তা

দিতে না পারে, যদি মৃত্যুই মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রভু হয়, তাহলে সেই প্রভুত্বই আমি স্বীকার করব। আমি মৃত্যুকে বন্দনা করব।

'আমাকে মৃত্যু দাও তাহলে' বললাম আমি।

হঠাৎ সরস্বতীর শরীরটা একটু নড়ল। নড়ল আলোটা এবং ছায়াটা। নড়ল সময়টা। এতক্ষণ যেন নির্দেশের অভাবে বন্ধ হ'য়ে ছিল এক বিরাট ঐকতান। এবার চলতে আরম্ভ করল, বাজতে লাগল।

'সরস্বতী' ব'লে আমি ডাকলাম।

সরস্বতী ধড়মড় ক'রে উঠে বসল শয়ন ছেড়ে। ছবিটা ভেঙে গেল। আমি এগিয়ে গেলাম।

জানলার বাইরে রাতের আকাশটা এক নীরব স্নেহের প্রশ্রয়ের মতো জেগে রয়েছে।

আমি এগিয়ে গিয়ে সরস্বতীকে জড়িয়ে ধরলাম। বুকে তুললাম। ওর উত্তেজিত হৃদয়ের স্পন্দন শুনলাম। তারপর চোখের দিকে তাকালাম।

সংগে সংগে আমার মনে হলো, আমি জানিনা, হয়ত এই সুখের অবকাশটুকুও বেশী থাকবে না জীবনে। হয়ত আবার কোন অছিলায় তা'রা সরে যাবে। যেমন ক'রে অনেকেই গেছে, অনেক কিছুই। মা, বাবা, ললিতা-বউ, মীনাক্ষি—।

আমি সরস্বতীর শরীরে শান্তি ও স্বস্তির নতুন আশ্রয় রচনা করতে করতে আবার ভাবলাম, এই সব আলো, প্রেম, নির্জনতা, কিছুই থাকবে না জীবনে, থাকে না। তা'রা ক্ষণস্থায়ী। তা'রা এক একটি মধুর ভ্রান্তি।

নিজেকে ছোট ছেলের মতো অসহায় লাগল আমার। যে ছেলে অনেক ছেলেদের জটলায় কোন খেলাতেই সুবিধে করতে না-পেরে নিজের ব্যর্থতায় অসহায় বোধ করে।

কিন্তু জানিনা, এ ছাড়া আমি আর কি-ই বা করতে পারতাম!